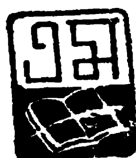
বাংলার সাধক

[তৃতীয় খণ্ড]

শ্রীগঙ্গেশচন্দ্র চক্রবর্তী



এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ

প্রকাশক :

নিভা মুখোপাধ্যায়

ম্যানেজিং ডিরেক্টার

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ

২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ, ১৩৩৮

প্রচ্ছদপট

সুভাষ সিংহ রায়

মুদ্রাকর :

শ্রীবৈদ্যনাথ ঘোষ

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেস

৭১/১ হিদারাম ব্যানার্জী লেন

কলিকাতা-১২

উৎসর্গ

আনন্দময়ী মা'র স্নেহধন্য ভক্তপ্রাণ স্বর্গত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গিত হল।

গণেশ চক্রবর্তী

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

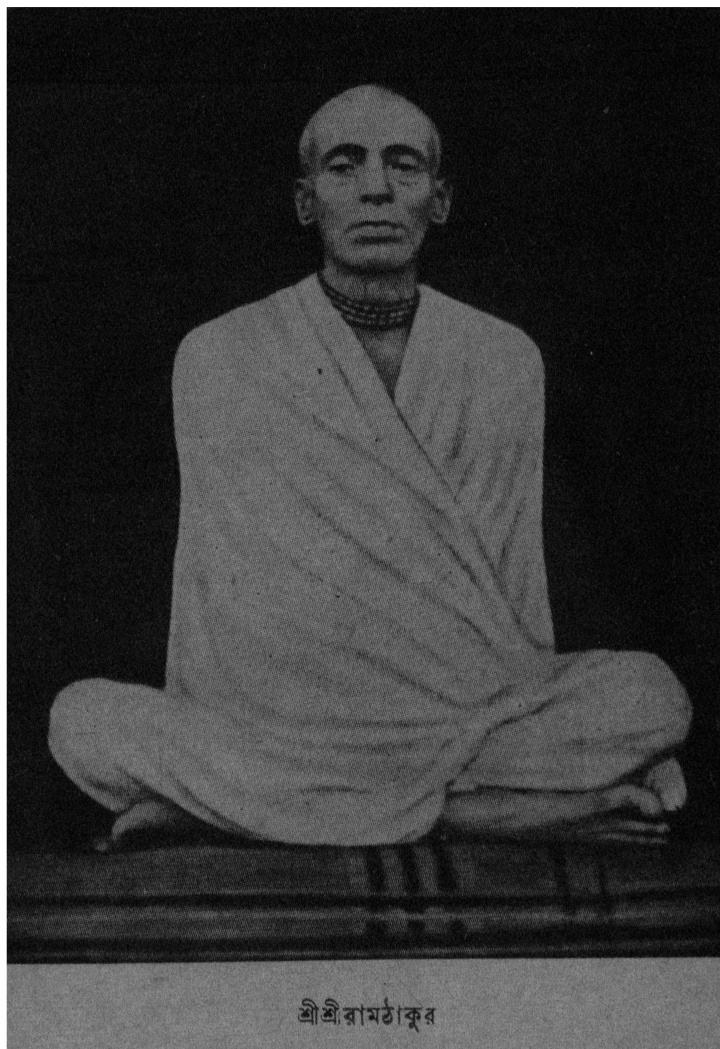
এই গ্রন্থরচনার কার্যে যাঁরা আমাকে উৎসাহ দানে অকুণ্ঠিত ছিলেন ও নানাভাবে সাহায্য করেছেন তাঁরা হলেন আমার বন্ধু ও শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপকশ্রীযুত চিত্তরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীযুত নলীগোপাল চক্রবর্তী, শ্রীপ্রেমানন্দ সেন, শ্রীঅজিত মজুমদার, সাংবাদিক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু, সাহিত্যিক শ্রীমৃত্যুঞ্জয় মাইতি, শ্রীশঙ্কর ব্রহ্মচারী, শ্রীসিতিকণ্ঠ সেনগুপ্ত, শ্রীরবীন্দ্রমোহন গণ, ডাঃ সত্যরঞ্জন চ্যাটার্জী, শ্রীমনতুষ্ট নাথ, শ্রীকান্তি মজুমদার, ডাঃ মাখনলাল ভৌমিক ও শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী। সকলকেই আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এই খণ্ডটি স্বয়ংসম্পূর্ণ করবার জন্য যে সমস্ত গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করেছি সেই সব গ্রন্থের লেখকদের নিকট এবং জাতীয় গ্রন্থাগারের যাদের সহযোগিতায় গ্রন্থপ্রাপ্তির শ্রম অনেকটা লাঘব হয়েছে তাঁরা হলেন সহকারী লাইব্রেরীয়ান শ্রীকার্তিক সাহা, শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ ও শ্রীবাণী বসু, তাঁদের নিকটও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

অবশেষে আমি আমার কৃতজ্ঞতা জানাই শ্রদ্ধেয়া শ্রীনিভা মুখোপাধ্যায়ের নিকট, যিনি বর্তমানে কাগজের দুর্মূল্যতার মধ্যেও এই গ্রন্থখানি প্রকাশের সম্পূর্ণ দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন।

সর্বশেষে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করি শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা'র নিকট। যাকে হৃদয়ে রেখে কার্য সম্পন্ন করলাম। ফলাফল ও তাঁরই হাতে। 'তত্র শ্রমস্তু মম মন্দবুদ্ধেঃ'- আমি মন্দবুদ্ধি, আমার পক্ষে শ্রম করাই সহজ।

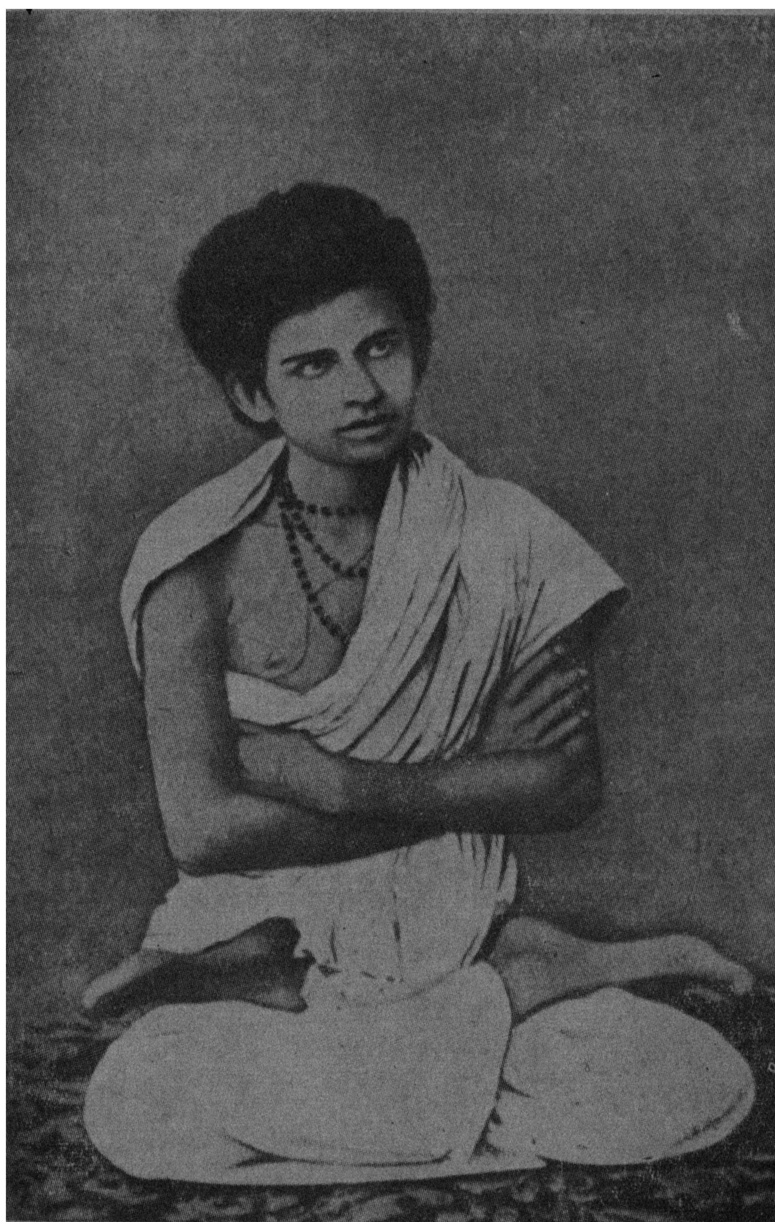
গ্রন্থকার



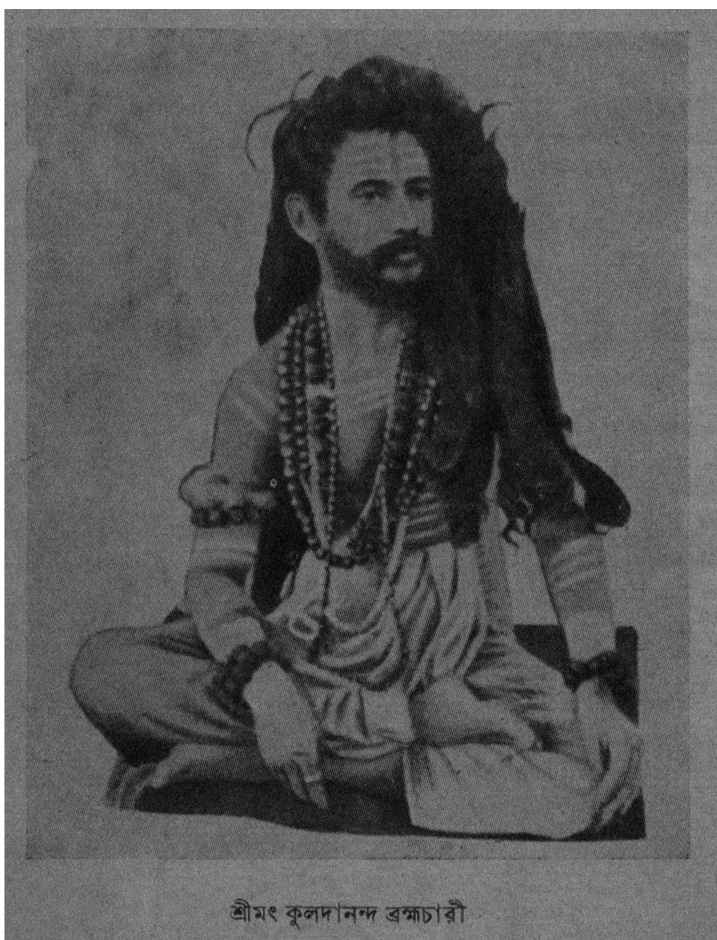
শ্রীশ্রীরামঠাকুর



স্বামী বিবেকানন্দ



শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু



শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী

রামঠাকুর

অরুণোদয়ের সাথে সাথে সেদিন ফেণী শহরে প্রচারিত হলো এক চাঞ্চল্যকর সংবাদ। যুবক রামচন্দ্রের অলৌকিক ভাবে চন্দ্রনাথ তীর্থ দর্শনের কাহিনী। রাম সাধু! রামঠাকুরও নয়। ওয়ার্ক সরকার মশায় রামচন্দ্র চক্রবর্তী। পি. ডব্লিউ. ডি.র ওয়ার্ক সরকার। নোয়াখালী থেকে এসেছেন ফেণীতে। বদলী হয়ে। কর্মক্ষেত্র এখন ফেণী শহর।

রামচন্দ্রের এখন দিবারাত্রের স্বপ্ন চন্দ্রনাথ। শিবচতুর্দশীতে যাবেন চন্দ্রনাথে। দেখা করবেন গুরুদেবের সঙ্গে। শুধু সাক্ষাৎ নয়। প্রণাম করবেন। কথা বলবেন। শ্রীমুখের কথা শুনবেন। অন্তরে অন্তরে প্রবাহিত হয়ে চললো আনন্দ হিল্লোল। আনন্দ··· আনন্দ···আনন্দ। সেই শুভদিনটিও আগতপ্রায়। ছুটির দরখাস্তও করে ফেললেন। কিন্তু ছুটি হলো না মঞ্জুর। একসিকিউটিভ্ এনজিনিয়ার আসছেন পরিদর্শনে। চিন্তান্বিত হলেন রামচন্দ্র। ভাবান্তর হলো মনোজগতে। মনে মনে আওড়ালেন এ আবার কি লীলা গুরুদেবের! গুরুদেব যে প্রতিশ্রুত ছিলেন। চন্দ্রনাথে দেবেন দর্শন। তবে কেন হলো এমন বিঘ্ন?

অভাবনীয় ব্যাপার। হঠাৎ টেলিগ্রাম এলো একসিকিউটিভ্ এনজিনিয়ার আসছেন না। ছুটি মঞ্জুর হলো। তৃপ্ত হল আর শান্ত হলো রামচন্দ্রের বিচলিত হৃদয়। গুরুদেবের মহিমার কথা ভেবে, আকুল প্রাণে নয়ন জলে ভাসতে ভাসতে যাত্রা করলেন চন্দ্রনাথ অভিমুখে। পদব্রজে। পথ দীর্ঘ। দুর্গম। উপলবন্ধুর। আনন্দ-বিহ্বল রামচন্দ্র উত্তেজনা বশে পথ ভুল করে ফেললেন। দক্ষিণ দিকে না গিয়ে চললেন উত্তর অভিমুখে। এক পথিকের সঙ্গে হলো দেখা। তিনি বললেন, রামচন্দ্র চন্দ্রনাথের বিপরীত দিকে চলেছেন।

তখন অনেক পথ চলে এসেছেন। পথশ্রান্ত। ক্লান্ত রামচন্দ্র হতাশ হয়ে বসে পড়লেন এক বৃক্ষনিম্নে। ভয়ানক ভুল হয়ে গেছে। এখান থেকে চন্দ্রনাথ যে চল্লিশ মাইলের পথ। আবার বিষন্ন হয়ে উঠলো মন। ধীরে ধীরে এক সন্ন্যাসী এসে দাঁড়ালেন রামচন্দ্রের কাছে। পথভ্রান্ত পথিক কি চন্দ্রনাথ যেতে চায়? জিজ্ঞেস করলেন সন্ন্যাসী।সে তো অনেক পথ। আজ কেমন করে যাওয়া সম্ভব হবে?

বিস্মিত চোখের দৃষ্টি তুলে অসহায়ের মত করুণভাবে রামচন্দ্র তাকিয়ে থাকেন সন্ন্যাসীর মুখের দিকে। প্রীতিবিহ্বল স্বরে সন্ন্যাসী ঠাকুর ওঠেন হেসে। ইঙ্গিতে বললেন অনুসরণ করতে। অভিভূত রামচন্দ্র মন্ত্রচালিতের মত তাঁকে করলেন অনুসরণ। দুর্গম পার্বত্য পথে সন্ধ্যার পূর্বেই সন্ন্যাসী মহাপুরুষ পৌঁছে দিলেন তাঁকে চন্দ্রনাথে। মনোবাসনা হলো পূর্ণ। মিলিত হলেন গুরুদেবের সঙ্গে। রাত্রি অতিবাহিত করলেন সীতাকুণ্ডে। আবার সেইরূপ অজ্ঞাতভাবেই রামচন্দ্রকে রেখে গেলেন ফেণীর নিকটে সেই সন্ন্যাসীপ্রবর। অলৌকিক ব্যাপার। আর এইখানে এই অবস্থায় দেখে ফেললো রামচন্দ্রের পরিচিত এক পেয়াদা। রামচন্দ্র অবশ্য আত্মগোপন করবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু পারলেন না। ঐ পেয়াদাটি এই অলৌকিক ঘটনার কথা রটনা করে দিল সমস্ত ফেণী শহরে। রামচন্দ্রের পক্ষে প্রচ্ছন্ন থাকা আর হলো না সম্ভব। ইতিপূর্বে অবশ্য নোয়াখালী শহরেও কিছু কিছু প্রকাশ হয়ে পড়েছিল তাঁর বিভূতিলীলা।

নোয়াখালী বড় বাজারের পাশে অবিনাশচন্দ্র ময়রার বড় মিষ্টির দোকান। একদিন রাত্রিতে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন সে। হঠাৎ স্বপ্ন দেখলো রামচন্দ্র বলছেন, 'অবিনাশ! তুমি তো ঘুমাইয়া আছ, আর তোমার যথাসর্বস্ব চোরে লইয়া গেল।' ধড়মড় করে উঠে পড়লো অবিনাশ ময়রা। জাগালো স্ত্রীকে। গৃহস্থকে জাগ্রত দেখে চোরেরাও পালালো। আলো জ্বেলে দেখতে পেলো ক্যাশবাক্স ফেলেই পালিয়েছে চোর।

আবার একদিন দোকান সংলগ্ন কালীবাড়ীতে গভীর রাত্রিতে রামচন্দ্রকে যোগাসীন দেখে অভিভূত হলো অবিনাশ ময়রা। চিনতে ভুল হলো না ইনি একজন সিদ্ধযোগী। অবিনাশ ময়রা রামচন্দ্রের পা জড়িয়ে ধরে দীক্ষা প্রার্থনা করলো। রামচন্দ্রও ভক্তের ব্যাকুলতা আর আবেদন-করুণ মূর্তি দেখে দীক্ষা দান করলেন। শান্ত হলো অবিনাশের মন। আরও বিচিত্র ব্যাপার, রামচন্দ্রকে একই সময় বিভিন্ন স্থানে দেখা যেতে লাগলো। কখনও দেখা গেল তাঁর ঘরে আহ্নিকে বসেছেন, পরমুহূর্তেই দেখা গেল তিনি সেখানে নেই। অদৃশ্য হয়েছেন। আবার হয়তো দেখা গেল রাত্রি শেষ প্রহরে চন্দন-চর্চিত অবস্থায় বৃক্ষ থেকে অবতরণ করছেন।

ভগবানের কি বিচিত্র লীলা! ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষকেও লোকশিক্ষার জন্য পাচক বৃত্তি গ্রহণ করতে হয়েছিল। গুরুর আদেশে রামচন্দ্র তপভূমি হিমালয় থেকে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন গৃহে। মায়ের সেবার জন্য। গৃহে ফিরে অনুভব করলেন অর্থের অভাব। লেখাপড়া শেখেন নি, কিই বা করবেন। অবশেষে নোয়াখালী শহরে এসে এক ইঞ্জিনিয়ারের গৃহে পাচকের কার্যে হলেন নিযুক্ত। পাঁচ টাকা মাসিক মাহিনায়। তাও নিজ হাতে গ্রহণ করতেন না। মনিঅর্ডার যোগে মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিতে বলে দিয়েছিলেন গৃহকর্ত্তাকে। রান্নার কাজ খুব সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন করতেন। 'পাক প্রণালী' গ্রন্থ কিনে নিয়ে বিভিন্ন প্রকারের খাবারের প্রস্তুতপ্রণালী শিখে নিয়ে-ছিলেন। নিত্য নূতন মুখরোচক খাবার প্রস্তুত করতেন। কিন্তু নিজে কিছুই গ্রহণ করতেন না। নিজের খাবার যত্ন করে থালায় ঢেকে রাখতেন। বাড়ীর সকলের খাওয়া শেষ হলে, আহ্নিক সমাপন করে সকলের অগোচরে নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে রেখে আসতেন। দুটি শৃগাল এসে সে খাবার খেয়ে যেতো।

কিন্তু এ রহস্য বেশীদিন গুপ্ত রইলো না। এক অসতর্ক মুহূর্ত্তে প্রকাশ হয়ে পড়লো। আবার একদিন গৃহভৃত্য দেখলো এক অভাবনীয় দৃশ্য। গভীর রাত্রিতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেছে। পার্শ্ববর্ত্তী

বিছানাটি শূন্য। রান্নার ঠাকুরমশায় নেই। কোথাও নেই। ঘরেও নেই। বাইরেও নেই। কৌতুহলী চাকরটি অনুসন্ধান করতে লাগলো। হঠাৎ দেখতে পেলো ঠাকুর মশায়ের যোগাসীন দেহটি শূন্যে প্রায় ছাদের কাছে রয়েছে উঠে। ভৃত্যটি ভয়ে বিস্ময়ে চীৎকার করে উঠতেই দেহটি ভূমিতে গেল পড়ে। ঠাকুরমশায়ের অনুরোধেও ভৃত্যটি এ ঘটনার কথা গোপন রাখতে পারলো না। অভিভূত ভৃত্যটি পরদিন গৃহকর্তাকে বলে ফেললো সবকিছু।

ভৃত্যের মুখনিঃসৃত ঘটনাটি শুনে ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোক ও গৃহিণীর মনে দৃঢ়বিশ্বাস জন্মালো পাচকবৃত্তি গ্রহণ করলেও রামচন্দ্র একজন যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ। কারণ বিষয়বাসনার কোন প্রমাণই তাঁরা পান নি এতদিন রামচন্দ্রের আচরণে মুখের ভাষায় আর চোখের দৃষ্টিতে।

লজ্জিত হয়ে গৃহকর্তা রান্নার কাজ থেকে তাঁকে নিবৃত্ত করলেন। এবং নিযুক্ত করলেন ওঁরই অধীনস্থ এক ওভারসিয়ারের অধীনে পি. ডব্লিউ. ডি.র সরকারের কার্যে। ঠাকুরমশায়ের পদবী হলো সরকার মশায়। তবে লোকে বলতো রাম-ভাই। এই কর্মোপলক্ষেই রামভাই বদলী হয়ে এলেন নোয়াখালী থেকে ফেণীতে। আর এই শহরেই রামভাই প্রকাশিত হয়ে পড়লেন রামঠাকুররূপে।

নানা অলৌকিক বিভূতিলীলা প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে ভক্তবৃন্দ এসে ওঁর কাছে করতে লাগলো আত্মসমর্পণ। শত শত মানুষের মেলায় সকাল সন্ধ্যা মুখর হয়ে উঠলো রামভাইয়ের কুটীর। সব ওঁকে দেখবে। প্রণাম করবে। পূজা করবে আর শুনবে শ্রীমুখের কথা। রামচন্দ্র নয় শ্রীবিষ্ণু। বিষ্ণুর অবতার নয় স্বয়ং নারায়ণ। নিত্যতৃপ্ত সত্যনারায়ণ সত্যপীর শ্রী হয়ে যেন বিরাজ করছেন ফেণী শহরের ছোট্ট এক কুটিরে। হিন্দু মুসলমান সকলের কাছেই তিনি হয়ে উঠলেন ঠাকুর। প্রাণের ঠাকুর। ঘরের ঠাকুর রামঠাকুর। শুধু রামচন্দ্র নয়, শ্রীশ্রীঠাকুর রামচন্দ্রদেব। শ্রীশ্রী শ্রীশ্রীরামঠাকুর।

এই সময়ে কবিবর নবীনচন্দ্র সেন ছিলেন ফেনী মহকুমার হাকিম। তিনি 'আমার জীবন' গ্রন্থে রামঠাকুর সম্বন্ধে বলেছেন :

'রামঠাকুরের বাড়ী বিক্রমপুর। বয়স ২৬৷২৭ বৎসর মাত্র।...... দেখিতে ক্ষীণাঙ্গ সুন্দর শান্ত মূর্তি। নিতান্ত পীড়াপীড়ি না করিলে কাহারও সঙ্গে সাক্ষাৎ করে না। কোন কথা কহে না। পূর্বেই বলিয়াছি, তাহার ৮ হইতে ১২ বৎসর পর্যন্ত সামান্য বাংলা শিক্ষা মাত্র হইয়াছিল। কিন্তু ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব এমন কি প্রণবের অর্থ পর্যন্ত সে জলের মত বুঝাইয়া দিত। আমি তাহাকে বড় শ্রদ্ধা করিতাম। মধ্যে মধ্যে আমি তাহাকে পীড়াপীড়ি করিয়া আমার গৃহে আনাইতাম এবং পতি পত্নী মুগ্ধচিত্তে তাহার অদ্ভুত ব্যাখ্যা শুনিতাম। বলা বাহুল্য, সে পেশাদারী হিন্দু প্রচারকের ব্যাখ্যা নহে।'

বাংলা ১২৬৬ সনের ২১শে মাঘ বৃহস্পতিবার ইংরাজী ১৮৬০ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী শ্রীশ্রীরামঠাকুর আবির্ভূত হলেন এই পৃথিবীর মাটিতে। মানবলোকে। ফরিদপুর জেলার ডিঙ্গামাণিক গ্রামে। পিতা হলেন রাধামাধব চক্রবর্তী বিদ্যালঙ্কার। আর মাতা কমলাদেবী ছিলেন নিষ্ঠাবতী রমণী। তিনি পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান ছিলেন। তাইতো পৈতৃক সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী হয়ে ডিঙ্গামাণিকের বাড়ীতেই বসবাস করতেন। রাধামাধব চক্রবর্তী ছিলেন তন্ত্রাচারী যোগসিদ্ধ পুরুষ। বাড়ির পূর্বপ্রান্তে পঞ্চবটি যোগস্থলী নির্মাণ করে অধিকাংশ সময় যোগাভ্যাস ও সাধনভজন করে অতিবাহিত করতেন। সিদ্ধিলাভও করেছিলেন। এমনকি যেদিন যে সময়ে রামঠাকুর মাতৃগর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ হলেন সেই সময়েও তিনি ছিলেন সাধনমগ্ন। শীতের দিন বেলা দশটা। ঠাকুর ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর কমলাদেবী অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি থলের মধ্যে আর একটি পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হলো। প্রথম দিকে কেউ বুঝতে পারে নি। থলেটি অনাদৃত ভাবে ফেলে দেবার উপক্রম করলে সেই অবস্থায়, সেই মুহূর্তে, পিতৃদেব রাধামাধব

চক্রবর্তী পঞ্চবটি থেকে চিৎকার দিতে দিতে এসে উপস্থিত হলেন, '—ওরে তোরা ফেলিস না। ফেলিস না।' তারপর বাড়ীর ভিতর এসে থলে থেকে সন্তান বের করে প্রাণসঞ্চারের ব্যবস্থা করলেন। এই সন্তানই হলো রামঠাকুরের সহজাত ভ্রাতা লক্ষ্মণঠাকুর। সর্ব জ্যেষ্ঠ কালীকুমার। মধ্যম হলেন জগবন্ধু আর একমাত্র ভগিনী হলেন কাশীমণিদেবী। – রামঠাকুর হলেন পিতামাতার তৃতীয় পুত্র। দিনে দিনে শিশুদ্বয় বড় হয়ে ওঠে। সপ্তাহ, মাস, বছর ঘুরে আসে। এক সঙ্গেই ওদের চলাফেরা খেলাধূলা। সবকিছু। 'অভিন্নাত্মা দুই সহোদর। রাম আর লক্ষ্মণ। শৈশবকাল থেকেই রামচন্দ্রের অসাধারণত্ব প্রকাশ পায় স্মৃতিশক্তিতে। খেলাধূলায়, লেখাপড়ায় তেমন মন নেই। গ্রামের পাঠশালায় ভর্তিও হলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই বর্ণের সঙ্গেও হলো পরিচয়। কিন্তু পাঠশালায় বেশী সময় আবদ্ধ থাকতে তাঁর মন চায় না। মন পড়ে থাকে কীর্তন, রামায়ণ গান, ভাগবত পাঠের আসরে। রামায়ণ গান শুনে সরল বালক সরল মনে মাকে প্রশ্ন করে—মাগো, রামায়ণ গান শুনতে যাই, সেখানে কেবল আমাদের দুই ভাইয়ের কথাই কেন বলে? অবোধ বালকের কথা শুনে মা মৃদু মৃদু হাসেন। স্কুলের সময়টুকু ছাড়া বাকী সময় বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায় আর সংগ্রহ করে নানারকমের গাছগাছড়া লতাপাতা। আর এইগুলিই ছিল ওদের উভয় ভ্রাতার আহারের প্রধান উপাদান। অর্থাৎ কি ভাবে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনের অধিক না খেয়ে থাকা যায় তারই সাধনা চলছিল বাল্যকাল থেকেই।

পিতৃদেব রাধামাধব চক্রবর্তী ছিলেন উদাসীন প্রকৃতির। তাই তো স্নেহময়ী জননীর আর চিন্তার অবধি ছিল না। পণ্ডিত বাড়ীর ছেলে কি মূর্খ হয়ে থাকবে? লেখাপড়ায় নেই মন, ঘুরে বেড়ায় এখানে ওখানে উদাস মনে। লক্ষ্মণচন্দ্র ত হরিনামে এত বিভোর হয়ে থাকে যে পাড়ার লোকে বলে 'হরিবলা ঠাকুর'। ব্রাহ্মণের সন্তান কি করেই বা খাবে? মায়ের মনে জাগে নানা প্রশ্ন। নানা দুশ্চিন্তা।

রামচন্দ্রের কিন্তু কোন দিকেই ভ্রূক্ষেপ নেই। পুত্রবৎসলা জননীর মানসিক চঞ্চলতা দেখে মৃদু মৃদু হাসেন। নিয়তিদেবীও হেসে ওঠেন। হাসেন সৃষ্টিকর্তা। বিহগকুল কলরব কূজন করে ওঠে। এইভাবে দিনের আলোয় রাত্রির অন্ধকারে বালকের ছদ্মবেশে আত্মগোপন করে অনাদিকালের দেব মানব দুর্জ্ঞেয় মহাভাবের শৈশবলীলায় পৃথিবীর মানুষের নিকট তখনও হয়ে রইলেন অপ্রকাশ।

অকস্মাৎ ভগবৎ ভাবের এই ছোট্ট পরিবারটির উপর প্রতিফলিত হলো কৃষ্ণমেঘের কালো প্রতিচ্ছায়া। পিতৃদেব রাধামাধব চক্রবর্তী দেহলীলা সম্বরণ করলেন। ১২৭৩ সালে। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়সে। যোগীবর রাধামাধবের অন্তিম সময়ের ঘটনাটিও বিস্ময়কর। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার সময় ওঁর হৃদয়ে জাগ্রত হলো দুর্নিবার ইচ্ছা গুরুদেবকে দর্শন করবেন প্রণাম করবেন। আর চরণধূলি মস্তকে ধারণ করবেন। গুরুদেব হলেন সিদ্ধ তন্ত্রাচার্য মৃত্যুঞ্জয় ন্যায়পঞ্চানন। বেলপুকুরের সুবিখ্যাত ঠাকুর বংশের সন্তান। অভয়ানন্দ ঠাকুরের পৌত্র এবং রুদ্রদেব তর্কপঞ্চাননের পুত্র। শক্তিসিদ্ধ গুরুদেব প্রিয় শিষ্যের মনের ইচ্ছা অনুভব করলেন শিষ্য বাড়ী, কাছারে বসে। এবং কাছার থেকে এলেন ছুটে ডিঙ্গামাণিক গ্রামে। যোগী শিষ্যের আকর্ষণে। হৃদয়ের আহ্বানে। গুরুদেব এসে দাঁড়ালেন শিষ্যের সম্মুখে। ক্ষণিকের জন্য চোখ উন্মীলন করলেন শিষ্য। মুখে তাঁর সুস্মিত হাসি। মস্তকে স্পর্শ করলেন গুরুর চরণকমল। পরমুহূর্তেই চোখ রুদ্ধ করে চিরকালের মত বিদায় নিলেন এ পৃথিবী থেকে রাধামাধব। তপস্যা-ভাস্বর তন্ত্রসিদ্ধ রাধামাধব। রামচন্দ্রের বয়স তখন মাত্র আট বৎসর।

দিন মাস ও বৎসর হলো অতিক্রান্ত। অকস্মাৎ একদিন গুরু মৃত্যুঞ্জয় ন্যায়পঞ্চাননও হয়ে পড়লেন অসুস্থ। নিজগৃহে। জপসা গ্রামে। দক্ষিণ বিক্রমপুরের জপসা গ্রাম। রামচন্দ্রের আদি নিবাস। আজ আর সে গ্রামের কোন চিহ্নই নেই। কীর্তিনাশার জল একেবারে ধুয়ে মুছে শেষ করে দিয়েছে সেই গ্রামের শেষ দেউলের ভিত।

কমলাদেবী কনিষ্ঠ পুত্রদ্বয় রাম ও লক্ষ্মণকে নিয়ে জপসা গ্রামে গুরুগৃহে ছুটে এলেন। গুরুকে দর্শন করবার জন্য। গুরু যে রামচন্দ্রকে খুবই স্নেহ করেন। রামচন্দ্রকে কাছে পেয়ে প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন। পরমুহূর্তেই তাপসিকের জীবন ক্লান্ত হয়ে যেন বিশ্রাম লাভের জন্য শান্ত হয়ে গেল চিরতরে।

স্নেহময় পিতা আর পিতৃগুরুর মৃত্যু বালক রামচন্দ্রের জীবন-ধারায় এনে দিল আমূল পরিবর্তন। বালসুলভ চপলতা চঞ্চলতা হলো দূরীভূত। ধীরে ধীরে অন্তর্মুখী হয়ে উঠলো। ধৈর্য গাম্ভীর্য ও সরলতার প্রতিমূর্তি হয়ে উঠলো সে। মায়াময় সংসারের উপর জন্মাল বিরাগ। এইভাবেই তার জীবনের দ্বাদশটি বৎসর হলো অতিক্রান্ত। ইতিমধ্যে তার উপনয়ন সংস্কারও হয়েছে সম্পন্ন। সাবিত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ার পর দ্বিজোচিত ত্রিসন্ধ্যাবন্দনাদি কার্যেও মনোনিবেশ করেছে সে। কিন্তু কিসের এক তীব্র আকর্ষণে মন প্রাণ আকুল হলো তার। এ যে ঘর ভাঙ্গার, কূল ভাঙ্গার আহ্বান। ভগবানের হাতছানি!

আর একটি নূতন দিন। সেদিন ছিল অক্ষয় তৃতীয়া তিথি। রামচন্দ্রের জীবন আলোকিত হয়ে উঠলো। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল গভীর রাত্রিতে। দেখতে পেলো সে আজানুলম্বিত বাহু সুদীর্ঘ জটাজুটধারী দীর্ঘ শ্মশ্রুমণ্ডিত তেজঃপুঞ্জ নয়নযুক্ত এক মহাপুরুষ সম্মুখে দণ্ডায়মান। কল্পনা নয়। স্বপ্নও নয়। ছায়ামূর্তির মত তাঁরই সম্মুখে বর্তমান। বিস্মিত নেত্রে অবলোকন করলো সে গুরুরূপী মহাপুরুষকে। মুগ্ধ ও অভিভূত হলো বালক রামচন্দ্র। কয়েক মুহূর্তমাত্র। দীক্ষা দান করেই হলেন অন্তর্হিত। অনির্বচনীয় এক আনন্দসাগরে অবগাহন করে ধন্য হলো বালক। ভবিষ্যতের রামঠাকুর। অন্তরে অন্তরে প্রবাহিত হয়ে চললো আনন্দের অমৃত স্রোত ধারা। আনন্দ ...আনন্দ...আনন্দ...ওগো মহানন্দ...অনন্ত অপার!

এই ঘটনার কিছুদিনের মধ্যেই সকলের অলক্ষিতে বালক রামচন্দ্র গৃহ থেকে হলো অন্তর্হিত। কিসের এক আকর্ষণে ব্যাকুল হয়ে সে

ছুটে চললো প্রসিদ্ধ শক্তিপীঠ কামাখ্যা অভিমুখে। পথ অতি দুর্গম দুরধিগম্য। শ্বাপদসঙ্কুল। তখন আসাম বেঙ্গল রেললাইন হয়নি। তীর্থযাত্রীরা যাতায়াত করতো পদব্রজে বা নৌকাযোগে। দলবদ্ধ হয়ে। কিন্তু রামচন্দ্র একাকী দুস্তর গিরিশ্রেণীর ভিতর দিয়ে দুর্গমপথে পদব্রজে চলতে লাগলো। অপরিসীম ধৈর্য মনোবল ও কষ্টসহিষ্ণুতার বলে একদিন সে অতিক্রম করলো সেই দুর্গম পথ। এসে উপস্থিত হলো কামাখ্যা দেবীর মন্দিরে।

ধীরে ধীরে নেমে এলো সন্ধ্যার অন্ধকার। আকাশের সুবর্ণ আভা গেল মিলিয়ে। নীরবে রামচন্দ্র এসে বসলো মন্দিরের বারান্দায়। অনির্বচনীয় এক মহাভাবের প্রেরণায় আত্মহারা হলো সে। দৃষ্টি শান্ত সুগম্ভীর। সম্মুখের নির্জন উদাস মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশটি তার মনের উপর করে ফেললো প্রভাব বিস্তার। মন্দিরের মাথার উপর নক্ষত্র ছড়ানো দূরপ্রসারী অন্ধকার আকাশ। আর সেই অন্ধকারকে অপসারিত করে দূর পাহাড়ের মাথায় ধীরে ধীরে উঠতে থাকে চাঁদ। সেই উদীয়মান চন্দ্রের পটভূমিতে কামাখ্যা মন্দির অপরূপ অপার্থিব এক সৌন্দর্যের মূর্তি ধারণ করে উদাস করে তুললো ভাবানন্দময় কিশোর তাপস রামচন্দ্রকে। জপনিবিষ্ট হলো। রাত্রি গভীর হতে গভীরতর হয়ে ওঠে। নীরব নিস্তব্ধ চতুর্দিক। মধ্যরাত্রির সেই নীরবতাকে ভঙ্গ করে অকস্মাৎ গুরুগম্ভীর কণ্ঠের আহ্বান উত্থিত হয়।

রাম! রাম! সেই অদ্ভুত মোহময় কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ নিকটবর্তী হতে থাকে। জপ থেমে যায়। ভীত বিস্মিত ও কৌতুহলী হয়ে মন্দিরের বাইরে এসে দাঁড়ায় সে। দেখতে পায় তেজঃপুঞ্জ জটাজুটধারী এক মহাপুরুষকে। প্রথম দর্শনেই চিনতে পারলো, ইনিই সেই মহাপুরুষ যিনি অলৌকিক ভাবে বীজমন্ত্র দিয়েছিলেন ওকে। এঁরই প্রদত্ত মন্ত্র এতক্ষণ জপ করেছিলো সে। মন্ত্রশক্তির ক্রিয়াও শুরু হয়েছিলো তার দেহে-মনে। এবার নিঃসন্দেহ হলো ইনিই তার আধ্যাত্মিক জীবনের নিয়ন্তা। অভিভূত হয়ে তাঁর

চরণে লুটিয়ে পড়লো কিশোর তাপস রামচন্দ্র। ভবিষ্যতের মহাযোগী শ্রীশ্রীরামঠাকুর। স্নেহার্দ্র কণ্ঠে মহাপুরুষ বললেন, রাম, আমি তোমার জন্যই এতদিন অপেক্ষা করছিলাম। তুমি এখন শ্রান্ত, ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর। ওঠো, আমাকে অনুসরণ করো।

তারপর আঁকাবাঁকা পার্বত্যপথে রাম অনুসরণ করতে লাগলো গুরুদেবকে। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে এক পার্বত্য গুহাতে উভয়ে প্রবেশ করলো। চকমকি ঠুকে জ্বালানো হলো প্রদীপ। দেখা গেল সম্মুখে একটি প্রশস্ত ভূগর্ভ কক্ষ। ক্ষীণ দীপালোকে সবকিছু দৃষ্টিগোচর হয় না। এবারে মহাপুরুষ ইঙ্গিত করলেন ওকে বিশ্রাম করবার জন্য। পরমুহূর্তেই এক অভাবনীয় দৃশ্য অপার বিস্ময়ে দেখলো রামচন্দ্র। মহাপুরুষ তাঁর জ্যোতির্ময় হস্ত করলেন প্রসারিত। দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হয়ে উঠলো। গুহার প্রান্তদেশে গিয়ে পৌঁছলো সে দিব্যহস্ত। তুলে নিলেন ফল সহ মৃৎপাত্রটি। ধরলেন রামের সম্মুখে। আদেশ করলেন শিষ্য রামকে ফল প্রসাদ গ্রহণ করবার জন্য। মোহাচ্ছন্নের মত রামচন্দ্র সে ফল প্রসাদ গ্রহণ করলো। অচিন্তনীয় ব্যাপার। ক্ষুধা তৃষ্ণা অবসাদসবকিছু এক মুহূর্তেই কোথায় যেন হলো অন্তর্হিত। সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে স্ফুরিত হয়ে উঠলো এক নূতন উপলব্ধি। আধ্যাত্মিক উপলব্ধি। এই ভাবেই অতিক্রান্ত হলো সমস্ত রাত্রি।

আবার সে রাত্রিরও হলো অবসান। নব উষার আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো বনভূমি। সুপ্ত প্রান্তর। বিহঙ্গদলের প্রভাত কলকাকলী হলো সুরু। রামচন্দ্র গুরুদেবের আদেশে ব্রহ্মপুত্র নদ থেকে এলো স্নান করে। শুভলগ্নে মহাপুরুষ আনুষ্ঠানিক ভাবে দীক্ষা প্রদান করলেন রামচন্দ্রকে। সেই একই বীজমন্ত্র—একদিন অলৌকিক ভাবে যে বীজমন্ত্র পেয়েছিলো সে গৃহে। এই দীক্ষা, বীজ-মন্ত্রের প্রভাবেই কিশোর তাপস রামচন্দ্র একদিন মহাশক্তিধর সাধক রূপে শ্রীশ্রীরামঠাকুর নামে বাংলার অধ্যাত্মসমাজে পরিচিত হয়ে ওঠেন।

পরবর্তীকালে রামঠাকুর তাঁর গুরুদেব সম্বন্ধে বলেছেন, 'তাঁর মস্তকে দীর্ঘ জটা, উদর স্ফীত, নাভিদেশ গভীর, বাহুদ্বয় দীর্ঘ আজানুলম্বিত, কপাল প্রশস্ত, তিনি যেন শান্তি ও দয়ার প্রতি-মূর্তি। তিনি অনঙ্গদেব নামে পরিচিত। নিগম চিত্তের প্রকাশক। অনঙ্গ মঞ্জরী স্বরূপ। ভগবানের স্বরূপ শক্তি।'

আবার যাত্রা হলো সুরু। চলার আর শেষ নেই। পথ অনেক দূর। অনেক দুরারোহ। নদী পেরিয়ে পাহাড় ডিঙিয়ে উপত্যকা ছাড়িয়ে, দূর থেকে দূরে চলেছেন কিশোর যোগী রামচন্দ্র ও গুরু অনঙ্গদেব আর দুজন গুরুভাই বৃন্দারণ্য ও চৈতন্যভুক। হিমালয়ের তীর্থে তীর্থে আশ্রমে আশ্রমে। এই মহাপুণ্য হিমালয়ের স্তরে স্তরে একদিন পরিভ্রমণ করেছেন আর্য ঋষিগণ। শ্রীজ্ঞান দীপঙ্কর। গৌতম বুদ্ধ। মহাবীর। শঙ্করাচার্য। আর আজ চলেছেন বালক সাধু রামচন্দ্র। ঠাকুর শ্রীশ্রীরামচন্দ্রদেব। রামঠাকুর। অবশেষে তাঁরা এসে উপস্থিত হলেন অতি দুর্গম এক হিমালয় শৃঙ্গে এক সুবৃহৎ গোঁফাতে। সেই গোঁফার মধ্যে রয়েছে সাতখানি আসন। ছয়-খানি আসনে ছয়জন মহাপুরুষ যোগাসীন। একখানি আসন শূন্য। বসা অবস্থায় সেই মূর্তি এত অতিকায় যে সাধারণ মানুষের দাঁড়ানো অবস্থার চেয়েও উচু। এই মূর্তিগুলি মৃন্ময় কি প্রস্তরময়, কিঁ চিন্ময়, জীবিত কি মৃত তা বুঝবার সাধ্য নাই। আসনস্থ যোগাসীন মহাপুরুষদের সেবা করার ভার দিলেন রামচন্দ্রকে গুরুদেব। তারপর অপর দুই শিষ্যকে নিয়ে অদৃশ্য হলেন তিনি গভীর অরণ্যে। এই শৃঙ্গেরই একদিকে একটি মনোরম পুষ্পোদ্যান। মনে হয় সেখানে আবহমান কাল ধরে পূর্ণ বিকশিত সৌরভময় নানাবর্ণের পুষ্প রাজি বিরাজমান। এই উদ্যানেরই নাম 'নন্দন কানন'। আর গোঁফার অপরদিকে যে স্রোতস্বিনী তার নাম মন্দাকিনী। রামচন্দ্রের কাজ হলো নন্দন কানন থেকে পুষ্প চয়ন করে মন্দাকিনী থেকে পানীয় জল আর বৃক্ষ থেকে ফল আহরণ করে নিয়ে এসে ছয়জন যোগীর সেবা করা। এইভাবে হিমালয়ের নিভৃতে একাকী সেবায় রত হলেন

রামচন্দ্র। দিন মাস বছরও অতিক্রান্ত হলো। যোগীরা কিন্তু নীরব। নিস্পন্দ। অকস্মাৎ একদিন রামচন্দ্রের জীবনে শুভমুহূর্তটা এসে হলো উপস্থিত। সেদিনটিতেও প্রতিদিনের মত সেবাকার্য সমাধা করে প্রণাম করতেই ছয় মূর্তির ছয়খানা দিব্য হাত ওর মস্তকোপরি হলো প্রসারিত। সেই মুহূর্তে গুরুদেবও হঠাৎ হলেন আবির্ভূত। সবকিছু দেখে মৃদু হেসে রামচন্দ্রকে বললেন, 'রাম,তোমার সেবায় ওঁরা সন্তুষ্ট হয়েছেন, এখন তুমি কি করবে? একখানা আসন খালি আছে। ইচ্ছা করলে এখানেই যোগসাধনা করতে পারো।'

আমি কিছু জানি না। যা আপনার অভিরুচি। বললেন তরুণ তাপস।

এবারে গুরুদেব একটু চিন্তিত হলেন। ধীর গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, না থাক, তোমার কাজ লোকালয়ে। ভবিষ্যতে সেখানেই তোমাকে যেতে হবে।

শিষ্যকে নিয়ে গুরুদেব আবার বেরিয়ে পড়লেন। হিমালয়ের পথে পথে। কৌশিক আশ্রম, যোগেশ্বর আশ্রম, সিদ্ধাশ্রম অভিমুখে। বদরিকাশ্রম মানস সরোবর ও তিব্বতের বিভিন্ন স্থানে। পূর্ব পশ্চিম ও উত্তর হিমালয়ের গভীর অরণ্যানী প্রদেশে। মন্দিরে মন্দিরে। আশ্রমে আশ্রমে। দুর্গম দুরধিগম্য পথে পথে। গুরুদেব কখনও সঙ্গে থাকছেন আবার কখনও অন্তর্হিত হচ্ছেন। গুরুদেব সম্বন্ধে ঠাকুর পরবর্তী কালে বলেন, 'নাই অঙ্গ যার' 'অনঙ্গ'। তাইতো অনেকে অনুমান করেন ঠাকুরের গুরুদেব ছিলেন 'বিদেহী'। স্থূল দেহধারী নন।

একসময় একাকী হিমালয়ের নির্জন পথে চলেছেন রামচন্দ্র। হঠাৎ কোথা থেকে এক সাধু এসে ওঁকে দিলেন একটি শালগ্রাম। বললেন, এর সেবা করো। নিম্নভূমিতে গেলে দেখতে পাবে এক রাজবাড়ী। সেই রাজাকে দেখাবে এই শালগ্রামশিলাটি। তিনি দেখলেই এই শালগ্রামের সেবার ব্যবস্থা করবেন। রামচন্দ্র শালগ্রামটি নিয়ে সাধুর নির্দেশ মত নিম্নভূমির দিকে হলেন অগ্রসর।

কিছুদূর গিয়ে সত্য সত্যিই এক রাজবাড়ী পেলেন দেখতে। কিন্তু রাজবাড়ীতে প্রবেশ করতে পারলেন না। দ্বারপাল দিল বাধা। কোন কথাই চাইল না শুনতে। পাগল মনে করে অপমান করে তাগিয়ে দিল। রামচন্দ্রও বাধা পেয়ে আবার বনভূমির দিকে হলেন অগ্রসর। কিছু সময় পরেই নেমে এলো সন্ধ্যার অন্ধকার। হিমালয়ের শ্বাপদসঙ্কুল গভীর অরণ্য। বাঘ ভাল্লুকের ডাকও শোনা যেতে লাগলো। শালগ্রামকে কণ্ঠে নিয়ে অপমানিত রামচন্দ্র নিরাশ মনে এক বৃক্ষনিম্নে পড়লেন বসে। জপনিবিষ্ট হলেন। শঙ্কা ভয় দূরীভূত হলো। আরও বিচিত্র ব্যাপার, হিংস্র জানোয়াররা রাত্রির অন্ধকারে ওঁর আশপাশ দিয়েই চলাফেরা করতে লাগলো। কিন্তু ওঁর প্রতি হিংসা ভাব পোষণ করলো না। এই অভিজ্ঞতা থেকে পরবর্তী কালে ঠাকুর বলেন, 'নিজের মধ্যে হিংসা না থাকিলে অপরেও হিংসা করে না। প্রাণের সঙ্গে আত্মীয়তা করিয়া লইতে পারিলে সকল প্রাণীই আত্মীয় হইয়া যায়। কাহারও সহিত আর কোন বাদবিসম্বাদ থাকে না।'

ক্লান্ত পরিশ্রান্ত রামচন্দ্র ধীরে ধীরে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। অকস্মাৎ চমকে উঠলেন বাদ্যধ্বনি আর হৈরৈ শব্দে। বহু লোকের চলাফেরায় নির্জন অরণ্যের বাতাসও হয়ে উঠেছিল আলোড়িত। মশাল হাতে অনেকগুলি লোক শ্বাপদের মত তাঁর দিকেই ছুটে আসছে। নবীন যোগীর মন হলো বিচলিত। তিন চারজন লোক তার সম্মুখে এসে চিৎকার করে কি যেন বললো। উল্লাসে আরও সকলে এলো ছুটে। ওদের ভাষাও যে দুর্বোধ্য। পশ্চাতে দেখা গেল দুটি পাল্কী। বাহকেরা নামালো ওরই সামনে। ভেতর থেকে নামলেন রাজা আর রাণী। তরুণ তাপস রামচন্দ্রের চরণে মাথা লুটিয়ে প্রণাম করে ক্ষমা ভিক্ষা চাইলেন উভয়ে।

দুপুরে ঘুমের মধ্যে রাণী স্বপ্ন দেখেছেন স্বয়ং বিষ্ণু বিষণ্ণ ও বেদনা-মলিন মুখ নিয়ে তাঁর সম্মুখে এসে বলছেন,—তোর দ্বারপাল আমাকে অপমান করেছে। আমার সেবা পূজার জন্য যে সন্ন্যাসী

এসেছিল তাকে পাগল বলে তাড়িয়ে দিয়েছে। শীঘ্র তার কাছে জলা ভিক্ষা করে আমাকে প্রতিষ্ঠা করবার ব্যবস্থা কর্। আমিই যে তার কণ্ঠের শালগ্রামশিলা। সে অমুক বৃক্ষের নীচে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে আছে। আমার আদেশ পালন না করলে তোর সর্বনাশ হবে। সবকিছুই খুলে বললেন রাণী অনুতপ্ত হৃদয়ে তরুণ তাপসকে।

ঘটনাটি শুনে তরুণ তাপস নির্দেশ দিলেন এই বনভূমিতেই শালগ্রামশিলাকে প্রতিষ্ঠা করতে। রাজা ও রাণী রামঠাকুরের আদেশকে শিরোধার্য করে সেই অরণ্যেই নির্মাণ করেছিলেন বিশাল এক মন্দির। শ্রীবিষ্ণুর মন্দির।

এখানকার লীলা সমাপন করে নবীন সাধক রামঠাকুর আবার করলেন যাত্রা। বিহঙ্গ কাকলী ভরা ছোট ছোট পাহাড়ী গ্রাম পেরিয়ে। দেওদারের বন ছাড়িয়ে। অজস্র জলধারা, অফুরন্ত অরণ্যলোক, অসংখ্য উপত্যকা, তার সঙ্গে ধবল তুষারের দৃশ্য, নীলাঞ্জনয়না গিরি নদী বন্য পার্বত্য প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য দেখতে দেখতে রামঠাকুর চলেছেন বশিষ্ঠাশ্রম অভিমুখে। গুরুর আদেশে। রামঠাকুর এখন আর নিতান্ত বালক নন। যৌবনশ্রী দেখা দিয়েছে। সুন্দর শান্ত মূর্তি।

দুর্গম পথে দুই দিন চলার পর। একদিন এক অভাবনীয় ঘটনার হলেন সম্মুখীন। হঠাৎ এক ভয়ঙ্কর মূর্তির ভৈরব এসে হিংস্র বাঘের মতই যেন থাবা তুলে পথরোধ করে দাঁড়ালো। তার মাথায় জটা। কপালে বিরাট সিঁদুরের টিপ। গলায় হাতে রুদ্রাক্ষের মালা। অঘোরপন্থী সাধক। আহার্য হলো মড়ার মাংস আর কারণ-বারি। রামঠাকুর যেই অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করেছেন অমনি চিমটার আঘাত করে বাধা দিল। তীব্র বেগে ফোয়ারার মত হতে লাগলো রক্তক্ষরণ। নবীন সন্ন্যাসী রামঠাকুর কোনরূপ হিংসা প্রকাশ করলেন না। রইলেন নির্বিকার। নবীন সন্ন্যাসীকে দৃঢ় নির্বিকার অচল অটল দেখে ভয় পেলো অঘোরপন্থী সাধক। অলৌকিক ভাবে অতি দ্রুত রক্তক্ষরণ দিল বন্ধ করে।

তারপর ওর হাতের জবাফুলের মালা থেকে একটা ফুল রামঠাকুরের হাতে দিয়ে বললো, 'ধর্, নে।' পরমুহূর্তেই জঙ্গলের মধ্যে হয়ে গেল অদৃশ্য। আবার যাত্রা হলো সুরু। এ যেন হিমালয় অভিযানে চলেছেন তাপস রামঠাকুর। সকাল গেল, দুপুর গেল, সন্ধ্যাও হলো অতিক্রান্ত। ধীরে ধীরে নেমে এলো রাত্রির অন্ধকার। চতুর্দিক জনমানবশূন্য। ভীষণ গহন অরণ্য ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। হঠাৎ কোথা থেকে সম্মুখে এসে দাঁড়ালো পাহাড়ী দুটি ছেলে আর মেয়ে। মনে হয় তারা দুটি ভাই বোন। বালগোপালের মত সুন্দর সুকুমার দেহ। কিন্তু ভাষা দুর্বোধ্য। ইঙ্গিতে ওরা ওদের অনুসরণ করতে বললো। রামঠাকুর কৌতুহলী হয়ে ওদের অনুসরণ করলেন। পার্বত্য আঁকাবাঁকা পথে। বহুদূর হেঁটে এক মনোরম স্থানে এসে হলেন উপস্থিত। সামনেই একটি সুন্দর গৃহ। বহির্ভাগে চণ্ডীমণ্ডপ। সেই চণ্ডীমণ্ডপেই অতিথি রামঠাকুরের রাত্রি যাপনের হলো ব্যবস্থা। সুন্দর বিছানাপত্র। তৃপ্তিকর আহার্য। সুমিষ্ট ফলফলাদি। ঘন দুধ। ক্ষীরের প্রস্তুত লাড়ু ও মিষ্টি। আহারের পরই নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন নবীন সন্ন্যাসী রামঠাকুর। যখন নিদ্রাভঙ্গ হলো তখন সুরু হয়েছে বনভূমিতে বিহঙ্গদলের প্রভাত কলকাকলী। বিস্মিত হয়ে দেখলেন বিশাল এক বৃক্ষনিম্নে তিনি শুয়ে আছেন। কোথায় তাঁর আশ্রয়দাতা। আর কোথায় গেল সেই সুন্দর অট্টালিকার মনোরম চণ্ডীমণ্ডপ। এসব গুরু অনঙ্গদেবের কৃপা ছাড়া আর কি। সবই যে বিভূতিপূর্ণ স্থান। অনির্বচনীয় আনন্দে বিভোর হলেন রামঠাকুর। হিমালয়ের এইসব অপ্রাকৃত সাধনভূমিতে প্রবেশের অধিকার সহজলভ্য নয়। পরিব্রাজনের ফাঁকে ফাঁকে নবীন শিষ্যের জীবনের স্তরে স্তরে আত্মপ্রকাশ করছিলো সাধনা ও সিদ্ধির নূতন নূতন অভিজ্ঞতা। অধ্যাত্মপথের নানা নিগূঢ় নির্দেশ গুরু দিনের পর দিন দান করছিলেন। এইসব অপ্রাকৃত সাধনভূমি ও আশ্রম সম্বন্ধে ঠাকুর পরবর্তীকালে বলেন,

'যোগসিদ্ধ দেহ না হইলে কেহ ঐসব স্থানে যাইতে পারে না। সাধারণ লোকের পক্ষে সেই স্থানে যাওয়া সম্ভব নহে।' এই প্রসঙ্গে ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ বলছেন :

'রামঠাকুরের জীবন ছিল অলৌকিক রহস্যময়। তিনি নিজে পূর্বজীবনের বহু কথা প্রসঙ্গত বলিতেন। তাঁহার জীবনের অভিজ্ঞতা এত বিচিত্র ছিল যে তাহা অনেক সময় সাধারণ লোকের বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে না হইবারই কথা। তাঁহার হিমালয়ে অবস্থানকালে বহু অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছিল।......তাঁহার গুরুদেবের কথা যাহা আমি তাঁহার সংসর্গ হইতে ক্রমশঃ জানিতে পারিয়াছিলাম তাহাও অত্যন্ত অলৌকিক।'*

অকস্মাৎ সত্যানুসন্ধানী রামঠাকুরের অন্তর হিমালয়ের ঐ নির্জন পরিবেশে আশ্চর্য এক অনুভূতিতে হয়ে উঠলো আচ্ছন্ন। তাঁর হৃদয়তন্ত্রী কার মধুর স্পর্শে যেন এক অতি সুমধুর তানে উঠলো বেজে। মনের সকল রুদ্ধ দুয়ার গেল খুলে। মনে হতে লাগলো জগৎটা যেন কি এক আনন্দে পূর্ণ ও চৈতন্যময়। সে আনন্দের শেষ নাই। সীমা নাই। বৃক্ষলতা, পাহাড় পর্বত, আকাশ, বায়ু, জল, স্থল সকলই যেন কি এক আনন্দে পূর্ণ। সে আনন্দের ছটায় চারিদিক উদ্ভাসিত। তারপর 'অব্যক্তং, অচিন্ত্যং অনির্বচনীয়ং' অবস্থা। এইরূপ স্থির নিশ্চল নিস্পন্দভাবে বহুক্ষণ হয়ে গেল অতীত। মুখমণ্ডল ব্রহ্মানন্দে হয়ে উঠলো জ্যোতির্ময়। নবীন সন্ন্যাসী তরুণ তাপস রামঠাকুরের ব্রহ্মানুভূতি হলো লাভ। ব্রহ্মানন্দে বিভোর হলেন। কিন্তু এই আনন্দ তাঁর আর ইচ্ছা হলো না ভোগ করতে। জীবজগতের জন্য কেঁদে উঠলো প্রাণ। মনে মনে ভাবলেন তিনি যে অমৃত আহরণ করেছেন সকলেই করুক তার ফল ভোগ। তাপিত জীবজগৎ হোক আনন্দময়। মনে পড়লো গুরুদেবের কথা, 'তোর লোকালয়ে কাজ রয়েছে।' গুরু

* সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ ১ম খণ্ড, ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ।

সত্যকে শুধু জানা নয়, সেই মহাসত্যকে প্রকাশ করা। প্রচার করা। দুর্বল অসহায় মুমুক্ষু মানুষের হৃদয়ে ধর্মের বিশুদ্ধ বীজ বপন করাই যে তাঁর জীবনব্রত। আকুল হলো প্রাণ। দুঃখী তাপী মানুষের জন্য।

তাইতো আবার যাত্রা করলেন নিম্নভূমির দিকে। রামচন্দ্র সুদীর্ঘ বারো তেরো বছর দুর্গম হিমালয়ে সাধনা করে ফিরে এলেন জন্মভূমি ডিঙ্গামাণিক গ্রামে। রইলেন প্রচ্ছন্ন। কর্মোপলক্ষে এলেন নোয়াখালী ও ফেণী শহরে। নিজের অলক্ষিতেই প্রকাশ হয়ে পড়লো বিভূতিলীলা। সাধারণ মানুষের কাছে। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ আর পাচক ব্রাহ্মণ—ওয়ার্ক সরকার রামচন্দ্র চক্রবর্তী হয়ে বেশীদিন প্রচ্ছন্ন থাকতে পারলেন না। তাঁর যোগ-বিভূতি নিয়েই তিনি প্রকাশিত হয়ে পড়লেন। শ্রীশ্রীঠাকুর রামচন্দ্রদেব রূপে। শ্রীশ্রীরামঠাকুর রূপে জনমানুষের প্রাণের ঠাকুর, ঘরের ঠাকুর হয়ে পড়লেন। আবার প্রাণের ঠাকুর রামঠাকুর হঠাৎ সবকিছু ছেড়ে দিয়ে ফেণী শহর থেকে হলেন অদৃশ্য। এসে উপস্থিত হলেন ডিঙ্গামাণিক গ্রামে। মাতৃভক্ত রামঠাকুর মায়ের সেবায় করলেন মনোনিবেশ। মাতৃভক্তি ছিল তাঁর অতুলনীয়।

এখানেও হতে লাগলো ভক্ত সমাগম। দলে দলে হিন্দু মুসলমান ভক্তবৃন্দ এসে মিলিত হতে লাগলো। সকলকেই তিনি সহজ সরল ভাষায় ধর্মোপদেশ দিতে লাগলেন। নিজের জীবনে দীর্ঘ সাধনার ফলে যা পরম সত্য বলে অনুভব করেছেন, তাই সাধারণ ভক্তবৃন্দের মধ্যে করতে লাগলেন পরিবেশন। উপনিষদ গীতার বাণীও সরল করে সহজ করে দৈনন্দিন কর্মজীবনের উপযোগী করে ব্যাখ্যা করতে লাগলেন।

'নিজে শান্ত না হলে কখনও শান্তি পাওয়া যায় না। মানুষ শান্তিই খুঁজে বেড়ায়, কিন্তু কি কৌশলে যে উহাকে লাভ করতে হয় তা জানে না। ভালমন্দ জয়-পরাজয় নিয়ে থাকলে কামনা বাসনা দূর হয় না। চিত্তের উদ্বেগ দৈন্য অপসারিত হয় না। চিরদিনই হাহাকার ছুটাছুটি করে বেড়াতে হয়। নিত্যবস্তু বা স্বভাবের সঙ্গ

না করলে দুঃখের হাত থেকে এড়াবার আর অন্য উপায় নাই। কর্তৃত্ববুদ্ধি একেবারে বিসর্জন না দিলে শান্তিলাভ করা অসম্ভব।' বলছেন রামঠাকুর ভক্তবৃন্দ পরিবৃত হয়ে।

মানসিক সকল প্রকার রোগেই তিনি একই মহৌষধ 'নাম সেবন' করতে বলতেন। হাতুড়ে বৈদ্যের মত মূল রোগ ধরতে না পেরে নানারকম ঔষধ প্রয়োগে রোগীর অবস্থা আরও সঙ্কটাপন্ন করে তুলতেন না। বলতেন, 'নাম করেন—নাম করেন। সর্বদা নাম করবেন। নামের মধ্যেই বীজ আছে। তাই নাম করতে করতে বীজ স্ফুরণ হবে। সবার মধ্যেই সব। বীজের মধ্যেও নাম আছে। নাম করলে গ্রহবৈগুণ্য মুক্ত হবে। নামই মুক্তিদান করবে।'

'যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি
নামের সহিত থাকেন আপনি শ্রীহরি।'

আবার কখনও কখনও বলতেন—'এক সাধে সব পায় বহু সাধে সব যায়।'

'যদি নিজের হয় তবে অন্য কেহই নিতে পারে না। যদি নিজের না হয় তবে কি করিয়া রাখিবেন? পরের বস্তুর প্রতি কর্তৃত্ব রাখার ফল কি?'

মুগ্ধচিত্তে শ্রবণ করতো ভক্তবৃন্দ ঠাকুরের মুখনিঃসৃত অমৃত-নিষ্যন্দি বাণী।

এইভাবে কিছুদিন ভক্তসনে লীলা করে রামঠাকুর আবার হঠাৎ অন্তর্হিত হলেন। ডিঙ্গামাণিক গ্রাম থেকে। বাংলাদেশ থেকে। সুদীর্ঘকাল ধরে চললো শ্রীশ্রীঠাকুরের অজ্ঞাতবাস। এই সময়েই তিনি সমগ্র দক্ষিণ ভারত পরিভ্রমণ করেন। উত্তর-পশ্চিম ভারতের কিছু কিছু অঞ্চলও করেন পরিক্রমা। রাজপুতানার চিতোরে একটি আশ্রমও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অবশ্য সে আশ্রমের বিস্তারিত বিবরণ কিছুই জানা যায় না। এবং এই অজ্ঞাতবাস কালের ধারাবাহিক ইতিহাস কিছুই পাওয়া যায় না। আনুমানিক

১৯০২-০৩ খৃষ্টাব্দে আবার শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখা যায় কলকাতা শহরে। এ সময়ে তিনি কালীঘাটে এক দরিদ্র বৈষ্ণবের গৃহে অতি দীন ভাবে বাস করতেন। গ্রামের মানুষ শ্রীবরদাকান্ত ভট্টাচার্য তখন কালীঘাটে ছিলেন। তিনি বলেন, 'ঐ সময় রামের হস্তস্পর্শে বহু পীড়িত ব্যক্তি কঠিন পীড়া হতে মুক্তিলাভ করে।' ১৯০৩ সালে মাতাঠাকুরাণী কমলাদেবী ইহলীলা সম্বরণ করলেন। তিনিও শক্তি-সম্পন্না রমণী ছিলেন। মৃত্যুর ছয় মাস পূর্বে, 'অশ্বত্থ গাছের স্বপ্ন' হতে জানতে পেরেছিলেন আসন্ন মৃত্যুকাল। রামঠাকুর মাতার মৃত্যুসংবাদ শুনেও দেশে ফিরলেন না। ভ্রাতুষ্পুত্রকে বলে দিলেন, 'মায়ের জন্য আমার যা করবার আছে তা আমি এখানেই করবো।' তারপর কিছুকাল কলকাতার উপকণ্ঠে উত্তরপাড়ায় এক দুঃস্থা বর্ষিয়সী মহিলার বাড়ী অবস্থান করেন। মহিলাটিকে মা বলতেন। বহু দুঃস্থ পীড়িত লোকের সেবাশুশ্রূষা করে দিন অতিবাহিত করতেন। এক গলিত কুষ্ঠ রোগীও ঠাকুরের চিকিৎসা ও শুশ্রূষায় করেছিল আরোগ্যলাভ। আবার চলে অজ্ঞাতবাস। অবশেষে ১৯০৮ সালের প্রথম দিকে শ্রীশ্রীঠাকুর দেশে ফিরলেন। ডিঙ্গামাণিক গ্রামে এসে হলেন উপস্থিত। এ সময়ের লীলাপ্রসঙ্গে ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী বলছেন :

'এবার ঠাকুর নিষ্ক্রিয়। সন্ধ্যাবন্দনা ধ্যানধারণা যোগযাগ আগের মত কিছুই নাই। তিনি স্বভাবতঃ অল্পভাষী। এবার যেন আরও বেশী। আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধবের বাড়ীতে যাতায়াত করেন। কিন্তু কোথাও বেশীদিন থাকেন না। এ সময়ে তিনি পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম প্রভৃতি প্রদেশের নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। অনেকেই তাঁর আত্মিক শক্তির পরিচয় পেয়ে তাঁর অনুগত ও কৃপাপ্রার্থী হন। তিনি জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকলকেই কৃপা করেন। অসংখ্য হিন্দু মুসলমান তাঁর দর্শন কামনায় আসতেন। চেরাগআলিও দর্শনেচ্ছুক হয়ে পুকুর পাড়ে বসে আছেন। ঠাকুরের নিকট যেতে সাহস হচ্ছে না। সর্বজ্ঞ ঠাকুর চেরাগআলির

অন্তরের ভাব জানতে পারলেন। লোক পাঠিয়ে তাঁকে আনালেন। নিজ বিছানার পাশে বসিয়ে বললেন, আপনি আমার পূর্বজন্মে ভাঐ ছিলেন। তারপর খুব আদর যত্ন করলেন। 'নাম' দিলেন। চেরাগআলি নূতন মানুষে হলেন রূপান্তরিত। ভাবাবেগে তাঁর চক্ষুর্দ্বয় হতে অবিরল ধারায় অশ্রু ঝরে পড়তে লাগলো। পরবর্তী জীবনে ভক্ত চেরাগআলি শ্রীশ্রীঠাকুরের একখানি পট নিজ গৃহের আঙ্গিনায় স্থাপন করে নামকীর্তন করতেন। প্রতি বৎসর অন্যান্য ভক্তবৃন্দের সাহায্যে মহোৎসবও করেন। জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত ঠাকুরের নামগান করেই অতিবাহিত করেন। মুসলমান হয়েও চেরাগআলি রামঠাকুরের কৃপালাভ করে হয়েছিলেন ধন্য।

সত্যদ্রষ্টা পরমযোগী রামঠাকুর মানবতার ধর্ম, হৃদয়ের ধর্মকে হিন্দু মুসলমান জাতিবর্ণ নির্বিশেষে দুঃস্থ পীড়িত মুমুক্ষু মানুষের হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য করেছিলেন চেষ্টা। তাইতো দীন বেশে দয়াল ঠাকুর ঘরে ঘরে গিয়ে মধুমাখা সেই কৃষ্ণনাম বিলিয়ে এসেছেন। সর্বদাই বলতেন, নাম নিয়ে পড়ে থাকুন, নামই আপনাকে উদ্ধার করবে। যে নাম ভাল লাগে। সংসার-সঙকে সার করা নয়। সত্যকে সার করা। সত্যনারায়ণ অর্থাৎ সত্যের আশ্রয়। নামই সত্য। সত্যই ধ্যান বা চিন্তা। এই ধ্যানই ভগবান অর্থাৎ ধীর বলে জানতে হয়।

'যেই নাম—সেই কৃষ্ণ। যেই নাম—সেই ভগবান। সরল প্রাণে বিশ্বাস করুন। নাম আর ভগবান এক। ভগবানই নাম হয়ে ভক্তহৃদয়ে বাস করেন। আপন প্রাণকে নামের সাথে যুক্ত করবেন। প্রাণ বলতে একটা অব্যক্ত সত্য চৈতন্যবোধ বুকে ফুটে ওঠে। এই অনুভূতিকে নামের সঙ্গে যোগ করে দিতে হবে। সর্বদা ভগবান প্রাণরূপে হৃদয়ে গতাগতি করেন সত্য। অন্তরে যাহা প্রাণ, বাইরে শ্বাস প্রশ্বাস রূপে তাহাই প্রাণনক্রিয়া। এই প্রাণের সঙ্গে নাম করতে করতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। তারপর কর্তৃত্বাভিমান গিয়ে নামের অর্থাৎ প্রাণের দাস হয়ে যখন মুক্তি

স্থির হবে, তখন যে অবস্থা হবে তাই 'সোহং'। সো অর্থ সে। হং অর্থ প্রকাশ অর্থাৎ সে ভিন্ন আর কিছুই নেই। নাম নিয়ে পড়ে থাকলেই ব্রজবাস হয়। যেহেতু যেখানে কৃষ্ণ সেইখানেই ব্রজ। একমাত্র হৃদয়েই 'নামের' স্থিতিস্থান। এই অবস্থাই শ্রীকৃষ্ণকে বুকে করা।

যেখানে নাম সর্বদা থাকে, সেখানে ভগবান বাস করেন। যেখানে ভগবান থাকেন সেইখানেই ব্রজভূম। নামের শরণ নিয়ে থাকাই ব্রজের পথে অগ্রসর হওয়া। সর্বদা সকল অবস্থায় নামের চিন্তার অভ্যাস করতে করতে নামের জ্ঞান জন্মে। ধ্যান আসে। অর্থাৎ নামের উদয় হয়। নামের উদয়ে বুদ্ধি অন্যত্র যায় না। এই অবস্থাকে 'প্রাপ্ত' বলে। প্রাপ্ত হলে পর সকল অভাব যায়। দেহ মুক্তি লাভ হয়। দেহ মুক্তি অবস্থাকেই 'প্রাপ্ত' বলে। তাঁকে ডাকবার আগেই অনুরাগ ভক্তিবিশ্বাস আসে না। নাম করার সঙ্গে নামী অর্থাৎ ইষ্টমূর্তির ধ্যান হৃদয়ে করতে করতে পট প্রতিমায় যেমন আছে, সেই আকারেই তিনি জীবন্ত ও জ্যোতির্ময় রূপে আকারিত হবেন। চলার পথে বসুদেবকে যে ভাবে পথ দেখিয়ে উত্তাল তরঙ্গায়িত যমুনা অতিক্রম করিয়ে ছিলেন, সে ভাবে তিনিই পথ দেখিয়ে নেবেন।'

সরল করে সহজ করে ধর্মের গূঢ়তত্ত্বকথা বললেন রামঠাকুর ভক্তবৃন্দকে। এই ভাবে দিনের পর দিন, মাস, বৎসর ধরে লীলা করে চললেন ভক্তসনে। জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত। আর অজ্ঞাতবাসে যাননি কোনদিন ভক্তদের ছেড়ে। তবে কোথায়ও স্থির হয়ে বসেন নি কোনদিন। কখনও আছেন কাশী, বৃন্দাবন ধামে। কখনও কলকাতা শহরে। আবার কখনও পূর্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের গ্রাম হতে গ্রামান্তরে পরিভ্রমণ করে নাম মন্ত্র বেলাচ্ছেন মুমুক্ষুপ্রপীড়িত মানুষের ঘরে ঘরে। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই লক্ষাধিক মানুষ তাঁর অনুগত ভক্ত ও শিষ্য হয়ে পড়লেন। চট্টগ্রাম ফেণী নোয়াখালী কুমিল্লা প্রভৃতি অঞ্চলে তিনি

সর্বজনবিদিত। তবে সর্বদাই তিনি চেষ্টা করতেন প্রচ্ছন্ন থাকতে। অতি সাধারণ পোষাকে, হয়তো একখানি মাত্র বস্ত্র পরিধানে আবার ঐ বস্ত্রেরই একাংশ সর্বাঙ্গে। বা একখানি চাদর কিংবা উত্তরীয় দিয়ে সর্বাঙ্গ আচ্ছাদিত। ঐ অবস্থায় কেউ ধারণাই করতে পারতো না ইনি একজন যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ।

সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করে প্রচার দূরের কথা, নিজের সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে কোন প্রচারও তিনি পছন্দ করতেন না। তিনি বলেন, আচরণই প্রকৃষ্ট প্রচার। এছাড়া অন্য উপায়ে প্রচারের চেষ্টা করলেই জ্ঞাতসারেই হোক বা অজ্ঞাতসারেই হোক সত্যের সঙ্গে কিছু কিছু মিথ্যা এসে জোটে। প্রচারের নামে অপপ্রচারই হয়ে থাকে। আরও বলতেন, আমার ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন। আমি উপদেষ্টা নই, আমি দৃষ্টান্ত মাত্র।

শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রথম দর্শন করে প্রিয় শিষ্য ভক্তপ্রবর অধ্যাপক শ্রীইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন, 'পরিধানে অতি সাধারণ একখানি থান ধুতি। গাত্র সম্পূর্ণ নগ্ন। স্কন্ধে যজ্ঞোপবীত। গলায় একছড়া তুলসীর মালা। সাধুচিত বেশভূষার কিছুই তাঁহার নাই। সুতরাং আচমকা অভিভূত হইবার মত কিছুই সেখানে ছিল না। কিন্তু সেখানে যাহা দেখিলাম, অন্য কোথাও তাহা দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। দীর্ঘ ৪।৫ বৎসর ব্যাপিয়া অনেক সাধু সন্ন্যাসী ঘাঁটিয়া আসিয়াছি, যেখানে গিয়াছি সেখানেই মনে হইয়াছে যে সাধুজী যেন অনেক উচ্চে বসিয়া রহিয়াছেন এবং সেখান হইতে নেহাৎ কৃপা করিয়া আমাদের উপর উপদেশ বাণী বর্ষণ করিতেছেন। তাঁহার এবং অন্যান্য সকলের মধ্যে একটা পার্থক্য যেন স্বতঃই সেখানে বিরাজমান। এবং সাধুজীও এ সম্বন্ধে যেন বিশেষভাবেই সজাগ। কিন্তু প্রথম সাক্ষাতের দিনেই ঠাকুরের নিকট বসিয়া তাঁহার কথাবার্তা শুনিয়া মনে হইল যেন তিনি আমাদেরই একজন। নিতান্ত অন্তরঙ্গের মতই আলাপ আলোচনা করিতেছেন।'

এই ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় পরবর্তী কালে 'রামঠাকুরের কথা'

নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এবং ঠাকুরের বাণীগুলিকে সংকলন করে 'বেদবাণী' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন।

ডক্টর্ গোপীনাথ কবিরাজ রামঠাকুরকে কাশীতে প্রথম দর্শন করে বলছেন, 'আমরা সাধুটিকে দর্শন করিবার জন্য চিন্তামণি গণেশে গেলাম। সম্প্রতি চিন্তামণি গণেশের নিকট একটি ভদ্রলোকের বাড়ীতে তিনি অবস্থান করিতেছেন। ১৯২৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাস। সেখানে যাইয়া যে দৃশ্য দেখিলাম তাহাতে আমরা সকলেই মুগ্ধ হইয়া পড়িলাম। দেখিলাম একটি আনুমানিক ৬০।৬৫ বৎসরের বৃদ্ধ। গলায় তুলসীর মালা। অঙ্গে একখানি তাঁতের শুভ্রবর্ণের চাদর। মুখে বিনয়পূর্ণ মধুর হাস্য। ধীর স্থির সৌম্য ভাবে আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। আমাদিগকে দেখিবামাত্র, আমরা অপরিচিত হইলেও নম্রভাবে প্রণতি জ্ঞাপনপূর্বক সাদরে আহ্বান করিলেন। আমরা যথাস্থানে উপবেশন করিয়া তাঁহার সহিত বার্তালাপে প্রবৃত্ত হইলাম। অনেকক্ষণ কথাবার্তার পর যাহা বুঝিলাম তাহাতে আমাদের ধারণা হইল যে ইনি বস্তুতঃই একজন মহাপুরুষ। লেখাপড়া বিশেষ কিছু জানেন না। সাধারণ জ্ঞানমাত্র আছে। অন্য ভাষা তো জানেনই না। সংস্কৃত ভাষাও জানেন না। এমন কি মাতৃভাষা বাংলা সম্বন্ধেও সাধারণ ভাবে লিখিবার ও পড়িবার জ্ঞান ছাড়া অধিক জ্ঞান তাঁহার নাই। কিন্তু আলোচনার প্রসঙ্গে যে সকল গভীর জ্ঞানের কথা তাঁহার মুখ দিয়া নির্গত হইল তাহার তুলনা নাই। সরলতা, অমায়িকতা, মাধুর্য ও নম্রতা তাঁহার চরিত্রের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। তিনি সর্বভূতে সত্যই ভগবৎদর্শন করিয়াছেন। তাই কোন লোক তাঁহার নিকট আসিবামাত্র তিনি নিজেই তাঁহাকে শ্রদ্ধার সহিত অভিবাদন করিতেন। আগন্তুক প্রণাম করিবার অবসর পাইবার পূর্বেই ঠাকুর মহাশয় তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বসিতেন।

আমার বিশ্বাস বর্তমান যুগে অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীতে যে কয়জন মহাপুরুষ বঙ্গদেশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে তিনি অন্যতম প্রধান। লৌকিক দৃষ্টিতে তিনি লেখাপড়ায় বিশেষ অগ্রসর

হন নাই। ইহা সত্য। কিন্তু অলৌকিক দৃষ্টিতে তাঁহার দিব্য ন্যায় সম্পদশালী মহাপুরুষ খুব বেশী আছে বলিয়া মনে হয় না।'

বিশিষ্ট ভক্ত অধ্যাপক প্রভাতচন্দ্র চক্রবর্তী রামঠাকুর সম্বন্ধে বলছেন, 'তাঁহার সহিত যে কি সম্বন্ধ তাহা জানি না। জানিবার প্রয়োজনও হয় নাই। তবে সত্য কথা এই যে, তাঁহাকে বড় ভাল লাগে—প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়। তাঁহার স্বভাবসুন্দর মূর্তি, বালপ্রকৃতি ও প্রাণস্পর্শিনী মধুর কথাগুলি প্রাণে আনন্দধারা বর্ষণ করে। তাঁহার মধ্যে কি জানি কি আছে যাহা সকলকেই আকর্ষণ করে। অল্পেই আপনার করিয়া লয়। একবার দেখিলে কেন জানি মন প্রাণ তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়িতে চায়! কলুষপঙ্কিল জীবনের যে কয়টি মুহূর্ত তাঁহার সঙ্গে অতিবাহিত করিয়াছি তাহার পবিত্র স্মৃতি হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে। প্রাণের আবেগে শেষে শুধু বলিতে ইচ্ছা হয়—'তুঁয়া চরণে মন লাগহুঁ রে'।'

*　　*　　*　　*

ভক্তপ্রবর শ্রীরোহিণীকুমার মজুমদার বলছেন, 'ঠাকুর ছিলেন আড়ম্বরহীন সাধারণ মানুষের মত। বাহ্যিক আবরণের কোন বালাই ছিল না। প্রথম দর্শনলাভের সৌভাগ্যের দিন হইতে যত দিন সুস্থ দেহে ছিলেন একখানি ধুতি ও একটি চাদর তাঁহার পরিধেয় দেখিয়াছি। শীত গ্রীষ্ম সর্বদাই একই পোশাকে থাকিতেন। জীবনের শেষভাগে আশ্রিতেরা তাঁহাকে গরম জামা, কাপড় প্রভৃতিতে ভূষিত করিতেন। ঐগুলি তিনি ইচ্ছামত দান করিতেন। পুঁথিগত বিদ্যা তাঁহার নিকট অবিদিত ছিল। তবু সর্বশাস্ত্রবিশারদ ছিলেন। মহান আত্মার ভাবাবেশে তিনি কথা বলিতেন। তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে সকলেরই মস্তক আপনিই অবনত হইত। মহান সঙ্গীতের ন্যায় তাঁহার কণ্ঠস্বর। ভাবোচ্ছ্বাসগুলি স্বর্গের দৃশ্যের ন্যায়। সে স্বর্গে সকল মানব প্রেমে সম্মিলিত। পাপী, অজ্ঞ, মূর্খ সমাজের পরিত্যক্ত যত আবর্জনা সবাইকেই তিনি কোলে টানিয়া লইতেন। যাহা তিনি স্পর্শ করিয়াছেন তাহাই পবিত্র হইয়াছে।

এমন কোন মলিনতা নাই যাহা সেই পুণ্যের আলোকে একটি কলঙ্ক রেখাপাত করিতে পারে। সুগভীর জ্ঞান ও পবিত্রতা তাহার নিকট নিশ্বাসপ্রশ্বাসের ন্যায় স্বাভাবিক। আপন পর তাঁহার নিকট অবিদিত ছিল। সবাই তাঁহার নিকট সমান। সর্বাধিক প্রিয় তাঁহার কেহই ছিল না। তাঁহার নিকট যিনিই থাকিতেন মনে করিতেন তিনি ঠাকুরের অতি প্রিয়জন। বালক বালিকা যুবক যুবতী বৃদ্ধ বৃদ্ধা সবাইকে তিনি 'আপনি' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। এমন কি বাড়ীর ঝি ভৃত্য বা পরিচারিকা, রাস্তার কুলি-মজুর যাহাদিগকে আমরা তাচ্ছিল্যভরে তুমি বা তুই বলিয়া সম্বোধন করি, তাহাদিগকে ঠাকুর 'আপনি' বলিতেন এবং সসম্মানে নিজের নিকট আনিয়া বসাইতেন। সকল জাতি ও ধর্মের মধ্যে তিনি সত্যকে দেখিতেন। যাহা কিছু মঙ্গল, যাহা কিছু সুন্দর সবই তাঁহার মধ্যে বর্তমান। প্রীতি, ভক্তি, ত্যাগ ও সেবায় তাঁহার জীবনটি নিবেদিত ছিল। যেখানে তিনি উপস্থিত থাকিতেন সেখানে সকল দুঃখ ও অনুযোগ স্তব্ধ হইয়া যাইত।

তিনি কখনও স্নান করিতেন না, কেবল মজঃফরপুরে থাকাকালীন তিন দিন ঠাকুরের সমস্ত শরীরে দধি মাখাইয়া স্নান করানহইয়াছিল। পুরীতে সমস্ত দিন সমুদ্রসৈকতে বালির মধ্যে বসিয়া থাকার জন্য সর্বশরীরে বালি ও কাদা লাগিত। ঐ সময় বাইশ দিন প্রত্যহই ঠাকুরকে স্নান করান হইত। কেহ জোর করিয়া তাঁহার ময়লা পরিধেয় কাপড় পরিবর্তন না করাইলে ঐ ভাবেই থাকিতেন। যেখানে যখন অবস্থান করিতেন তাঁহারাই পরিধেয় বস্ত্রগুলি পরিষ্কার করিয়া দিতেন। কোনদিন তাঁহাকে অন্নগ্রহণ করিতে দেখি নাই। বরাবরই সামান্য ফলমূল, দধি, দুগ্ধ, সন্দেশ এবং কচিৎ লুচি-তরকারী ভোগে লাগিত। মানকচু, ওলকচু, কাঁচাকলা, ঢেঁড়স, মর্তমানকলা ও চালতের আচারও গ্রহণ করিতেন এবং বিশেষ পছন্দ করিতেন মনে হইত। ঠাকুর আমাদের বাসায় অবস্থানকালীন বা ঠাকুরের সহিত কোথাও গেলে সর্বদাই ঠাকুরের নিকটেই থাকিতে হইত। বিনামু-

মতিতে কোথায়ও যাওয়ার উপায় ছিল না। দৈবাৎ কোথাও গেলে কৈফিয়ৎ দিতে হইত।

তন্ত্র মন্ত্র বেদ উপনিষদ সাংখ্য দর্শন জ্যোতিষ গণনা ডাক্তারী কবিরাজী প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেই তাঁহার সমান অধিকার ছিল। ভারতের প্রচলিত ভাষাগুলি প্রায় সবই তিনি জানিতেন। তাঁর শ্রীমুখের গীতার ব্যাখ্যা বাজারে প্রকাশিত কোন ভাষ্যে পাওয়া যায় না সত্য, কিন্তু যাঁহারা সৌভাগ্যক্রমে শ্রীমুখের গীতার ব্যাখ্যা শুনিয়াছেন তাঁহারাই মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছেন, এমন ব্যাখ্যা পূর্বে কখনও শোনেন নাই।

তাঁহার নিকট জাতিভেদ ছিল না। তাঁর মতে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান বৌদ্ধ সবাই এক জাতি, মানব জাতি। সকলকেই তিনি কোল দিয়াছেন। হিন্দুর মন্দির, মুসলমানের মসজিদ্, খৃষ্টানদের গীর্জা সবগুলিকে তিনি এক মনে করিতেন। স্বয়ং মক্কা মদিনা মুসলমান তীর্থক্ষেত্র দর্শন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীরামঠাকুরের জীবনই ছিল একখানি জীবন্ত গীতা, নিষ্কাম ধর্ম, সন্ন্যাসের জীবন্ত বিগ্রহ, বেদান্তের প্রাণময়ী মূর্তি, জ্ঞান ভক্তি ও কর্মের ত্রিবেণী সঙ্গম।'*

কাশীতে রামাপুরায় শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞেস করছেন ভক্ত শিষ্য মাধব পাগলাকে,† নাম জপ হচ্ছে তো?

* শ্রীগুরু শ্রীশ্রীরামঠাকুর—লেখক শ্রীরোহিণীকুমার মজুমদার।

† মাধব পাগল—পূর্বাশ্রমের নাম শৈলজাকান্ত মুখোপাধ্যায় (গোপাল)। জন্ম ১৩০৭ সাল ১৯শে অগ্রহায়ণ। জন্মস্থান ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার বিদগাঁও গ্রামে। পিতা চন্দ্রকান্ত মুখোপাধ্যায়, মাতা মনোরমা দেবী। শৈলজাকান্ত কলিকাতা আশুতোষ কলেজের প্রতিভাশালী ছাত্ররূপে পরিচিত ছিলেন। বি-এ পরীক্ষায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন। কাশীতে রামঠাকুরের কৃপা প্রাপ্ত হন। এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ অবধূত মাধব পাগলায় হলেন রূপান্তরিত। আনন্দময়ী মায়ও স্নেহপাত্র ছিলেন মাধব পাগল।

আমার দ্বারা কি করে নাম করা হবে ঠাকুর! আমার মন চঞ্চল। অস্থির। আমার দ্বারা নাম করা হবে না। প্রত্যুত্তরে বললেন মাধব পাগলা।

একবারেই কি হয়? নামের গোড়া ধরেন, নামের গোড়া ধরলেই সব হবে। ঠাকুর বললেন।

এবারে মাধব পাগলা কাঁদ কাঁদ হয়ে বললেন, ঠাকুর! আমার মনে হয় আমার দ্বারা কিছুই হবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আপনার না হলে কি আমার ছুটি আছে?

আর একবার ১৩৪৬ সালে শ্রীশ্রীঠাকুর কাশীর হরসুন্দরী ধর্মশালায় আছেন। বহু শিষ্য ভক্ত তাঁকে দর্শন করছেন। প্রণাম করছেন আর শ্রীমুখের কথা শুনছেন। সকাল গেল, দুপুর গেল, ধীরে ধীরে নেমে এলো সন্ধ্যার অন্ধকার। মাধব পাগলা ঠাকুরের ঘরে ঢুকে প্রণাম করে কাছে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর একজন শিষ্যকে বললেন, আপনি বেশ ভাল ভাবে ৺সত্যনারায়ণ সেবা করবেন।

আর একজনকে বললেন, আপনি ফুল বেলপাতা দিয়ে পূজাপাঠ করবেন।

এইভাবে এক একজনকে এক একপ্রকার উপদেশ দিচ্ছেন। মাধব পাগলা কাছে বসে শুনছেন আর মনে মনে ভাবছেন—আজ আমি গুরুর কাছে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের শক্তি ভিক্ষা করবো। এই চিন্তা করতে করতে মাধব পাগলা ব্যাকুল হয়ে অশ্রুপুলক সহ হঠাৎ শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে পতিত হয়ে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের শক্তি প্রার্থনা করতে লাগলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরও মাধব পাগলার প্রণত অবস্থায় পিঠে হাত রেখে একটি মুদ্রা অঙ্কিত করে কি যেন মন্ত্র জপ করলেন।

এবারে মাধব পাগলা মাথা তুলে শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখের দিকে আকুল ভাবে তাকিয়ে রইলেন। রামঠাকুর প্রসন্ন হয়ে মৃদু মধুর স্বরে বললেন, আপনি মহোৎসব করবেন।

মহোৎসবের কথা শুনে মাধব পাগলা চমকে উঠলেন। ভাবলেন, আমি গরীব, মহোৎসব করবার মত টাকা কোথায় পাবো? ঠাকুর আমাকে একি আদেশ করছেন!

সর্বজ্ঞ ঠাকুর মৃদু হেসে আবার বললেন, চাল ডালের খিচুড়ী দিয়ে নয়, দশ ইন্দ্রিয় একাদশ মন এই নিয়ে আপনি মহোৎসব করবেন। তবেই আপনি শান্তি পাবেন।

এবারে ঠাকুরের মুখনিঃসৃত অপূর্ব উপদেশ শ্রবণ করে স্তম্ভিত হয়ে মাধব পাগলা ভাবতে লাগলেন এত বড় উচ্চাঙ্গের ভজন আমার দ্বারা সম্ভব হবে কি? আবার মনকে বোঝালেন, ঠাকুর শক্তি দিলে নিশ্চয়ই সম্ভব হবে। মাধব পাগলা আনন্দিত চিত্তে শ্রীশ্রীগুরুকে প্রণাম করে চলে এলেন। তখনও ভাবছেন এ যে বড় কঠিন সাধন। সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন। একমাত্র গুরুশক্তির কৃপাতেই সম্ভব।*

শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মাও মাধব পাগলাকে বলেন, তোর গুরু তোকে যেমন কৃপা করেছেন, এমন কজন গুরু কজন শিষ্যকে কৃপা করেন? ঠাকুর যা বলেছেন তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিস্।

আনন্দময়ী মার সঙ্গেও রামঠাকুরের সাক্ষাৎ হয়। শ্রীশ্রীরাম ঠাকুর তখন ঢাকায় অসুস্থ। আনন্দময়ী মা তখন ঢাকার শাহবাগের মা। ভক্তপ্রবর শ্রীঅখিলচন্দ্র রায় বলছেন, 'শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীদেহ অসুস্থ থাকাকালীন ঢাকা শাহবাগের মা আনন্দময়ী একদিন ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিলেন। আমি খাটের উপর শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবায় রত ছিলাম। শ্রীশ্রীমা ঠাকুরকে অভিবাদন করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, ঠাকুরও নীরব। এই উভয়ের নীরবতার মধ্যে কি আলাপ হইয়াছে তাহা বুঝিবার শক্তি আমাদের নাই। কিছুক্ষণ পরেই মা ভক্তগণ সহ চলিয়া গেলেন।'

অবধূত শ্রীশ্রীমাধব পাগলা সম্বন্ধে শ্রীশ্রীরামঠাকুরের ভক্ত শিষ্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, 'কাশীতে আমার একজন

---

* 'শ্রীশ্রীরামঠাকুর ও মাধব পাগলা'। 'মুক্তানন্দ'।

গুরুভাই ঠাকুরের অন্যতম শিষ্য গোপাল মুখোপাধ্যায় [শৈলজাকান্ত] (লোকে তাঁকে মাধব পাগলা বলিয়া ডাকে) থাকিতেন। ইনি ঠাকুরের কৃপায় খুব উন্নত হন। দেখিলে বড়ই আনন্দ হইত। ঠাকুর তাঁহাকে দশ ইন্দ্রিয় ও একাদশ মন—এই লইয়া মহোৎসব করিতে বলিয়া যান। তিনিও তাহাই করিতেছেন। কাশীর মত শীতে ও গ্রীষ্মে লু'র গরমে একখানি কাপড় দুই ভাঁজ করিয়া লুঙ্গির মত পরেন। ইহাই তাঁহার সম্বল। খালি গায়ে খালি পায়ে পরমানন্দে আছেন। সর্বদা হাসি মুখ। আনন্দের মূর্ত প্রতীক। ঠাকুরের চিন্তাতেই সর্বক্ষণ বিভোর আছেন। দেখিলে মনে হয় যেন ঠাকুরের সঙ্গেই তাঁহার অবস্থিতি।'*

ঠাকুর আবার কাশী থেকে কলকাতা শহর হয়ে এসেছেন চাঁটগা শহরে। ভক্তবৃন্দ পরিবৃত হয়ে কথামৃত শোনাচ্ছেন। তাঁর পণ্ডিতের মত বাক্‌চাতুর্য ছিল না। অনুভূতিলব্ধ জ্ঞান সরল করে সহজ করে বলছেন। পূর্বঙ্গের কথিত ভাষাতেই কথা বলছেন।

'শ্রীপদ ভোলাই বিপদ। শ্রীপদ ধইর‍্যা থাক্‌লে বিপদ থাকে না।'

মন যে স্থির হয় না। এই কথার প্রত্যুত্তরে বলছেন, 'হু—মনের স্বভাবই চঞ্চল। মনের সঙ্গ করবেন না। নামের সঙ্গ করবেন। প্রাণেরে ধইর‍্যা থাকবেন। আর মন চঞ্চল হইব না। নামের সঙ্গে মন স্থির হইয়া যাইব।'

আবার বলছেন, 'নাম ও নামী অভেদ। নামী যেখানে ব্রজধামও সেখানে। নামাশ্রয়ে থাকলেই ভগবানের সঙ্গে থাকা হয়।' তিনি ধর্মপথের মূল অনুশাসন রূপে বলতেন, 'সত্যনিষ্ঠা ও সত্য উদ্ধার। সুখে দুঃখে অকাতর থাইক্যা ধৈর্য ধারণ। কর্তৃত্ব বর্জন। আর নাম সংকীর্তন।'

গীতা পড়তে গিয়ে তিনি একদিন বলেছিলেন, 'আমি তো দেখি

* হিমাদ্রি পত্রিকা ইং ১৪।২।৫৮

একটা কথাই ঘুরাইয়া ফিরাইয়া লেখছে—ধৈর্য ধর, ধৈর্য ধর, ধৈর্য ধর'। ধৈর্যই ধর্ম। মনের বেগ ধৈর্য সহকারে সহ্য কইর‍্যা যাওয়াই ধর্ম। ধর্ম ধৈর্য একই। ধৈর্যই পরম ধর্ম। ধৈর্য ব্যতীত আর কি মানবদেহের শক্তি আছে? ভগবান একমাত্র ধৈর্য হইতেই যে প্রকাশ হন। সহ্য করাই পরম ধর্ম এবং পুরুষার্থ। অধীর হওয়াই কাপুরুষার্থ।'

* * *

চট্টগ্রাম পাহাড়তলীতে আশ্রম প্রতিষ্ঠার পূর্বে ঠাকুর স্থানটি দেখতে গেলেন। স্থানটিতে পদার্পণ করেই বললেন,—'স্থানটি বড়ই পবিত্র, অনেক শ্রান্ত ক্লান্ত শোকসন্তপ্ত জীব এইখানে আইস্যা শান্তিলাভ করবো।' পাহাড়ের নীচে বটগাছটিকে দেখে বললেন,—'এ স্থান কৈবল্য শক্তি, এর গোড়া বাঁধানো হইব।'

চট্টগ্রাম পাহাড়তলীর বর্তমান শ্রীশ্রীকৈবল্যধাম আশ্রম প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে ভক্তপ্রবর শ্রীপ্রতুলচন্দ্র সেনগুপ্ত বলছেন, 'ঠাকুর খুব প্রসন্ন দৃষ্টিতে সব দেখছেন আর বলছেন,—'কৃষ্ণচূড়া গাছ দুটি ও উত্তর দিকের বেলগাছটির গোড়া বাঁধানো হইব। এখানে মন্দির। এখানে নাট মন্দির। ওখানে ভক্ত ও যাত্রীদের থাকার ঘর, এখানে রন্ধনশালা ও ভোগের ঘর, ওখানে ভাঁড়ার ঘর হইব।' সবই তিনি হইব হইব বলে যাচ্ছেন। কিন্তু কে যে এসব করবে তার নাম নাই। আশ্চর্যের বিষয় কিছুদিনের মধ্যেই তিনি যা যা বলেছিলেন ঠিক সেই রকমই হয়েছিল।'

অবশ্য নিজের বাসস্থানের প্রয়োজনে কোন আশ্রয় বা আশ্রমের কথা তিনি বলতেন না। পাহাড়তলীর আশ্রমেও তিনি কেবল প্রবেশ উৎসবের সময় ত্রিরাত্রি বাস করেছিলেন। ঠাকুরের সমগ্র জীবনই অনির্দিষ্ট ভাবে ভক্তদের গৃহে গৃহেই অতিবাহিত হয়েছে। কোন অভাব বা প্রয়োজনবোধই তাঁর ছিল না।

ঠাকুর এখন নোয়াখালীতে প্রিয় শিষ্য ভক্তপ্রবর এ্যাডভোকেট শুভময় দত্ত মহাশয়ের বাড়ীতে অবস্থান করছেন। অসংখ্য ভক্ত সমাগম হয়েছে। ভক্তিমতি মহিলা শিশুবালা দত্ত (শুভময় দত্তের

স্ত্রী) ও তরলাসুন্দরী দেবীও আছেন। গুরু প্রসঙ্গ নিয়ে কথা হচ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন, 'কুলগুরু কাকে বলে? যিনি ভবসাগরের কূলে লইয়া যান। তিনিই কুলগুরু। অর্থাৎ জন্ম মৃত্যুর হাত হইতে মুক্তি পাইলেই কূল পাওয়া যায়। একমাত্র সদ্‌গুরুর আশ্রয় পাইলেই কূল পাওয়া যায়। সদ্‌গুরুর কাজ হইল ভক্তকে উদ্ধার করা। ভক্ত 'নাম' করুক আর না করুক সদগুরু যিনি তিনি তাঁহার ভক্তকে উদ্ধার করিবেনই।'

এই প্রসঙ্গে একটি গল্পের অবতারণা করলেন। কোন এক ভক্তের কাছে সদ্‌গুরু এসে জিজ্ঞেস করলেন, আর কতকাল সংসার করবে? অনেক ত হলো। এখন সংসার ছেড়ে আমার সঙ্গে চল। প্রত্যুত্তরে ভক্তটি বললো, ছেলেরা এখনও মানুষ হয় নি। তাদের বুদ্ধিসুদ্ধিও নেই। ওরা মানুষ হলেই সব ছেড়ে আপনার নিকট যাবো।

কিছুদিন পর উক্ত ভক্তটির মৃত্যু হলো। কিন্তু সংসারের প্রতি অতিশয় আসক্তি থাকাতে সেই সংসারেই একটি কামধেনু হয়ে জন্ম নিল। এবং দুধ দিয়ে পুত্রপৌত্রদের পালন করতে লাগলো। কামধেনুটিরও বয়স হলো। একদিন গুরু এসে পুত্রদের কাছে কামধেনুটি ভিক্ষা চাইল। পুত্ররা তাকে দিতে অস্বীকার করলো। তখন গুরুদেব কামধেনুকে বললো, আর কত কাল এ মায়ায় আবদ্ধ থাকবে? এখন চল আমার সঙ্গে। কামধেনু বললো, ছেলেদের তো দুধ কিনে দেবার ক্ষমতা নেই। নাতিগুলির একটু বয়স হলেই আপনার নিকট যাবো। কিছুদিন পর কামধেনুটির মৃত্যু হলো। সে কুকুর জন্ম নিল এবং ঐ সংসারেই বাস করতে লাগলো। কুকুরটি সারা রাত্রি জেগে ঘুরে ঘুরে বাড়ী পাহারা দেয়। কিছুদিন পর কুকুরটিও বৃদ্ধ হলো। গুরুদেব এসে ছেলেদের কাছে কুকুরটিকে ভিক্ষা চাইলো। ছেলেরা প্রত্যুত্তরে ক্রোধান্বিত হয়ে বললো, কুকুরটিকে কি করে আপনাকে দেবো? সারা রাত পাহারা দেয়। আমরা নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারি। গুরু তখন কুকুরটিকে বললো, ওহে, আর কতকাল এভাবে কাটাবে?

কুকুর বললো, গুরুদেব, আমার ছেলেদের কোনদিকে খেয়াল নেই। আমি পাহারা দিই বলে ওরা নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারে। আর কয়েকটা দিন পরেই আপনার সঙ্গে যাবো। অবশেষে বৃদ্ধ হয়ে কুকুরটিও একদিন মারা গেল। কিন্তু সংসাবে আসক্তি হেতু সর্পরূপে জন্মগ্রহণ করে ঐ বাড়ীতেই আশ্রয় নিল। সারা দিন ধানের গোলার নিচে থেকে ইঁদুরের হাত থেকে ধান রক্ষা করতো। কিছুদিন পর গুরুদেব এসে বললেন, আর কত জন্ম এইভাবে সংসারের মোহে আবদ্ধ থাকবে। চল এইবার আমার সঙ্গে। সাপ ঐ একই উত্তর দিল। এবং বললো, আমি ইঁদুরের হাত হতে ধান রক্ষা না করলে ছেলেরা নাতিরা আমার কি খেয়ে বাঁচবে? গুরুদেব দেখলেন শিষ্যকে মুখের কথায় বলে মায়া কাটানো যাবে না। সোজা ছেলেদের কাছে গিয়ে বললেন, তোমাদের ধানের গোলার নিচে একটা অজগর সাপ আছে। তোমবা সাবধান! ধান আনতে গেলে কামড়িয়ে দেবে। এই কথা বলেই গুরুদেব একটু দূরে একটা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে রইলেন। সাপের কথা শুনেই ছেলেরা লাঠি নিয়ে গোলার নীচ হতে সাপটিকে বের করে লাঠি দিয়ে আঘাত করতে লাগলো। এবং সাপের মাথা ভেঙ্গে গিয়ে যখন প্রাণ বের হবার উপক্রম হলো তখন গুরুদেব ছেলেদের বললেন,—'আহা হা, সাপটা তোমরা একেবারে মেরে ফেলো না। সাপটা আমাকে দাও।' ছেলেরা সোৎসাহে বললে, নিয়ে যাও ঠাকুর! সাপ দিয়ে আমাদের কোন কাজ নেই। মৃতপ্রায় সাপ নিয়ে গুরুদেব চলতে লাগলেন। পথে এসে সাপ গুরুদেবের পায়ে জড়িয়ে ধরে কেঁদে বললো,—এইবার আর আমার মায়া মোহ নেই। গুরুদেব, আমাকে উদ্ধার কর। মুক্তি দাও। আমি তোমার চরণকে আশ্রয় করলাম। গুরুদেবও তখন হৃষ্টমনে শিষ্য ভক্তকে উদ্ধার করলেন। তাইতো ঠাকুর বলেন, 'সদ্‌গুরুর স্বভাবই হলো আশ্রিত জনকে উদ্ধার করা। সেইটা যত জন্মেই হোক। তাও অবশ্য তাঁরই কৃপাসাপেক্ষ। আশ্রিতের কর্মানুযায়ী ফল ভোগ করাইয়া তিনি উদ্ধারের পথ উন্মোচন করিয়া লইবেন সন্দেহ নাই।'

ঠাকুর আবার বলেছেন, সর্বদাই নাম লইয়া পড়িয়া থাকিবেন। প্রারব্ধভোগ উদয় হইয়া চলিয়া যাইবে। থাকিবে না।

* * * *

পাহাড়তলী কৈবল্যধামের মোহন্ত শ্রীশ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় চলেছেন কাশীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শন অভিলাষে। কাশীতে এসে অনেক অনুসন্ধান করে জানতে পারলেন কাশী শহরের বাইরে একটি ভাঙ্গা পুরানো বাড়ীতে ঠাকুর অবস্থান করছেন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর সঠিক বাড়ীটি পেলেন দেখতে। কিন্তু জনমানুষের নেই কোন সাড়া। বাইরে একটি স্ত্রীলোক রয়েছেন দাঁড়িয়ে। আর কেউ কোথাও নেই। ওঁকে দেখতে পেয়েই তিনিও হয়ে গেলেন অদৃশ্য। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন। কিন্তু কোন মানুষেরই পেলেন না সাড়া। উপায়ান্তর না দেখে ভাঙ্গা সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলেন উপরে। সম্মুখেই একখানা ঘর। খোলা দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করতেই এক অভাবনীয় দৃশ্যের হলেন সম্মুখীন। বিস্মিত ও স্তম্ভিত হয়ে দেখলেন প্রকাণ্ড একটা সাপ শ্রীশ্রীঠাকুরের সারা অঙ্গ জড়িয়ে ওঁর ঘাড়ের উপর মাথাটি রেখে স্থির হয়ে রয়েছে। শ্যামাচরণকে দেখে ঠাকুর বললেন, আপনি এখানে ক্যান? শিগ্‌গির চইল্যা যান। ভক্তশিষ্য শ্যামাচরণ দ্বিরুক্তি না করে চলে যেতে উদ্যত হয়েও কৌতূহলবশত সাপের ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করে ফেললেন।

প্রত্যুত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন,—আমার জ্বর হয়েছে; পরিচর্যা করবার কেউ নাই বইল্যা সাপটি আইস্যা সেবা করতেছে। আপনে যান গ্যা। ভীত অভিভূত শ্যামাচরণ দরজা থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করেই নিলেন বিদায়।

ভক্ত শ্যামাচরণ আরও একটি অলৌকিক ঘটনার সাক্ষী হয়ে আছেন। একবার শ্রীশ্রীঠাকুর সহ শ্যামাচরণ চলেছেন বিক্রমপুরের একটি গ্রাম অভিমুখে। পদব্রজে। সঙ্গে আছেন বিক্রমপুরেরই আরও একজন ভক্ত। সঙ্কীর্ণ মেটে রাস্তা। জনহীন পথ। হঠাৎ একটি বিশালকায় বানর এসে অবরোধ করে দাঁড়ালো পথ। ঐ অঞ্চলের

বানরগুলি ছিল খুবই হিংস্র। উভয়েই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে কর্তব্য স্থির করতে পারছিলেন না। শ্রীশ্রীঠাকুর ওঁদের অবস্থা দেখে মৃদু হেসে বললেন, ভয় নাই। থামবেন না। আগাইয়া চলেন। কিছু করবো না। সত্য সত্যই শ্যামাচরণ ও ভক্তটি অপার বিস্ময়ে দেখলেন হিংস্র বানরটি ধীরে ধীরে এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের পায়ে মাথা লুটিয়ে প্রণাম করে জঙ্গলের দিকে হয়ে গেল অদৃশ্য।

আর একবার শ্রীশ্রীঠাকুর বৃন্দাবনে বাত ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন। সেবাশুশ্রূষা করবার ছিল না কেউ। অভাবনীয় ব্যাপার। যখনই দুঃসহ ব্যথায় কাতর হয়ে পড়েন তখনই এক বিশালকায় হনুমান এসে করতে থাকে পদসেবা। ব্যথার একটু উপশম হলেই অন্তর্হিত হয়। এমন কি কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে ঠাকুরকে খেতে দেয়। কিন্তু যেদিন থেকে ঠাকুর রোগ-মুক্ত হলেন তার পর হতে সেই হনুমানজীকে আর দেখা গেল না।

নানা কথা প্রসঙ্গে একদিন শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তপ্রবর ইন্দুভূষণ-বাবুকে দামিনী মা'র গল্প বলেছিলেন। ভবানীপুরের বকুল বাগানে কোনও এক মুখুয্যে পরিবারের ছিল একটি বাগানবাড়ী। সেখানে বাগানের কোণে এক মাটির ঘরে থাকতেন এক বৃদ্ধা বৈষ্ণবী। ইনি ছিলেন ঠাকুরের একনিষ্ঠ সেবিকা। ঠাকুরের মতই ছিলেন স্বল্পাহারী। সপ্তাহে একদিন কি দুইদিন খেতেন ভাতেভাত সিদ্ধ করে। বাকি কয়দিন শুধু জল খেয়েই দিতেন কাটিয়ে। ঠাকুর ওঁকে বলতেন দামিনী মা। কখনও কখনও শ্রীশ্রীঠাকুর দামিনী মা'র ঘরে থাকতেন। দামিনী মা'র ছিল দুইটি বিষধর কেউটে সাপ। তারাও থাকতো ঐ ঘরেই। তাদের নামকরণ হয়েছিল কানাই নিতাই। ঠাকুর বলেন, যেদিন দ্বিপ্রহরে অসহ্য গরম পড়তো, সেদিন কানাই নিতাই ধীরে ধীরে এসে আমার গায়ের উপর শুয়ে থাকতো। উদ্দেশ্য ছিল আমাকে একটু আরাম দেওয়া।

আবার একদিন। ঠাকুর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন দামিনী মা'র কুটিরে। বুকের যন্ত্রণায় করছেন ছটফট। সেদিন আবার বৈষ্ণবদের

এক মহোৎসবে নিমন্ত্রণ ছিল দামিনী মা'র। ঠাকুরকে বলে কুটিরের ঝাঁপের দরজা বন্ধ করে দামিনী মা গেলেন চলে। একাকী ঠাকুর বিছানায় শুয়ে আছেন। কেউটে সাপ দুটি গর্ত থেকে বের হয়ে ঠাকুরের বুকের উপর দিয়ে চলাফেরা করতে লাগলো। তাদের গায়ের শীতলতায় ঠাকুরের বুকের যন্ত্রণার অনেকটা হলো উপশম। ধীরে ধীরে ঠাকুর নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়লেন। এই প্রসঙ্গে ঠাকুর রহস্য করে পরবর্তীকালে বলেছিলেন, 'আমার কি যে ভয় করতে ছিল। যদি একটা ছোবল মারে তো সব শেষ।'

মনুষ্যেতর জীবজন্তুর সঙ্গে ঠাকুরের ছিল খুবই অন্তরঙ্গতা। এ সম্বন্ধে কবিবর নবীনচন্দ্র সেন বলেছেন, 'সর্পদংশন করিতে, গরু মহিষ মারিতে আসিতেছে। আর রামঠাকুর বারণ করা মাত্র চলিয়া গিয়াছে।'

* * *

তুমি ধরবে তারে কিসে,
কামনার কামসাগরে ডুবে আছ মায়ার বিষে।
যেমন গোদেহেতে মাখন আছে, গাভীর কি তা জানা আছে,
খইল ভুষি পেলে সে যে আনন্দেতে ভাসে।
গোপীগণের মরম জেনে, দোহন কর ক'ষে,
দোহন ক'রে চড়কি দিলে, ঊর্ধ্বে মাখন উঠবে ভেসে।

এক বাবাজী খঞ্জনী বাজিয়ে গান শোনাচ্ছেন রামঠাকুরকে। কলকাতায়। ভক্তপ্রবর মতিবাবুর বাসায়। শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তবৃন্দ পরিবৃত হয়ে আধশোয়া অবস্থায় পা দুটি ছড়িয়ে বসে আছেন। হঠাৎ বাত ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছেন। পায়ে অসহনীয় যন্ত্রণা। হাত ছোঁয়ানো যায় না। বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ কুঞ্জলাল নাগ মহাশয়ও আছেন। তিনি খোল বাজানোতে ছিলেন সিদ্ধহস্ত। বাবাজীর গান শুনতে শুনতে আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়লেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের পাকেই খোল মনে করে, পা দুখানিকে নিলেন কোলে তুলে। তারপর ভাবানন্দে বিভোর হয়ে দুই হাত দিয়ে তাল দিতে লাগলেন। গানের গতির সঙ্গে সঙ্গে ওঁর বাজনাও দ্রুত থেকে

দ্রুততর হতে লাগলো। উপস্থিত অন্যান্য ভক্তরা করছিলেন সঙ্কোচ বোধ। ঠাকুর কিন্তু ছিলেন নির্বিকার। বাবাজীর গান থেমে গেলে কুঞ্জবাবুর হলো হুঁস। তিনি লজ্জিত হয়ে ঠাকুরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। পরমুহূর্তেই মাথা লুটিয়ে প্রণাম করে নিলেন বিদায়। অবশেষে ভক্তপ্রবর প্রভাতবাবু জিজ্ঞাসা করলেন ঠাকুরকে, পায়ে এই নিদারুণ যন্ত্রণা সত্ত্বেও কুঞ্জবাবুকে সতর্ক করলেন না কেন? প্রত্যুত্তরে মৃদু হেসে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, অপরের আনন্দে কি বাধা দিতে আছে? কারো ভাব নষ্ট করিতে নাই।

আবার একদিন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথা প্রসঙ্গে এক ভক্তকে আশ্বাস দিয়ে বললেন,—'উপায়—নিরুপায়।' অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে নিরুপায় না হলে উপায় হবে না। এই প্রসঙ্গে একটি গল্পের অবতারণা করলেন। হনুমান সমুদ্র লঙ্ঘনের উদ্দেশ্যে করলেন লম্ফপ্রদান। হঠাৎ সমুদ্রের ভিতর থেকে সুরসা সর্পিণী মুখ হাঁ করে হনুমানের পথ রোধ করে দাঁড়ালো। হনুমান কর্তব্য স্থির করবার পূর্বেই তাকে মুখের ভিতর ফেললো পুরে। হনুমান ক্রোধান্বিত হয়ে বললো,—কি, এত বড় আস্পর্ধা! আমাকে মুখের মধ্যে পুরে রাখতে চাস্! দেখাচ্ছি মজা। বলেই সে তার দেহের পরিধিকে করতে লাগলো বিস্তৃত কিন্তু ফল কিছুই হলো না। সুরসা সর্পিণীও তার মুখবিবরকে করে ফেললো বিস্তৃত। হনুমান ক্রোধে জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। এবং দ্বিগুণ উৎসাহে পুনরায় দেহকে বিস্তার করতে আরম্ভ করলেন। সর্পিণীও সমতালে তার মুখ-বিবরকে করতে লাগলো বিস্তৃত। কিছুতেই কিছু হলো না। সর্পিণীর হাত থেকে পেলেন না নিষ্কৃতি। অহঙ্কারে উন্মত্ত হওয়ায় রামনামও বিস্মরণ হলো। নিজ শক্তির শেষ বিন্দু পর্যন্ত প্রয়োগ করেও যখন কিছু হলো না তখন স্মরণ হলো তাঁর ইষ্টকে। অবশেষে ইষ্ট অর্থাৎ রামের কৃপায় সর্পিণীর হাত থেকে পেলেন মুক্তি। 'নিশ্চেষ্ট—নিরুপায়' হয়েই তাঁর উপায় হলো। জীবের কোন শক্তি নাই, ইহাই তার পরম শক্তি। কথাশেষে ঠাকুর মৃদু মৃদু হাসতে

লাগলেন। একদিন একজন ভাগবত পাঠক (ভাগবত পাঠ এবং কথকতাই ওঁর উপজীবিকা) সাষ্টাঙ্গে ঠাকুরকে প্রণাম করে অত্যন্ত বিনীত ভাবে বললেন, পেটের দায়ে ভাগবত শুনাই। কিছুই জানি না। কিছুই বুঝি না। আমার একমাত্র সান্ত্বনা এই যে, ইহাই আমার পুরুষানুক্রমিক বৃত্তি। বাপ দাদাও করিয়া গিয়াছেন। আমিও করিতেছি। কিন্তু জানিয়া শুনিয়া এই যে অপরাধ করিতেছি ইহার কি মার্জনা নাই ঠাকুর?

প্রত্যুত্তরে ঠাকুর মৃদু হেসে বললেন,—বৃত্তি হিসাবে ভাগবত পাঠে অপরাধ হয় না। অপরাধ হয় পাটোয়ারীতে।

ঠাকুরের কথায় ভাগবত পাঠক হলেন আশ্বস্ত। মানসিক দুশ্চিন্তা হলো দূর। তৃপ্ত মনে ঠাকুরকে আবার প্রণাম করে নিলেন বিদায়। ঠাকুর শুধু শুষ্ক ধর্মোপদেশ দেন না, জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করে দেন।

ভক্তবৃন্দ পরিবৃত হয়ে ঠাকুর বলছেন,—যাগ যোগ তপস্যায় ভগবান পাওয়া যায় না।

ভক্ত প্রশ্ন করলেন,—তবে কিসে পাওয়া যায়?

—কৃপা দ্বারা।

—সেই কৃপা লাভ কি করে হয়?

—ধৈর্য সহিষ্ণুতা ও সম্পূর্ণ নির্ভরতা দ্বারা।

আবার বলছেন,—নিজের যেটুকু ভক্তি শ্রদ্ধা ভগবান দেন সেইটুকু নিয়াই সন্তোষ থাকতে হয়। একটু ধৈর্য ধরিয়া থাকিলে নিজ নিজ স্বভাবোপযোগী অভীষ্ট পন্থা আপনিই গড়িয়া উঠে। কিন্তু ধৈর্য বস্তুটা এ সংসারে নিতান্তই বিরল। সেই জন্য তাড়াতাড়ি ফল পাইতে গিয়া যেমন 'কষা আমে গুড় মাখিয়া লই।' ঠাকুর হেসে হেসে ভক্তদের লক্ষ্য করে বলছেন, এ সংসারে তিন প্রকারের লোক আছে—করিমুল্লা, শোনাউল্লা আর বকাউল্লা। যারা মনোযোগ দিয়ে কথাগুলি শুনে তদনুসারে কার্য করে তারা হলো করিমুল্লা। এ সংসারে সংখ্যায় তারা নিতান্তই বিরল। যারা কিছু করুক আর

না করুক অন্ততঃ কথাগুলি মন দিয়ে শুনে তারা হলো শোনাউল্লা। এরাও সংখ্যায় খুব বেশী নয়। কারণ নিবিষ্ট মনে কোন কিছু শুনবার ধৈর্য অনেকেরই নাই। আর যারা শুধু কথাই বলে যায় তারাই হলো বকাউল্লা। এরাই সংখ্যায় সর্বাপেক্ষা বেশী। কেবল বকাউল্লা শোনাউল্লাই দেখি, করিমুল্লা একজনও দেখি না। ঠাকুরের মুখনিঃসৃত সরল সহজ সরস কথা শুনে ভক্তবৃন্দও হাসতে লাগলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কোনদিন স্নান করতেন না। কি শীত, কি গ্রীষ্ম। ভক্তরা জিজ্ঞেস করলে বলতেন, স্নান করার দরকার হয় না। স্নান হয়। বৈষ্ণবেরা লাবণ্যামৃতে স্নান, তারুণ্যামৃতে স্নান, ইত্যাদির কথা বলে থাকেন। ঠাকুরের এই স্বতঃসম্পাদিত স্নানও হয়তো সেই রকমই একটা কিছু হবে।

ঘুম সম্বন্ধেও বলতেন, 'ঘুম তো আসে না, ঘুম আসিলেই তো মোহ আসিয়া গেল।' এই প্রসঙ্গে ভক্তপ্রবর ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন,—আমার জীবনে ঠাকুরের সহিত একাকী রাত্রি কাটাইবার সুযোগ কয়েকবারই হইয়াছে। একদিন আমার বিডন স্ট্রীটের বাসায়, ভিতরের একখানা ঘরে আমার ও ঠাকুরের শোয়ার ব্যবস্থা করা হইল। খাটের উপর ঠাকুরের বিছানা পাতিয়া দেওয়া হইল এবং আমার বিছানা হইল মেঝের উপর। খানিকক্ষণ কথাবার্তার পর মশারি টানাইয়া আলো নিভাইয়া দুইজনই শুইয়া পড়িলাম। আমার কিন্তু ঘুম আসিল না। বিছানায় এপাশ ওপাশ করিতে লাগিলাম। ঘড়িতে ১২টা বাজিতে শুনিয়া বুঝিলাম যে এক ঘণ্টার উপর এইভাবে কাটাইয়াছি। রাস্তার আলোতে ঘরেও খানিকটা আলো ছিল। ঠাকুরের খাটের দিকে চাহিয়া দেখিলাম যে তিনি স্থির হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। দেখাদেখি আমিও উঠিয়া বসিলাম। একটু পরে ঠাকুর বলিলেন, উঠিয়া বসিলেন কেন? আমি বলিলাম, ঘুম আসিতেছে না তাই। তখন ঠাকুর বলিলেন; 'তা হইলে এক কাজ করেন, মশারি তুইলা রাইখা আলো জ্বালাইয়া দেন।' আমি তৎক্ষণাৎ মহানন্দে ঠাকুরের আদেশ তামিল করিলাম।

তিনি নানা বিষয়ে কথা বলিয়া চলিলেন। বেশ মনে আছে যে, সে রাত্রে তিনি তাঁহার জীবনের অনেক গুহ্য কথা আমাকে জানাইয়াছিলেন। কিভাবে যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়া গেল কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। হঠাৎ চাহিয়া দেখি ভোর হইয়া গিয়াছে। ঠাকুরের সহিত এই প্রকার সারারাত্রি জাগরণ আমার অন্ততঃ দশবার ঘটিয়াছে। কিন্তু প্রতিবারই লক্ষ্য করিয়াছি রাত্রি জাগরণের যে একটা স্বাভাবিক গ্লানি ও ক্লান্তি আছে, তাহার বিন্দুমাত্রও ঠাকুরকে স্পর্শ করে নাই। তিনি প্রত্যহ যেমন থাকেন তেমনই রহিয়াছেন। কোন ব্যতিক্রমই হয় নাই। আমরা হয়তো দিনে ৩/৪ ঘণ্টা ঘুমাইয়া রাত্রি জাগরণের অবসাদ দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু ঠাকুরের সে রকম কোন প্রয়োজনই হয় নাই। অন্যান্য দিন যেমন সমাগত ভদ্রমণ্ডলীর সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া এবং কখনও হয়তোবা সামান্য একটু বিশ্রাম করিয়া কাটাইয়া দেন, রাত্রি জাগরণের পরের দিনগুলিও হুবহু সেই ভাবেই কাটাইয়াছেন। স্বভাবতঃই মনে হইয়াছে যে নিদ্রার কোন প্রয়োজনই তাঁহার নাই। নতুবা জাগরণের অবসাদ অন্ততঃ কিছু না কিছু প্রকাশ হইয়া পড়িতই।.........আমার প্রধান কথা হইল এই যে দীর্ঘকাল ঠাকুরের সাহচর্যে কাটাইবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে কিন্তু কখনও তাঁহার মুখে নিজের সম্বন্ধে এই ঘুম এমন কি বিশ্রাম কথাটাও শুনি নাই। তিনি অনেক সময় অসুস্থ হইয়া পড়িতেন। বাত তো প্রায় নিত্য সঙ্গীই ছিল। . ...কিন্তু ঘুম হইতেছে না। একটু ঘুমাইতে পারিলে বোধ হয় অনেকটা সুস্থ হইতাম, এরূপ কথা শুধু আমি কেন, কেহই কোনদিন তাঁহার মুখে শুনে নাই। অসুস্থতা এবং নিদারুণ যন্ত্রণার মধ্যেও ঠাকুর ঘুমের কথা কখনও বলেন নাই। ইহা অত্যন্ত বিস্ময়কর সন্দেহ নাই। ঠাকুরের ঘুম ছিলই না এবং সেই জন্যই যখন ঘুম অত্যন্ত প্রয়োজন তখনও ঘুমের কথাটা তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হয় নাই। শুধু একবারই কথাটা বলিয়াছিলেন, অন্তিম শয্যায় দেহ-ত্যাগের কিছু পূর্বে, 'আপনেরা ঐ ঘরে যান, আমি একটু ঘুমাই।'

* * *

কোজাগরী লক্ষ্মী পূর্ণিমার সন্ধ্যা। জ্যোৎস্নাশুভ্র মুক্ত আকাশ। কাশীর প্রতিটি গৃহে উৎসব জেগেছে। দীপের আলোকে ধূপের সৌরভে আর পুষ্পের সমারোহে। ভক্ত কুঞ্জবাবুর গৃহেও লক্ষ্মীপূজার উৎসব। নববিবাহিতা স্ত্রী রাণী আলপনা দিতে দিতে গুনগুন করে গান করছে। ঠাকুরের গান। রামঠাকুরের নামগান। ঠাকুর যে ওকে খুবই স্নেহ করেন। এ বিয়ে তো ঠাকুরই দিয়েছেন। হঠাৎ স্বামীর কণ্ঠস্বরে সচকিত হয়ে ওঠে সে।

দেখো! দেখো! ঠাকুর এসেছেন।

অভাবনীয় অচিন্তনীয় ব্যাপার। সত্য সত্যই ঠাকুর চোখের সামনে দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু হাসছেন। কর্তব্য স্থির করবার পূর্বেই ঠাকুর স্বয়ং এসে বসলেন পূজার আসনে। মুগ্ধ চিত্তে দেখতে লাগলেন ভক্তিমতী রমণী রাণীর দেওয়া আলপনার শিল্পনৈপুণ্য। প্রশংসা করে বললেন, যে রকম মনোযোগ দিয়ে আলপনা দিয়েছো, সব কাজই এই রকম মন দিয়ে করবে। তাহলেই কাজ সুসম্পন্ন হবে।

উৎফুল্ল হৃদয়ে ঈষৎ লজ্জিত কণ্ঠে রাণী বললেন, সব সময়ই তো আপনাকে ডাকি। আপনার কথা ভাবতে ভাবতেই তো আলপনা দিচ্ছিলাম। তাই বোধ হয় সুন্দর হয়েছে।

ঠাকুর এবার এক হাত দিয়ে রাণীকে জড়িয়ে ধরে আসনস্থ ফটোর দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে বললেন, ওরে, আমি তো সব সময়ই তোমার কাছে এখানেই আছি। ডাকলেই আমাকে পাবে। এই তো দেখ আমি হাজির হয়েছি।

তারপর পূজার আয়োজন প্রস্তুত দেখে ঠাকুর বললেন, আচ্ছা, এইখানেই পূজা করিয়া লও।

ভাবানন্দে বিভোর হয়ে ভক্তপ্রবর কুঞ্জবিহারী ঘোষ আর ভক্তিমতী স্ত্রী রাণী সেদিন রামঠাকুরকেই পূজা করে পরমানন্দ অনুভব করলেন মনে মনে।

ছোট্ট সুন্দর ঘরে অনির্বচনীয় এক পরিবেশের হলো সৃষ্টি।

রামঠাকুরের সঙ্গে কুঞ্জবাবুর দেখা একরকম আকস্মিক ভাবেই

হয়। রামঠাকুর এসেছিলেন নারদঘাটস্থিত অসিতানন্দ ব্রহ্মচারীর কাছে। ব্রহ্মচারীজী অতি বৃদ্ধ। ভগ্নপদ। তান্ত্রিক সাধু। ঠাকুরের একনিষ্ঠ ভক্ত। তাইতো কাশীতে পদার্পণ করলেই একবার ব্রহ্মচারীজীকে দর্শন দেন।

ভক্তপ্রবর কুঞ্জ ঘোষও এসেছিলেন ব্রহ্মচারীজীর নিকট ঠাকুরের খবর জানতে। অকস্মাৎ পথেই হলো দেখা। ভক্তের সঙ্গে ভক্ত প্রেমিক ঠাকুরের। ভক্তের অনুরোধকে ঠেলে ফেলতে না পেরে এসে উপস্থিত হলেন কুঞ্জ ঘোষের গৃহে। কুঞ্জবাবু যে ঠাকুরের স্নেহের পাত্র। তিনি যখন ময়মনসিংহ সুসঙ্গ-রাজ এস্টেটে চাকুরীতে রত ছিলেন তখন ঠাকুর তাঁর গৌরীগঞ্জের বাসাতে দুই মাস 'অজ্ঞাতবাস' কবেছিলেন।

* * *

'কলিকালে সত্যনারায়ণ জাগ্রত। সত্যনারায়ণের সেবা ছাড়া জীবের মুক্তি নাই। আপনারা সকলে সত্যনারায়ণ সেবা করেন।' ঠাকুর বলছেন ভক্তবৃন্দ পরিবৃত হয়ে কলকাতায়। ভক্তপ্রবর কুঞ্জ মজুমদারের গৃহে। কুঞ্জবাবুর স্ত্রী কিরণবালা মজুমদারও ঠাকুরের পরম ভক্ত। পরবর্তীকালে 'ঘরের ঠাকুর শ্রীরামচন্দ্র' নামে একখানি গ্রন্থও রচনা করেন।

তারপর শুরু হলো সত্যনারায়ণের পাঁচালী পাঠ। প্রতিদিন সন্ধ্যায়। কুঞ্জবাবুর গৃহে। ঠাকুর পাঁচালী পাঠ করেন আর ভক্তরা শোনেন। পূর্ণ গাঙ্গুলী, অক্ষয়বাবু, কুঞ্জবাবু আরও অনেক বিশিষ্ট ভক্তরা মুগ্ধচিত্তে শ্রবণ করেন ঠাকুরের কণ্ঠনিঃসৃত সত্যনারায়ণের পাঁচালী। পাঁচালী পাঠ নয়, এ যেন সত্যনারায়ণের আরাধনা। সাধনা। সত্যনারায়ণের আহ্বান-গীতি চললো দিনের পর দিন ধরে। সপ্তাহ মাস শেষ হলো। ঠাকুর বললেন, 'সত্যনারায়ণের আসন প্রতিষ্ঠা হইল।'

আবার একদিন রাত্রিতে ভক্ত কুঞ্জবাবুকে বললেন, 'সর্বদাই দেখি দেবতারা আইসা ঘুইর‍্যা বেড়ান। বসবার জায়গা পান না। এই

বাড়ী বড়ই পবিত্র। আপনে সত্যনারায়ণের ঘট পাতেন।' তারপর ঘট স্থাপনের শুভ দিন ক্ষণ সবকিছুই দিলেন বলে। ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো সেই শুভ দিনটি।

সকাল গেল, দুপুর গেল, ঘনিয়ে এলো সন্ধ্যার অন্ধকার। ঠাকুর বসে আছেন তক্তপোষের উপর। আত্মসমাহিত হয়ে। নীচে মেঝেতে রয়েছেন অক্ষয়বাবু আর কুঞ্জবাবু। হঠাৎ ঠাকুর বলে উঠলেন, 'সত্যনারায়ণ আসছেন। ওনারে বসতে একখানা আসন দেন।' কুঞ্জবাবু ছুটলেন আসনের খোঁজে। ওদিকে কলসী আমের পল্লব অন্য ঘরে রয়েছে পড়ে। সব দিকেই বিশৃঙ্খলা। স্ত্রী গৃহস্থালীর কাজে ব্যস্ত। তাইতো আসন আনতেও দেরী হয়ে গেল। ঠাকুর বিরক্তির স্বরে বললেন, এত দেরী করলেন! ঠাকুরের জল খাওয়ার একটা কুঁজো ছিল। সেইদিকে ইঙ্গিত করে কুঞ্জবাবুকে বললেন, সত্যনারায়ণ ঐখানেই বসেছেন। কাছেই দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল গোষ্ঠ। গৃহভৃত্য। ঠাকুর তাকেই আদেশ করলেন একটা মালা নিয়ে আসতে। গোষ্ঠ তাড়াতাড়ি টবের ফুলগাছ থেকে ফুল নিয়ে একটা মালা গেঁথে ফেললো। তারপর মালা হাতে নিয়ে এসে উপস্থিত হলো। ঠাকুর সন্তুষ্ট চিত্তে ওকেই মালাটি কুঁজোয় পরিয়ে দিতে বললেন। কুঁজোতেই যে বসেছেন সত্যনারায়ণ। শুরু হলো প্রণামের পালা। ঠাকুরও প্রণাম করলেন। ভক্তরাও করলেন প্রণাম। অনির্বচনীয় পরিবেশের হলো সৃষ্টি।

এই ঘটনার পর ভক্তরা ফুল ফল নিয়ে ঠাকুরকে প্রণাম করতে এলেই ঠাকুর নির্দেশ দেন কুঁজোকে প্রণাম করতে। বলেন, 'ঐ কুঁজোর মধ্যে সত্যনারায়ণ আবির্ভাব হইছে। যা আনছেন ঐখানে দেন। ঐখানে প্রণাম করেন।'

আবার একদিন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। তখনও পূজার আয়োজন সম্পূর্ণ হয়নি। ঠাকুর বিচলিত হয়ে বললেন কুঞ্জবাবুকে, 'সন্ধ্যা হইলেই দেখি ছায়ার মত ঘুইরা বেড়ায়। সময় সময় দেইখা আমি চমকাইয়া উঠি। পূজা করবেন না? সত্যনারায়ণ পূজা ঠিক সন্ধ্যার

সময় করার নিয়ম।' লজ্জিত হয়ে কুঞ্জবাবু ও ভক্তিমতী স্ত্রী কিরণবালা মজুমদার তাড়াতাড়ি পূজার আয়োজন সুষ্ঠ ভাবে সম্পন্ন করে ফেললেন।

'সত্যনারায়ণের আবির্ভাবের কথা শুনছি কিন্তু নিজেরা তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।' মনে মনে ভাবছেন কিরণবালাদেবী। ঠাকুর মৃদু হেসে বললেন কুঞ্জবাবুকে, 'মা বলে দেখতে পায় না। আপনে মায়েরে দেখাইয়া দেন।' তারপর কুঞ্জবাবু ও কিরণ-বালাদেবী দেখলেন কুঁজোর মধ্যে আবছা দাগ। ঠাকুর বললেন, 'সত্যনারায়ণ দিনে দিনে প্রকট হইব। মন স্থির কইরা পূজা করেন সত্যনারায়ণ কথাও কইব,—এমন দিন আসবো।' সত্যনারায়ণের আবির্ভাবের সন তারিখ ঠাকুর পূর্বেই লিখে রেখেছিলেন, শ্রীশ্রীসত্যপীর। ১৩৪৯-এর ১৪ আশ্বিন বৃহস্পতিবার কৃষ্ণপক্ষ পঞ্চমী তিথি, মৃগশিরা নক্ষত্র—জন্ম-উৎসব—আবির্ভাব।

ঠাকুর এখন অজ্ঞাতবাস করছেন। লোকজনের ভীড় ভাল লাগছে না। কলকাতাতেই বিভিন্ন ভক্তের বাড়ী গোপনভাবে ঘুরে ঘুরে থাকছেন। কখনও বেলেঘাটায় নিকুঞ্জবাবু, ডাক্তার কৈলাশচন্দ্র মজুমদারের বাড়ী, ঘোষ লেনে নির্মলচন্দ্র দাশগুপ্ত, কলেজ স্ট্রীটে, আর্ল স্ট্রীটে কুঞ্জবাবু, অক্ষয়বাবু, বড়বাজারে সাহাবাবুদের বাড়ী আবার পরাশর রোডে শ্রীযুত বীরেন্দ্র ঘোষ ও বালিগঞ্জ প্লেসে ডাক্তার জে. এম. দাশগুপ্তের বাড়ী বাস করছেন। প্রত্যেকেই অবশ্য বিশিষ্ট ভক্ত। সেবা যত্নের কোনও ত্রুটি হচ্ছে না। অজ্ঞাতবাসের কারণ প্রসঙ্গে ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করলে ঠাকুর বলেন,—'যারাই আসে স্বার্থ নিয়া আসে। কাম হাসিলের পর কেউ আর আসে না।' ছোটখাট স্বার্থ আর পাটোয়ারী-বৃত্তিকে ঠাকুর মোটেই সহ্য করতে পারতেন না। কিন্তু রেহাই পান নি ঠাকুর ভক্তদের হাত থেকে। নানা ধরনের বিভিন্ন রুচির মানুষ এসে ওঁকে বিরক্ত করতেন সর্বদা।

—'বাবা আমি আমার মায়ের চিতার উপর মঠ দিয়েছি।' বললেন এক অপরিচিত ভদ্রলোক। ঠাকুরকে। কুঞ্জবাবুর গৃহে। ঠাকুর

এখন কুঞ্জবাবুর গৃহে অবস্থান করছেন। খুশীতে ভদ্রলোকের চোখ আর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। মনে মনে ভাবছেন বোধ হয় ঠাকুর দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করবেন।

—খুবই উত্তম করছেন। আপনার বাবার চিতায় মঠ দেন নাই? জিজ্ঞেস করলেন ঠাকুর।

—এঁ্যা, আমার বাবা যে বর্তমান! জীবিত! মঠ কেমন করে দেবো?

—পরে যখন দিবেনই, আগে দিয়া কর্ম শেষ কইর‍্যা রাখেন। আপনে যদি হঠাৎ মারা যান কে দিব?

ভদ্রলোকের চোখ আর মুখ বিষণ্ণ হয়ে উঠলো। নীরব হয়ে গেলেন। ঠাকুর কিন্তু থামলেন না। আবার বললেন, 'ঐ সঙ্গে আপনেরও একখানা দিয়া রাখেন। বলা যায় না যদি কেউ পরে না দেয়। আগেই সাইর‍্যা রাখেন।'

ঠাকুরের তীব্র শ্লেষ বাক্যে আর বসে থাকতে পারলেন না অপরিচিত সেই ভদ্রলোক। তাড়াতাড়ি প্রণাম করে সরে পড়লেন।

লোকটি চলে গেলে ঠাকুর বললেন, 'এরা সবকিছু করতে পারে। এদের অসাধ্য কিছুই নাই। মিথ্যাকে সত্যের মত করে বলে।'

পরে জানা যায় ভদ্রলোক ছিলেন পুলিশ কর্মচারী। তবে ঠাকুরের বিরক্তি পেশার উপর নয়। মিথ্যাচারের জন্যই ঠাকুর ওঁকে বরদাস্ত করতে পারলেন না।

রামনবমীর উৎসবে মুখর হয়ে উঠেছে ভক্ত অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গৃহপ্রাঙ্গণ। কলকাতায়। টালীগঞ্জে। ঠাকুর এসেছেন। বহু ভক্তসমাগম হয়েছে। ঠাকুর কিন্তু একখানি চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন। সারাদিন ঐ ভাবেই রইলেন। সকাল গেল, দুপুর গেল, নেমে এলো সন্ধ্যার অন্ধকার। আলোকমালায় সজ্জিত হলো অতুলবাবুর গৃহ। ধীরে ধীরে ঠাকুরও উঠে বসলেন।

ভক্তরা সকলেই কৌতূহলী। ঠাকুর কেন সারাদিন ঐভাকে রইলেন। অবশেষে ভক্তপ্রবর মণীন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জিজ্ঞেস করলেন, বাবা, সমস্ত দিন আপনি ঐভাবে শুয়েছিলেন কেন?

—সব জায়গাতেই তো দেখতে হয়! ঠাকুর বললেন। ভক্তরা মুখ চাওয়াচায়ি করলেন। কিন্তু কেউই একথার মর্মার্থ উদ্ধার করতে হলেন না সক্ষম। অবশ্য তিনদিন পরে এ রহস্য উদ্‌ঘাটন হলো। অলৌকিক ব্যাপার। বিক্রমপুরের বাহেক গ্রাম থেকে ভক্তপ্রবর শ্রীযুত শ্রীকান্ত বসু রায়চৌধুরী লিখছেন পুত্র দীনেশচন্দ্র বসু রায়-চৌধুরীকে। কলকাতায়।……'ঠাকুর রামনবমীর উৎসবের দিন বেলা ১১টার সময় অযাচিত ভাবে হঠাৎ উপস্থিত হইয়া যে আনন্দ দিয়াছিলেন, তাহা বলার নহে। কিন্তু তিনি বৈকাল ৪টার সময় চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে আমরা ষ্টীমারে তুলিয়া দিয়া আসিয়াছি। পৌছ সংবাদ জানাইবে।'

ভক্ত দীনেশবাবু ভক্তমণ্ডলীকে এই পত্র দেখিয়ে তাদের মনের সংশয় দূর করলেন। ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করলে, ঠাকুর মৃদু মৃদু হাসেন আর বলেন,—'ওরকম তো হয়ই।'*

ভক্তপ্রবর মণীন্দ্র ব্যানার্জীর জীবনের একটি ঘটনা ছিল বড়ই বিচিত্র। মণীন্দ্রবাবু তখন ইন্‌কাম-টেক্স কমিশনার হবার জন্য পরীক্ষা দেবেন। পড়াশুনা নিয়ে খুবই ব্যস্ত।

—কি করেন মণিবাবু? জিজ্ঞেস করলেন ঠাকুর। হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়েছেন···মণিবাবুর বাড়ী। ঠাকুরকে এসময় দেখে মোটেই খুশী হতে পারলেন না মণিবাবু। ঠাকুরকে এড়াতে চাইলেন। গম্ভীরভাবে বললেন,

—আমি এখন খুবই ব্যস্ত। পরীক্ষার জন্য তৈরী হচ্ছি।

—দেখি কী বই পড়েন?

—আপনি এসবের কিছু বুঝবেন না।'

—দেখি না একটু।

---

* 'শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসঙ্গ' (৩) লেখক শ্রীশিতিকণ্ঠ সেনগুপ্ত।

অগত্যা মণিবাবু নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও বইখানি দিলেন ঠাকুরের হাতে। ঠাকুর বইখানি উল্টে পাল্টে কয়েকটি পৃষ্ঠা দেখিয়ে মণীন্দ্র বাবুকে বললেন,—'এ কয়টা পৃষ্ঠা একটু পইড়েন। ভক্তপ্রবর মণিবাবু ঠাকুরের বাক্য অমান্য করতে পারেন না। তাইতো ঐ কয়টি পৃষ্ঠা একটু দেখে রাখলেন। অভাবনীয় ব্যাপার। পরদিন পরীক্ষার হলে প্রশ্ন দেখে চক্ষুস্থির। ঐ কয়টি পৃষ্ঠা থেকেই তো প্রশ্ন এসেছে। না দেখে গেলে অসুবিধা হতো। মনের আনন্দে পরীক্ষা দিয়ে বাড়ী ফিরেই দেখেন, সেই গরীব বামুন তার জন্য অপেক্ষা করছেন।

—পরীক্ষা কেমন হইল? জিজ্ঞেস করলেন ঠাকুর।

লজ্জানম্র কণ্ঠে মণিবাবু বললেন, ঐ পৃষ্ঠা কয়টি দেখে যাওয়াতে পরীক্ষা ভালই হয়েছে।

—চিন্তা করবেন না। আপনার অভিলাষ পূর্ণ হইব। আশ্বাস দিয়ে ঠাকুর চলে গেলেন।

ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত হলো মণিবাবুর। ঠাকুরের কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছিল। ঠাকুরের অহৈতুক কৃপা বর্ষিত হয়েছিল মণিবাবুর জীবনে।

ভক্ত অধ্যাপক প্রভাতচন্দ্র চক্রবর্তীর স্ত্রী উদ্বিগ্ন। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত গভীর ভাবে চিন্তা করছেন ঠাকুরকে। কৃপাভিক্ষা করছেন। 'ঠাকুর! আমার এই বিপদ থেকে উদ্ধার করে দাও। রোগমুক্ত করে দাও!' ওঁর দুটি ছেলেই যে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়েছে। তাই এই প্রার্থনা

হঠাৎ আয়নাতে দেখতে পেলেন ঠাকুরের প্রতিবিম্ব। উৎফুল্ল হৃদয়ে কুশাসন আনতে গেলেন। আসন নিয়ে এসে আর দেখতে পেলেন না ঠাকুরকে। বৈঠকখানায় বসে প্রভাতবাবু গল্প করছিলেন ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। ওঁরাও দেখলেন ঠাকুর ভিতর বাড়ী ঢুকছেন। ব্যস্ত হয়ে ওঁরাও ভিতর বাড়ীতে প্রবেশ করলেন। তখন প্রভাতবাবুর স্ত্রীও ঠাকুরকে এদিকে ওদিকে খুঁজছেন। কোথায় ঠাকুর! খোঁজ খোঁজ রব পড়ে গেল। কিন্তু ঠাকুরকে আর পাওয়া গেল না।

পরে জানা গেল ঠাকুর সে সময় ছিলেন উত্তর ভারতে। অপর দিকে দুই তিন দিনের মধ্যেই রোগীরা রোগমুক্ত হতে আরম্ভ করলো। বাড়াবাড়ি কিছুই হলো না। দয়াল ঠাকুরের কৃপাবর্ষিত হলো ভক্তের পরিবারটির উপর।

আবার একদিন। ভক্ত অধ্যাপক ইন্দুভূষণবাবুর চার বৎসরের পুত্র অজিতকে পাওয়া যাচ্ছে না। ইন্দুভূষণবাবু তখন বিডন ষ্ট্রীটে থাকেন। চতুর্দিকে লোক পাঠালেন ছেলের খোঁজে। ঠাকুরও তখন আছেন ওঁর বাসায়। বহু ভক্ত সমাগম হয়েছে। অবশেষে নিরুপায় হয়ে ইন্দুভূষণবাবু ঠাকুরের শরণাপন্ন হলেন। ঠাকুর বললেন, 'নোটিশ ছাপাইয়া বিলি করেন। কাগজেও দেন। পাইয়া যাইবেন।' কিন্তু কিছুই করতে হলো না। ঠাকুরকে জানাবার পরই ছেলেকে পাওয়া গেল। লালবাজার থানার কাছে।

—কিরে এতদূর এলি, ভয় করলো না? আর রাস্তাই বা পার হলি কেমন করে? জিজ্ঞেস করলো সকলে।

—ভয় কল্‌বে কেন? ঠাকুরই তো সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। আমার হাত ধলে নাস্তা পাল কলে দিলেন। বললো ছোট্ট চার বছরের শিশু অজিত।

ভক্তবৃন্দ সকলেই বুঝলেন এ সবই ঠাকুরের লীলাখেলা। ঠাকুর কখন যে কি উদ্দেশে লীলা করেন সে রহস্য কি সহজে উদ্ঘাটন করা সম্ভব? যাই হোক ইন্দুবাবুর গৃহে আবার ফিরে এলো শান্তি। ঠাকুরের কৃপায়। আনন্দের হিল্লোল প্রবাহিত হয়ে চললো ভক্ত প্রাণে প্রাণে।

—'এখানে ওসব চলবে না বলে দিচ্ছি।' রূঢ়স্বরে বললেন নোয়াখালী গাবুয়া গ্রামের গৃহস্থ মানুষ যোগেন মিত্র তাঁর স্ত্রীকে। স্ত্রী হলেন ভক্তিমতী রমণী। রামঠাকুরের নামে পাগল। আত্মহারা। স্বামী আবার এসব মোটেই পছন্দ করেন না। বিশ্বাসও নেই ঠাকুর

দেবতা সাধু-সন্ন্যাসীতে। তাইতো স্ত্রীর স্বাধীন ইচ্ছা, রুচিকেও বরদাস্ত করতে পারেন না। বাধা দেন নানাপ্রকারে। অপমান করেন।

ভক্তিমতী স্ত্রীও ঠাকুর সেবায় বাধা পেয়ে, অন্তর দিয়ে ঠাকুরকে স্মরণ করতে লাগলেন। স্থির করলেন উপবাস করে প্রায়শ্চিত্ত করবেন। অবশেষে ঠাকুরঘরের দরজা দিলেন বন্ধ করে। চললো উপবাস দিনের পর দিন। একদিন। দুইদিন। তিনদিন। চতুর্থ দিন রাত্রি শেষ প্রহরে দরজায় করাঘাত হলো।

—ওঠেন, বড় ক্ষুধা লাগছে। কিছু খাইতে দেন।

এ যে ঠাকুরেরই কণ্ঠস্বর! মুগ্ধ ও বিস্মিত যোগেন মিত্রের স্ত্রী দরজা খুলেই দেখলেন তাঁর ইষ্টদেবতা সম্মুখে দণ্ডায়মান। অভিভূত হয়ে ওঁর পায়ে মাথা লুটিয়ে প্রণাম করলেন। নয়নজলে ভাসতে লাগলেন। এদিকে মিত্র মশায় টের পেয়ে পালালেন বাড়ী ছেড়ে।

—কৈ? মিত্র মশায় কৈ? তাঁকে একটু ডাইক্যা আনেন। ঠাকুর বললেন।

সুরু হলো খোঁজাখুঁজি। অবশেষে তাঁকে ধরে আনা হলো ঠাকুরের সম্মুখে। মিত্র মশায় ত ভয়ে মৃতপ্রায়।

দয়াল ঠাকুর মিত্র মশায়কে অভয় দিয়ে বললেন, আপনার কোন চিন্তা নাই। আপনার সব পাপ আমি কান্ধে লইলাম। আপনে চৈতন্যের নৌকায় উঠছেন। ধরেন এই আপনার 'নাম'।

অভাবনীয় ব্যাপার। কয়েক দিনের মধ্যেই দেখা গেল ঠাকুরের একনিষ্ঠ ভক্তদের মধ্যে মিত্র মশায় অন্যতম। পরবর্তী জীবনে ঠাকুরকে তিনি সাক্ষাৎ ভগবান বলে মনে করতেন। বহু লোককে তিনি ঠাকুরের কাছে ধরে নিয়ে গিয়ে 'নাম' পাইয়েছেন। ঠাকুর অসুস্থ একথা কেউ বললে তিনি ভীষণ চটে গিয়ে বলতেন,—ভগবানের আবার অসুখ কী রে? সুস্থ সুন্দর গার্হস্থ্য জীবনযাপন করেছিলেন যোগেন মিত্র ভক্তিমতী স্ত্রীকে নিয়ে। অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন শ্রীশ্রীরাম-

ঠাকুরকে। অবিশ্বাসী মন সরল বিশ্বাসের তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হয়ে উঠেছিল ঠাকুরেরই কৃপায়।

চৌমুহনীতে ভক্তপ্রবর নরেন্দ্রবাবু একদিন ট্রেনের সময় হয়ে যাচ্ছে দেখে গরম অবস্থায়ই মিষ্টান্ন ঠাকুরের কাছে করলেন নিবেদন। পরে ট্রেনে চেপে বিলোনীয়াতে ঠাকুর সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে যখন জিজ্ঞেস করলেন,—কেমন আছেন? ঠাকুর তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন,—আছিলাম ত ভালই, আইজ গরম মিষ্টান্ন খাইয়া মুখটা পুইড়া গেছে।

ভক্ত নরেন্দ্রবাবু ঘটনা স্মরণ করে লজ্জিত হলেন।

চাঁদপুরের মিন্টুবাবুকে (শ্রীরথীন্দ্রমোহন গুহ) ঠাকুর খুব স্নেহ করতেন। তাঁর ছিল চশমার দোকান। ঠাকুরের চশমা মিন্টু না বানালে হবে না। মিন্টুবাবু ব্যবসায়ী কিন্তু টাকার উপর কোন মোহ নেই। লোভ নেই। তাঁর বন্ধুরা বলতেন ঠাকুরের কাছে কিছু চেয়ে নাও। টাকা পয়সা। মিন্টুবাবু বলেন, ঠাকুরের কাছে গেলে আমি যে সব ভুলে যাই। নিজেকেই মনে রাখতে পারি না তার আবার টাকা পয়সা। ঠাকুর যে মহাপুরুষ বেশ বুঝতে পারি। একটা প্রশান্তি অনুভব কবি মনে মনে। ঠাকুরই তো আমার টাকা-কড়ি সম্পদ সবকিছু। চোখ বুজলেই ঠাকুরের চেহারা আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তখন সব ভুলে যাই। শুধু আনন্দ আর আনন্দ।

সন্দীপের ভক্ত কামিনী মজুমদার কলকাতা হগ মার্কেটে গিয়ে দেখেন, অসময়ে একটি আনারস বিক্রীর জন্য রাখা আছে। পরদিনই ফিরবেন দেশে। তাইতো ফলটি দেখেই মনে হলো তাঁর ঠাকুরের কথা। তৎক্ষণাৎ কিনে ফেললেন আনারসটি। পরমুহূর্তেই মনে হলো আর একটি পেলে বাড়ীর সকলের জন্য নিয়ে যেতে পারতাম। অনেক খুঁজলেন। কিন্তু আনারস আর পাওয়া গেল না। চৌমুহনীতে নেমেই তিনি ছুটলেন ঠাকুর দর্শনে। ভোগের ঘরে আনারসটি রেখে যেই মাত্র তিনি ঠাকুরের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছেন প্রণাম

করবার জন্য, ঠাকুর অমনি বলে উঠলেন—আনারসটা কাইটা নষ্ট করতে নিষেধ করেন। বাড়ী নিয়া সকলে মিলা প্রসাদ পান। আপনে যখন আনারসটি কিনেন তখনই আমি পাইছি।

অন্তর্যামী ঠাকুর ভক্তের মনের কোণে যে আকাঙ্ক্ষা ছিল তাও করলেন পূরণ।

ভক্ত মহেন্দ্রবাবুর বাড়ীর বাগানের কলা গাছে বেশ ভাল কলা হয়েছে। ঠাকুর বললেন মহেন্দ্রবাবুকে,—কাঁচাকলা ভোগে দিবেন।

কাঁচাকলা ঘরে আনবার সময় হঠাৎ পায়ে লেগে গেল। অনেক ইতস্ততঃ করে অবশেষে কলাগুলি ভাল করে ধুয়ে এনে কেটে দিলেন ভোগে। মনে কিন্তু একটু খটকা রয়েই গেল। শ্রীশ্রীঠাকুর সেদিন কলা স্পর্শই করলেন না। জিজ্ঞেস করতে বললেন, পায়ে-টায়ে লাগলে আমার বড় ঘিন্না কবে।

মূল কথা, ঠাকুরকে কিছু দেবার বাসনা হলেই তিনি তা গ্রহণ করেন। কিন্তু মনের খট্‌কা সংশয় নিয়ে ভোগ দিলে কি দেবতা গ্রহণ করতে পারেন?

এক দরিদ্র ভক্ত * ঠাকুরের ভোগে রোজ সামান্য একটু চিনি দেন। এর বেশী কিছু জুটাতে পারেন না। একদিন শ্রীশ্রীঠাকুর দর্শনে যাবার সৌভাগ্য হলো। পথে যেতে যেতে এক বাজারে দেখেন সস্তায় আঙ্গুর বিক্রী হচ্ছে। খুব ইচ্ছে হলো ঠাকুরকে আঙ্গুর খাওয়াবেন। অভাবের চিন্তা ভুলে হঠাৎ কিনেও ফেললেন কিছু আঙ্গুর। তারপর ঠাকুরের কাছে এসে ঠাকুরের হাতে আঙ্গুরের ঠোঙা দিতেই, মৃদু হেসে ঠাকুর বললেন,—ক্যান্? আমি তো চিনিই বেশী ভালবাসি।

ভক্তটি ঠাকুরের কথার মর্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করে ঈষৎ লজ্জিত হলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন, 'ভক্তিভাবে শ্রদ্ধা করে ভক্ত যা দেয় তাতেই ভগবানের প্রীতি ঘটে।'

* দ্রঃ শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসঙ্গ (১) লেখক শ্রীশিতিকণ্ঠ সেনগুপ্ত

'মনোমোহন সিদ্ধ মহাপুরুষ। তাঁর যে কাজ বাকী ছিল তাহাই তিনি শেষ করে গেলেন। আপনার ভাই অপেক্ষা অনেক উচ্চ-স্তরের।'—বলছেন রামঠাকুর। ভক্ত জ্ঞানচন্দ্র আচার্যকে। বিক্রম-পুর পরগণার বাহেরক গ্রামে। ১৩২০ সালের ঘটনা। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন রয়েছেন বাহেরক গ্রামের শ্রীঅম্বিকাচরণ গাঙ্গুলীর বাড়ীতে। ঐ বাড়ীতেই অসুস্থ অবস্থায় ছিলেন এই মনোমোহন গাঙ্গুলী। রক্ত-আমাশয় ও অন্যান্য নানা জটিল রোগে ভুগছিলেন। চরিত্রহীনতার জন্য গ্রামের মানুষরা তাঁকে পরিত্যাগ করেছে। মারা গেলে সৎকার করবার লোক পাওয়া যাবে না এই ভয়ে তাঁর ভ্রাতাও তাঁকে ছেড়ে পালিয়েছেন। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর সবকিছু জেনেও এই অসহায় মানুষকে পরিত্যাগ করতে পারলেন না। অসুস্থ অসহায় মানুষের সেবায় ব্রতী হলেন। যাঁর আপন বলতে ইহসংসারে তখন কেউই ছিল না, তাঁরই আপন হয়ে গেলেন শ্রীশ্রীরামঠাকুর। স্বয়ং রোগীর মলমূত্র পরিষ্কার করতেন, পথ্য যোগাড় করতেন। ঠাকুরের সেবা শুশ্রূষায় রোগী মনোমোহন গাঙ্গুলী কোনরূপ কষ্টই অনুভব করতে পারলেন না। ঠিক ঐ সময় ভক্ত জ্ঞানচন্দ্র আচার্যের জ্যেষ্ঠভ্রাতা হেমচন্দ্র আচার্যও তখন রক্ত-আমাশয়ে ভুগছিলেন। প্রত্যহ রামঠাকুর তাঁকেও দেখতে যেতেন। একদিন সকালে হেমবাবু দেহত্যাগ করলেন। ঠিক সেই সময় ঠাকুর ঐ বাড়ীর উপর দিয়ে যাচ্ছিলেন। জ্ঞানচন্দ্র ঠাকুরের শ্রীচরণ ধরে কাঁদতে কাঁদতে জ্যেষ্ঠভ্রাতার পুনর্জীবন দান করতে প্রার্থনা জানালেন। জ্ঞানচন্দ্রের মনে কোন প্রবোধ মানছে না। ঠাকুর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। অবশেষে বললেন, 'ছাইড়্যা দেন এখন আসি।' ঠাকুর চলে গেলেন। মৃতদেহের সৎকারের আয়োজন হতে লাগলো। হঠাৎ দেখা গেল মৃতের নাভিস্থল যেন নড়ছে। ঠাকুরের কাছে লোক পাঠানো হলো। ঠাকুর এলেন না। কারণ মনোমোহন গাঙ্গুলীর অবস্থা তখন খুবই খারাপ। এদিকে ধীরে ধীরে হেমচন্দ্রের জ্ঞান ফিরে এলো। তাঁকে ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। পথ্যও দেয়া হলো। কথাও বললেন। কিন্তু শেষ

রাত্রের দিকে আবার অবস্থা খারাপের দিকে গেল। জ্ঞানও হারিয়ে ফেললেন। পরের দিন হেমচন্দ্র আচার্য ও মনোমোহন গাঙ্গুলী উভয়েই দেহলীলা সম্বরণ করলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর অসহায় মনোমোহন গাঙ্গুলীর মৃতদেহ নিজেই সংকারের ব্যবস্থা করলেন। এই প্রসঙ্গে কৌতূহলী হয়ে জ্ঞানচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন রামঠাকুরকে—'দাদা একদিনের জন্য বেঁচে উঠে মারা গেলেন কেন?' প্রত্যুত্তরে ঠাকুব বললেন, 'ঐ দিনে ঐ সময় দেহত্যাগ করলে অসুরের আত্মা যেখানে বিচরণ করে সেখানে হেমবাবুব আত্মাকে থাকতে হতো। হেমবাবু এ জন্মে অনেক সংকাজ করেছেন তাই তাঁর আত্মা সং আত্মাদের সঙ্গে আশ্রয় পাইবে। তবে আবার তাকে জন্মগ্রহণ করতে হইবে।'

মনোমোহনের মত অসং চরিত্রের লোক কি করে সেস্থানে যাবে? জিজ্ঞেস করলেন জ্ঞানচন্দ্র। প্রত্যুত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর এই মন্তব্য করেছিলেন—'মনোমোহন যে সিদ্ধ পুরুষ।'

মানুষের বাইরেটাই সব নয়, অন্তর্জগতেই মানুষের আসল পরিচয়। আর ভগবান দেখেন মানুষেব অন্তব। ভাব। বাহ্য আবরণে অভিমান বাড়ায়। সাধারণ মানুষ মানুষেব বাইরেটা দেখে বিচার কবতে গিয়ে ভুল করে বসে। ঠাকুর ভক্তপ্রবব জ্ঞানচন্দ্র আচার্যব সেই ভুলটাই শোধ হয় শুধরে দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের চরিত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ঠাকুর মানুষকে কখনও ঘৃণা করেন নি। শুধু মানুষ নয় জীবমাত্রকেই প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছেন। সেবা নেওয়ার চেয়ে সেবা করাই তিনি বেশী পছন্দ করতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর মানুষের জীবনের ভবিষ্যং সম্বন্ধে যে সব মন্তব্য করতেন তা সাধারণত নির্ভুল হতো। এ রকম বহু ঘটনা বহু ভক্তের জীবনে ঘটেছে। এই বকমই একটি ঘটনা ঘটেছিল ফেণী কলেজের অধ্যাপক ভক্তপ্রবর শ্রীযুত প্রমথনাথ চক্রবর্তীর বাড়ীতে। ফেণীতে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব কণ্ট্রোলার অব এগজামিনেশনস্ শ্রীযুত বিনোদবিহারী দত্ত। তাঁরই জীবনের একটি ঘটনার ইতিহাস। ঠাকুরকে দর্শন করতে এসেছেন

প্রমথবাবুর বাসায়। শ্রীশ্রীঠাকুর বসে আছেন একটি খাটের উপর। ভক্তসমাগম হয়েছে। অকস্মাৎ ঠাকুর বললেন ভক্ত অধ্যাপক প্রভাত চক্রবর্তীকে উদ্দেশ্য করে, আপ্নের কন্যা রাশি, হস্তা নক্ষত্র নয় কি?

—ঠিক জানি না। বললেন প্রভাতবাবু।

—'হস্তা নক্ষত্রে জন্ম হইলে সেই লোক খুব বিদ্বান হয়। প্রভাতবাবুর পশ্চিমে একটা বড় চাকুরী হইবে।' হেসে হেসে বললেন ঠাকুর। এ হাসি ছিল রহস্যপূর্ণ। যে সময়ের কথা সে সময়ে প্রভাত চক্রবর্তী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপক। সুতরাং তাঁর দিক থেকে ফেণী থেকে পশ্চিমে কোন বড় চাকুরী প্রাপ্তির প্রশ্ন উঠছে না। সুতরাং এ কথার রহস্য কেহই বুঝতে পারলেন না। বিনোদবাবু চিন্তা করতে লাগলেন। তাঁরও তো কন্যা রাশি এবং হস্তা নক্ষত্র। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাসিস্ট্যাণ্ট কণ্ট্রোলারের পদের জন্য চেষ্টা করছেন। বিনোদবাবু নিজের ভবিষ্যতের কথাই চিন্তা করছিলেন। এমন সময় হঠাৎ প্রমথ চক্রবর্তী বলে উঠলেন বিনোদবাবুকে উদ্দেশ্য করে, 'আরে এসব কিছুই নয়, আপনারই ফেণীর সোজা পশ্চিমে কলিকাতায় বড় চাকুরী হইবে।' সত্য সত্যই এই মন্তব্যের দুই তিন মাস পরেই বিনোদবাবু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী কণ্ট্রোলারের পদে নিযুক্ত হলেন। বিনোদবাবু রামঠাকুরের প্রতি পরম শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করলেন।

আর একবার শ্রীযুত প্রভাত চক্রবর্তী যখন পি. আর. এস. ডিগ্রীর জন্য গবেষণা করছিলেন তখন একদিন ঠাকুরকে বললেন যে তিনি ঐ উদ্দেশ্যে আর কাজ করবেন না। কারণ আর একজন পরীক্ষার্থী আছেন। তিনি অত্যন্ত প্রতিভাবান। সুতরাং তাঁর থিসিস্ অনেক উন্নতস্তরের হবে। ঠাকুর শুনে মন্তব্য করলেন, 'পরীক্ষা দেন, আপনারা দুইজনেই পি. আর. এস. পাইবেন।' তারপর নানাভাবে উৎসাহ দিলেন ভক্তপ্রবর প্রভাত চক্রবর্তীকে। অবশেষে সত্য সত্যই একদিন জানা গেল, ওঁরা দুইজনই সংস্কৃতে পি. আর. এস. পেয়েছেন।

—

শ্রীশ্রীঠাকুর চলেছেন বিলোনিয়াতে। ভক্তপ্রবর শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ দে'র বাসায়। শ্রীযুত দে বিলোনিয়াতে রেল কোম্পানীর পয়েন্টস্‌ম্যান। একসময় ঠাকুর যে কথা দিয়েছিলেন ওঁকে ওঁর বাড়ীতে যাবেন। তাইতো এবারে ঢাকা থেকে ফেণীতে এসেই খোঁজ করলেন দেবেন্দ্রনাথের। দেবেন্দ্রনাথ ফেণীতে নেই। বদলী হয়ে গেছেন বিলোনিয়াতে। ঠাকুরও তাই চলেছেন বিলোনিয়াতে। ট্রেনে করে। সঙ্গে আছেন ভক্ত অধ্যাপক প্রমথনাথ চক্রবর্তী, তুলসীবাবু ও আরও অন্যান্যরা। পরমভক্ত যামিনীকুমার সাহা একটি টিফিন-ক্যারিয়ারে সন্দেশ ও নানারকম মিষ্টির সঙ্গে এক কাঁদি মর্তমান কলা দিয়ে বললেন বিশিষ্ট ভক্ত শ্রীযুত রোহিণীকুমার মজুমদারকে, 'দুপুর বেলা ঠাকুরকে ভোগ দিবেন।' যামিনীবাবু মনে করেছিলেন দেবেন ভাই গরীব মানুষ, ঠাকুরের ভোগের জিনিস ঠিকমত যোগাড় করতে পারবে না।

ফেণী থেকে চার পাঁচটি স্টেশন পরেই বিলোনিয়া। সকালে কয়েকজন ভক্তসহ ঠাকুর রওনা হলেন। গাড়ী নির্দিষ্ট সময়ে ছাড়তে পারে নি। কারণ স্টেশনে স্টেশনে অসংখ্য ভক্তের ভীড়। ঠাকুর যে বিলোনিয়ায় ট্রেনে চলেছেন এ কথা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই চতুর্দিকে প্রচারিত হয়ে গেছে। অবশেষে বেলা দশটার সময় ট্রেন পৌঁছালো বিলোনিয়াতে। এখন অসুবিধা হলো দেবেন্দ্রনাথের বাড়ী রেলওয়ে সাইডিং-এর ধারে, স্টেশন থেকে দেড় মাইল দূর। সমস্যা হলো অতদূরে শ্রীশ্রীঠাকুরকে কিভাবে নিয়ে যাওয়া হবে। ঠাকুরকে নিয়ে ভক্তদের চিন্তাকুল অবস্থা দেখে, স্টেশন মাস্টারের মনও কেন যেন ব্যথিত হলো। গাড়ীখানি কেটে দেবেন্দ্রনাথের বাড়ীর নিকটে পৌঁছে দিলেন। সেই স্টেশন মাস্টার মহাশয় ছিলেন একজন মুসলমান। শ্রীশ্রীঠাকুরকে সেবা করবার জন্য তাঁরও প্রাণ যেন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। তিনিও শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত হয়ে পড়লেন আকস্মিক ভাবে। অবশেষে শ্রীশ্রীঠাকুর এসে বসলেন ভক্তপ্রাণ দেবেন্দ্রনাথের ঘরের ভিতরের একখানি চৌকিতে। পূর্বপার্শ্বে

সিংহাসনে শ্রীশ্রীরামঠাকুরের একখানি চিত্রপট বসান আছে। ঠাকুর বিছানায় বসবার পরই ভক্ত দেবেন্দ্রনাথকে দেখা গেল ঘন ঘন প্রণাম করতে আর কি যেন প্রার্থনা জানাতে ঐ চিত্রপটের কাছে। রক্ত-মাংসের ঠাকুরের কাছে নয়! রক্তমাংসের ঠাকুরের চেয়ে চিত্রপটের ঠাকুর যে কোন অংশে কম নয় দেবেন্দ্রনাথের এই প্রার্থনা জানানো ও ব্যাকুলতার মধ্য দিয়ে ঠাকুরই যেন সেই কথাই প্রমাণ করতে চাইছেন। এদিকে ঠাকুরের আগমনে দেবেন্দ্রনাথের গৃহ লোকে-লোকারণ্য। অগণিত ভক্ত সমাগম হতে লাগলো। আর নানা রকমের ফল-মূল মিষ্টান্নে দেবেন্দ্রনাথের ঘর পূর্ণ হয়ে গেল। তাঁর স্ত্রী উপায়ান্তর না দেখে যা পাচ্ছেন সবই পটে উৎসর্গ করতে লাগলেন। আরও মজার ব্যাপার টিফিন ক্যারিয়ারে ঠাকুরের ভোগের জন্য যা আনা হয়েছিল তাও পটের নিকটই নিবেদন করা হলো। অপূর্ব দৃশ্য। চতুর্দিকে আনন্দের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। চাল ডাল তরী-তরকারী মিষ্টান্ন দুধ নিয়ে আসছে হাজার হাজার ভক্ত মানুষ। মহা-মহোৎসবের আনন্দে মেতে উঠলো শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দে'র গৃহ। অভাবনীয় অচিন্তনীয় ব্যাপার। দরিদ্র ভক্তদের চক্ষুও যেন উন্মূলিত হলো। শ্রীশ্রীরামঠাকুর শুধু ধনীদের গৃহেই যান না, দরিদ্রের ঘরেও যান। শ্রীশ্রীঠাকুর ধনী দরিদ্র বিচার করেন না। তিনি দেখেন প্রাণ। হৃদয়। সেই হৃদয়মন্দিরে একবার ঠাকুরকে স্থাপন করতে পারলে, তাঁকে যখন যেখানে যেভাবেই দেখা যাক না কেন জীবন্ত বলেই তো মনে হবে! কারণ তিনি যে তখন প্রাণের ঠাকুর! তখন পূজা কি আর বাইরের অনুষ্ঠান? তখন পূজা তো আর বৃন্তচ্যুত ফুল দিয়ে নয়। হৃৎসংলগ্ন রক্ত দিয়ে যে পূজা। আসল হচ্ছে ভালবাসা। ভালবাসা এলে চিত্রপটকেও জীবন্ত বলে মনে হয়। রক্ত-মাংসের দেহ আর চিত্রপটের মধ্যে কোনও প্রভেদ দেখা যায় না। কারণ সে দেখা তো মস্তিষ্ক দিয়ে দেখা নয়, সে দেখা হৃদয় দিয়ে। মন প্রাণ দিয়ে। বুকভরা ব্যাকুলতার সঙ্গে। প্রেমে বিহ্বল হয়ে। ভক্ত দেবেন্দ্রনাথও রামঠাকুরের এক চিত্রপট স্থাপন করেছিলেন গৃহে।

এবং তাঁকে জীবন্ত দেবতা বলে পূজা করতেন। প্রাণের কথা নিবেদন করতেন।

অবশেষে সত্য সত্যই মহোৎসবের আয়োজন হতে লাগলো। পাতা কাঠ সকলেই বয়ে আনছেন। জাতি বর্ণ নির্বিশেষে অসংখ্য ভক্ত মহোৎসবের কাজে মেতে উঠেছেন। উচ্চ নীচ ভেদাভেদ আছে বলে মনেই হয় না। চাল ডাল আলু ও অন্যান্য তরকারী সবই একসঙ্গে দিয়ে নিত্যানন্দ খিচুড়ী রান্নার আয়োজন হলো। দেবেন্দ্রনাথ অনুরোধ করলেন ভক্ত তুলসীবাবুকে ভোগ রান্নার জন্য। তুলসীবাবু প্রমাদ গণলেন। এত বৃহৎ মহোৎসবে তিনি কখনও রান্না করেন নি, সে রকম অভিজ্ঞতাও নেই। দু' একশত ভক্তের মেলা নয়। কয়েক হাজার ভক্ত মানুষের মেলা বসে গেছে দেবেন্দ্রনাথের গৃহে। ঘরে বাইরে প্রাঙ্গণে গাছতলায় সব মানুষ বসে গেছে। তাঁরা সকলেই ভোগ প্রসাদও নেবেন। রামঠাকুরও জাতি বর্ণ নির্বিশেষে বহু লোককে নাম দিচ্ছেন। এদিকে ঠাকুরের ভোগ রান্নাব ব্যাপার নিয়ে ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ যখন চিন্তান্বিত, ঠিক সেই মুহূর্তেই দুইজন অপরিচিত ব্রাহ্মণ এসে জিজ্ঞেস করলেন দেবেন্দ্রকে, 'ঠাকুরের ভোগ রান্না হবে কি? আমাদের ভোগ রান্নার জন্যই পাঠান হয়েছে।' কে পাঠিয়েছে? কোথা থেকে এসেছেন এ সব প্রশ্নের তখন সময় নয়। আনন্দিত চিত্তে দেবেন্দ্রনাথ তাঁদের উপর ভোগ রান্নার সব দায়িত্ব দিয়ে যেন মুক্তি পেলেন। এমনই ছিল তখন মনের অবস্থা। ওঁরাও অতি দ্রুত সুষ্ঠু ভাবেই সব রান্না সম্পন্ন করলেন। ত্রুটীহীন ছিল ওঁদের কাজ-কর্ম। মুগ্ধ হলেন সকলে ওঁদের নিষ্ঠাপূর্ণ ভোগ রান্না দেখে। বেলা বারটার মধ্যেই রান্না সম্পন্ন হলো।

চিত্রপটের সম্মুখে ভোগ নিবেদন করলেন ভক্ত তুলসীবাবু। শ্রীশ্রীঠাকুরও ঘরেই বসেছিলেন। দরজা বন্ধ করে ভোগ দেওয়া হলো। অভাবনীয় ব্যাপার। ঘরের দরজা যখন খোলা হলো পদ্মগন্ধে ঘরটি পূর্ণ। ভোগের জিনিস ঠাকুর একবার মাত্র স্পর্শ করেছিলেন। শৃঙ্খলাপূর্ণ ভাবে ভোগ প্রসাদও বিতরণ হলো।

জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকলে যে যেখানে ছিলেন পাতা পেতে বসে গেলেন। প্রসাদেরও ছিল অপূর্ব গন্ধ ও স্বাদ। মহামিলনের মহোৎসব নিজের গৃহে নয়নগোচর করে দরিদ্র ভক্ত পয়েন্টসম্যান দেবেন্দ্রনাথ দে মুগ্ধ বিস্মিত ও আনন্দিত হলেন। অনির্বচনীয় এক আনন্দ সাগরে যেন অবগাহন করতে লাগলেন। আনন্দ...আনন্দ ...আনন্দ...ওগো মহানন্দ অনন্ত...অপার। রামঠাকুরের আগমনে শুধু তার সামান্য গৃহই নয় সমস্ত বিশ্বসংসার যেন সমুদ্রের ঢেউয়ের মত আনন্দ হিল্লোলে হিল্লোলিত হয়ে উঠছে। অনির্বচনীয় এক আনন্দ মেলায় মুখরিত চতুর্দিক। ঠাকুরের সব কিছুই যে অলৌকিক! এদিকে ভোগ প্রসাদ বিতরণের আনন্দ উৎসবের সময় বহু অনুসন্ধান করেও সেই দুই ব্রাহ্মণের আর কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। কর্মকর্তারা অভিভূত হলেন ঠাকুরের লীলাখেলা দেখে।

সকাল গেল, দুপুর গেল, ধীরে ধীরে নেমে এলো সন্ধ্যার অন্ধকার। শ্রীশ্রীঠাকুর আনন্দের হাটকে ভেঙ্গে দিয়ে আবার ফিরে চললেন ফেনী অভিমুখে। ঠাকুরের গাড়ীতে বহু লোক উঠে ভীড় করতে লাগলো। ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ দূরে দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য দেখতে লাগলেন। শুষ্ক মুখ আর জলভরা চোখ নিয়ে। অকস্মাৎ ঠাকুর বললেন একজন ভক্তকে, 'দেবেন্দ্রকে এখন প্রসাদ পাইতে বলেন। তিনি এখনও কিছুই খান নাই।'

তারপর একসময় ঠাকুরের গাড়ী ভক্ত দেবেন্দ্রনাথের দৃষ্টি থেকে দূরে বহু দূরে একেবারেই অদৃশ্য হয়ে গেল। দেবেন্দ্রনাথ তখনও নীরব ও স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। হঠাৎ স্ত্রীর ডাকে সম্বিৎ ফিরে এলো। ঘরের দিকে পা বাড়ালেন।

এই ভাবেই একদিন বিলোনিয়ার লীলা সাঙ্গ করেছিলেন শ্রীশ্রীরামঠাকুর।

*　　*　　*

'নাম' কী? 'নাম করা' কী?

এই প্রসঙ্গে রামঠাকুর বলেছেন, 'নাম' শব্দে প্রকাশকে বুঝায়,

সেই প্রকাশই চিন্তা। নামের কোন শব্দার্থ নাই, নাম সত্য। নিত্য। তার কীর্তনই আনন্দ। নামকে চেনাও যা ভগবানকে চেনাও তাই। নাম শ্রীভগবানের সাথে স্বরূপতঃ অভিন্ন। 'নাম' কারো নাম নয়। নাম রূপে ভগবানই আবির্ভূত। প্রকাশিত। যেই নাম সেই ব্রহ্ম। নাম আর ভগবানের ভেদ নাই। নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মোক্ষধর্ম। ভগবানের নাম আর তাঁর রূপ একই বস্তু জেনে কেবল নাম নিয়ে পড়ে থাকবেন। নামের শরণ নিয়ে থাকলে ভগবানের নিকট থাকা হয়। আপদে বিপদে সম্পদে জনমে যিনি ত্যাগ করেন নাই তিনিই 'নাম'। 'নাম করা' অর্থই নাম বা নামীর সাথে যুক্ত থাকা। তাইতো ঠাকুর আবার বলছেন, 'নাম সংকীর্তন যে চেঁচাইয়া করিলেই হয় তাহা নহে। মনে মনে করিলেও নাম হয়। নাম বৈ আর কিছুই জগতে ত্রাণের উপায় নাই। এই বুদ্ধিকেই নাম সংকীর্তন বলে। নামের অধীন থাকার নামই সংকীর্তন। ভগবানের অধীন হইয়া থাকাই নাম সংকীর্তন।'

লৌকিক জগতের স্ত্রী-পুরুষ ভেদটি চৈতন্যের স্তরে নেই, সেখানে কোন দ্বন্দ্ব নেই। অতএব 'নাম' শব্দার্থে স্ত্রী বা পুরুষ বুঝলেও, 'নাম'-এর সাথে ইষ্টের অভিন্নতা বোধ যে অপরিহার্য! ঠাকুর আবার বলছেন, নাম করতে হয় না, নাম হয়। প্রাণে নাম করে। আমি নাম করবার কেউ নই। প্রাণেই নাম করছে। আমি মুখে উচ্চারণ না করলেও সে নাম নিয়তই হচ্ছে। কিন্তু সে নামের ধ্বনি আমরা স্থূল কর্ণের দ্বারা শুনতে পাই না। ধৈর্য ধরে প্রাণের নিকট থাকলে সেই নাম শুনতে পাওয়া যায়। নিরাকার নির্বিকার ব্রহ্মের সাকার রূপ হলো নাদ বা শ্রীনাম। এই শ্রীনামই সৃষ্টি স্থিতির মূলে। এই শব্দ ব্রহ্ম অনাদি অনাহত। এই অনাদি অনাহত নাদের মূল স্বরূপ ওঁ (অউম্)। আমরা যে ওঁ শব্দ উচ্চারণ করি তা সে অনাদি নাদ বা প্রণব নয়। প্রণবেরই একটি স্থূলরূপ মাত্র। ঐ অনাদি নাদ বা সূক্ষ্ম প্রণবকে স্থূল প্রণবে, অর্থাৎ নাম বা মন্ত্রে পরিণত করে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে দেন গুরু। গুরুদত্ত 'নাম' শ্রীনাম বা নাদের

স্থূলরূপ। এই স্থূল প্রণব বা নামই একদিন স্বপ্রকাশ অনাহত নিত্য নাদের স্তরে উন্নীত হয়ে তার সাথে মিলে যাবে। তখনই বোঝা যায় সত্যি সত্যি প্রাণেই নাম করে। নাম করতে করতে নামের সাথে যুক্ত থাকতে থাকতে একদিন এ নামই সেই অনাহত নাদের সাথে একীভূত হয়ে যাবে। এই অবস্থায়ই জীবের শিবত্ব লাভ হয়। তাইতো ঠাকুর বলেছেন, 'নাম করিতে করিতে ভগবান জাগিয়া পড়ে।' নাম করা অর্থই নামী ভগবানের সাথে যুক্ত থাকা। নাম করার সময় কোনরূপ কল্পনা করতে নেই। কতবার নাম করলাম তার একটা হিসেব রাখারও প্রয়োজন নেই। আমি নাম করছি এ অভিমান থাকলেও চলবে না। তাইতো ঠাকুর নিজে থেকে কাউকে মালাজপের বিধান দেন নি। তবে মালাপ্রার্থীকে বিমুখও করেন নি। শুধু রহস্য করে বলতেন, 'হিসাব রাখলে নিকাশ দিতে হয়।' ভক্ত প্রমথ বসু রাঁচীতে ঠাকুরের নিকট 'নাম' পান। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ঠাকুর ত কোন বিধি দিলেন না? হেসে হেসে ঠাকুর প্রত্যুত্তরে বললেন, 'বিধি দিলে বৈধব্য আসে।'

শ্রীশ্রীঠাকুর তখন ফেণীতে ভক্ত শ্রীযুত শচীন্দ্র মালাকার মহাশয়ের বাড়ীতে অবস্থান করছেন। এক উচ্চবর্ণের মহিলা ঠাকুরের কাছে নাম প্রার্থী হয়ে এলেন। ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রসাদ পেয়েছেন? বেলা হয়ে গেছে, আগে প্রসাদ পেয়ে আসুন।' ঐ বাড়ীতে অন্ন গ্রহণ করতে মহিলাটির সংস্কারে বাধে, কাজেই তিনি বার বার ঘুরে ফিরে আবার গিয়ে ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হন। ঠাকুরও বার বারই জিজ্ঞেস করেন, 'প্রসাদ পেয়েছেন?' অবশেষে সন্ধ্যার কিছু পূর্বে ঠাকুর বললেন মহিলাটিকে, 'এখানে 'নাম' নাই। আগে মন পরিষ্কার করে আসেন তারপর 'নাম' পাইবেন।'

সে যাত্রায় আর মহিলাটির নাম পাওয়া হলো না।

এক নাম প্রাপ্ত ভক্ত তো ঠাকুরকে প্রশ্নই করে বসলেন, কোন অনুষ্ঠান নাই, কানে মন্ত্র দেওয়া নেই, জোরে জোরে সবার সামনে 'নাম' বলে গেলেন। এ কেমন ধারা সাধন দান? প্রত্যুত্তরে সহজ

কণ্ঠে বললেন ঠাকুর, 'ক্যান? অনুষ্ঠান তো হইলই। 'নাম'ই অণু, আর সেই নামই হৃদয়ে অনুষ্ঠিত হইল। আর মন্ত্র তো জপ হয় প্রাণে এবং মন্ত্র পায়ও প্রাণে।'

—বাবা আপনি তো কৃষ্ণ নাম দিলেন, এখন আমি শিবপূজা করতে পারবো তো? জিজ্ঞেস করেলেন একজন ভক্ত।

—হুঁ, খুব পারবেন। শিবপূজা করবেন। শিবপূজা করণ খুব ভাল।

চৌমুহানীতে ভক্ত নরেনবাবু স্থির করলেন রামঠাকুরকেই শিব জ্ঞানে পূজা করবেন। যেমন ইচ্ছা তেমন কাজ। শিবরাত্রিতে ফুল বিল্বপত্র প্রহরে প্রহরে শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে অর্পণ করে পূজা করলেন, ঠাকুরও সে পূজা গ্রহণ করে ভক্ত নরেনবাবুকে কৃতার্থ করলেন।

চৌমুহানীতে ছিলেন এক ভক্তিমতী মহিলা*। রামঠাকুরের ভক্ত। প্রায় সমস্ত উৎসবেই তিনি উপস্থিত থাকেন। বাড়ীর প্রতি কিন্তু তাঁর কোন লক্ষ্যই নেই। তিনি মনে করতেন সংসারের কাজের চেয়ে ঠাকুরের কাজ অনেক বড়। মহিলাটির আর একটি অভিমান ছিল, কেউ কিছু জানে না। উৎসবে তিনি উপস্থিত না থাকলে উৎসবের অঙ্গহানি হবে। তাঁর মত এমন নিঁখুত ভাবে পূজার কাজ কেউ করতে পারে না। একদিন ঠিক এমনই এক উৎসবে তিনি তৈরী হয়ে এসেছেন। এসে ভাবলেন কাজে হাত দেবার আগে ঠাকুর দর্শন করে আসি। অদ্ভুত কাণ্ড! ভক্তিমতী মহিলাটি ঠাকুরের ঘরে প্রবেশ করা মাত্রই ঠাকুর বললেন, 'আপ্নে এখানে? আপ্নে বাড়ীতে চইলা যান। আপনে এখানে থাকবেন না। আপনে না গেলে আমিই চইলা যামু।'

ঠাকুরের মুখে এই কথা শুনে ভক্তবৃন্দ মহিলাটিকে তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে চলে যেতে বললেন। মহিলাটিও উপায়ান্তর না দেখে বিদায় নিলেন। ঠাকুর শান্ত হলেন। পরে ভক্তবৃন্দকে বললেন,

---

* শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসঙ্গ—শ্রীশিতিকণ্ঠ সেনগুপ্ত।

'বাড়ীতে স্বামী অসুস্থ, তাঁকে পথ্য দিবার লোক নাই। কর্তব্য কর্ম ছাইরা তিনি আসছেন ধর্ম করতে? ঘরে বইসা স্বামীসেবা করলেই সব পাওয়া যায়।' লৌকিক স্বামীর সেবা করাই সতী নারীব সর্বপ্রধান কর্তব্য। এই কথাই যেন ঠাকুর বলতে চেয়েছেন। বোঝাতে চেয়েছেন মহিলাটিকে। পতি শব্দে ঠাকুর ভগবানকেই লক্ষ্য করতেন। পতিব্রতা ধর্ম, সত্যনারায়ণ ব্রত, সত্যব্রত ইত্যাদি ঠাকুর এক অর্থে ই ব্যবহার করতেন। সত্যের সেবা করিতে করিতে সতী হয়। নাম সত্য, সত্যের অধীনস্থ হইলে সতী হয়। পতি সকল অবস্থায় উদ্ধার করেন, এজন্য ভগবানকে পতি বলিয়া থাকে এবং নাম যাহা পাইয়াছেন সেই নামই ভগবান। এই নামকেই সর্বস্ব জেনে নামের অধীনে থেকে কর্তব্য করে যাবার নির্দেশই ঠাকুর সকলকে দিয়েছেন। পতিব্রতা ধর্ম বুঝাতে গিয়ে ঠাকুর সীতা-দেবীর উপাখ্যানটি প্রায়ই বলতেন।

সীতা রাজনন্দিনী। তবুও বনবাসের ক্লেশ তাঁকে মোটেই দুঃখ দিতে পারে নি। তিনি সর্বদাই স্বামীর চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকতেন। স্বামী-অন্ত প্রাণা ছিলেন। অকস্মাৎ সামান্য প্রলোভনের মোহে তিনি রাক্ষস রাবণের কবলস্থ হলেন। রাবণ কেবলই সীতাকে প্রলোভন দেখাচ্ছেন,—'যদি তুমি আমায় বরণ কর তাহলে তুমি এই স্বর্ণলঙ্কার অধীশ্বরী হতে পারবে।' আবার শাসনও করছেন একথা বলে যে, 'যদি আমাকে পতি বলে স্বীকার না কর তাহলে তোমাকে নিদারুণ দুঃখ ভোগ করতে হবে।' কিন্তু সীতাদেবী রাক্ষসের সমস্ত প্রলোভন ও শাসন অকাতরে সহ্য করে অবিরত রামের চিন্তায় ডুবে ছিলেন, রামের সঙ্গেই একাত্মা হয়ে ছিলেন। অবশেষে সেই রাম এসেই তাঁকে উদ্ধার করলেন।

সুতরাং সেই 'পতি' অর্থাৎ ভগবানের চিন্তায় সর্বদা বিভোর হয়ে কর্তব্য কর্ম করা। আর সবকিছু সহ্য করা। মুক্তির একমাত্র উপায় প্রারব্ধের বেগ সহ্য করা এবং সতত নামে যুক্ত থাকা। নামের আশ্রয়ে থেকে নামের সেবা করা। পতি সকল অবস্থায় উদ্ধার

করেন, এজন্য ভগবানকে 'পতি' বলিয়া থাকে এবং নাম যাহা পাইয়াছেন সেই নামই ভগবান। দয়াল প্রভুর হাতে কর্তৃত্বটুকু দিয়ে সতত তাঁকে স্মরণে মননে রেখে ধৈর্য ধরে যাবতীয় কর্তব্য কর্ম তাঁরই সেবা বুদ্ধিতে করে যাওয়া। সংসার মায়াময় দুস্তর তরঙ্গ। উদ্ধারের একমাত্র ভেলা পতিব্রতা ধর্ম, সত্যনারায়ণ ব্রত। আত্মাই দেহের কর্তা, প্রারব্ধ ভোগই দেহের কর্ম। এই জ্ঞানে অভিমানী হইয়া অতি দুরাচারীও নিত্য মুক্তি লাভ করিতে পারে।

এ সংসারে তুমি কর্তা নও ইহাই তোমার জানিবার প্রয়োজন। চিরকাল তো কর্তৃত্ব করিয়া আসিতেছেন, কোন কার্য সম্পূর্ণ করিতে পারিয়াছেন? বিচার করিয়া দেখুন আপনার ভাগ্যে যাহা আছে তাহাই পাইয়াছেন, তার অতিরিক্ত কিছুই পান নাই।

* * *

ভক্তবৎসল রামঠাকুর যখন যেখানেই অবস্থান করেন, সেখানেই বসে যায় আনন্দের হাট। কঠিন তত্ত্বকথাও সরল করে সহজ করে সকলের মত করে বলেন। ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ সেই তত্ত্বকঠিন ভাবনাগুলিকে 'সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ'* গ্রন্থে সন্নিবেশিত করে রেখেছেন। ঠাকুর বলছেন,—

কুণ্ডলিনী কি? কুণ্ডস্থিত বা কুণ্ডাশ্রিত শক্তি। কুণ্ড মানে আধার। শক্তি যখন আধারে আছে বা অবলম্বন ধরিয়া আছে তখন উহা কুণ্ডলিনী। ইহা শক্তির সুপ্ত অবস্থা। যখন শক্তি শিবকে বা শূন্যকে অবলম্বন করিবে অর্থাৎ নিরাশ্রয় বা নিরালম্ব হইবে, তখনই কুণ্ডলিনী জাগ্রত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। দ্বিদলের উপরে শূন্য বা নিরালম্ব। ওখানে আর আশ্রয় নাই—নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ। দ্বিদল মানে দুই পক্ষ। উহাই কেন্দ্র। ওখান হইতে দুই দিকেই যাওয়া যায়। উপরে অব্যক্ত। নিম্নে দৃশ্য।

ষট্চক্র মানে ষড়যন্ত্র। কারণ চক্রই যন্ত্র। ইহারাই চক্রান্ত বা

---

* দ্রঃ সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ (পরিচ্ছেদ রামঠাকুরের কথা)—ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ।

ষড়যন্ত্র দ্বারা আমাদিগকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। আমরা যদি অবলম্বন-শূন্য হই অর্থাৎ শূন্যকে আশ্রয় করি তাহা হইলে ইহারা কিছুই করিত না। বুঝিতে হইবে তখনই ষট্চক্র ভেদ হইয়া গেল্।

যাহাকে শ্বাস প্রশ্বাস বলা হয় বস্তুতঃ তাহা ধীরগতি বা সূক্ষ্মগতি। উহাকেই ধরিয়া রাখিতে হয়—উহাই সৎসঙ্গ। উহারই মাহাত্ম্যে শূন্যে স্থিত হওয়া যায়। অণু হওয়া যায়। কর্তৃত্ব কাটিয়া যায়। কর্তৃত্ব গেলে চিন্তা যায়। পাপ পুণ্য যায়। স্বভাব প্রাপ্তি হয়। কর্তৃত্ব থাকিতে ব্রজে যাওয়া সম্ভবপর নয়। বড় জোর শান্ত ভূমি পর্যন্ত যাওয়া চলে। কর্তৃত্ব ছাড়িয়া উন্মুখ হইলে ব্রজের পথ পাওয়া যায়। ব্রজধামে আছে যোগমায়া। তাহার বাহিরে পরব্যোমে আছে মায়া। মায়ার আবরণ রূপে আছে মহামায়া বা অহংকার। মহামায়ার আবরণ রূপে মোহমায়া অর্থাৎ মমত্ববোধ। কর্তৃত্ব বা পুরুষকারের দ্বারা ব্রজে যাওয়া যায় না। বিচার করাই কর্তৃত্ব। শূন্যকে আশ্রয় করিলেই বিচার থাকে না। ব্রজে সম্পূর্ণ নির্ভর ভাব। যত কিছু ভয় হউক বা যাহাই হউক তবুও নির্ভর। নিজের চেষ্টা নাই।

যোগমায়ার রাজ্যে গেলে আর পতন হয় না। ঐ স্থানে মিলনেও যোগ। বিচ্ছেদেও যোগ। যোগ থাকেই। কিন্তু মায়াতে তাহা হয় না। ইহা ভেদ ভূমির ব্যাপার।

ভাবসমুদ্র মন্থনে লক্ষ্মী অমৃত ইত্যাদি উঠিয়াছিল। ইহাই প্রথম স্তর। এটি যোগমায়ার মন্থন। পরে বিষ উঠিয়াছিল। ইহাই বিষয়। এই বিষয়কে পান করেন শিব। শিব মানে আকাশ। অচল। স্থির। এইটি মায়ার মন্থন। এই সব জীবে কাম জাগে বলিয়া এখান হইতে পতন হয়।

যার একূল আছে তার ওকূলও আছে। দুই কূলই আছে। যার কূল নাই সে অকূল। অকূলে তরঙ্গ নাই। কূল থাকিলে তরঙ্গ অবশ্যম্ভাবী।

পুরুষ মানে চেষ্টা বা পৌরুষ। প্রকৃতি মানে স্বভাব। চেষ্টা

স্বভাবে মিলিত হলে তখন চেষ্টা থাকে না। তাই স্বভাব প্রাপ্তিকেই যুগল মিলন বলে। ইহাই প্রকৃতি ও পুরুষের মিলন।

শ্রীকৃষ্ণ—মধ্যে, রাধা—বামে—ইনি লীলাশক্তি। ইহা হইতেই অর্থাৎ বাম অঙ্গ হইতেই লীলার প্রসার হয়। রাম (বলরাম)—দক্ষিণে, ইনি ক্রিয়া বা খেলার শক্তি। ইহা হইতে সৃষ্টি প্রভৃতির প্রসার হয়।

অদ্বৈত নিত্যানন্দ ও গৌরাঙ্গ, মূলে একই বস্তু। অদ্বৈত হচ্ছেন মহাবিষ্ণু। যিনি সর্ব অবতারের মূল। নিত্যানন্দ সংকর্ষণের স্বরূপ। বলরাম প্রভৃতি বা জীব প্রভৃতির ইনি উৎস। গৌরাঙ্গলীলার প্রস্রবণ।

কাশী দেহত্যাগের স্থান। এইখানে দেহত্যাগ হয়। তারপর নন্দন বনে অর্থাৎ লীলাভূমিতে প্রবেশ হয়। ইহাই বৃন্দাবন। ইহাই কুঞ্জ প্রবেশ। ইহার মধ্যস্থানটির নাম নিকুঞ্জ। উত্তর কাশী, মধ্য কাশী ও দক্ষিণ কাশী। প্রথমটি আদি। অন্তিমটি নবীন।

কাশী ত্রিশূলের উপর অবস্থিত। শূল মানে দুঃখ বা তাপ। ইহা ত্রিতাপের উপর।

ভগবান ও স্বভাবে কোন ভেদ নাই। স্বভাব মানে প্রকৃতি। অগ্নি ও প্রভায় যেমন ভেদ নাই ইহাও ঠিক সেইরূপ। ভক্ত তন্ময় বলিয়া পৃথক নহে।

সব আত্মাই সকলের পরিচিত। মলিনতাবশতঃ কেহ কাহাকেও চিনিতে পারে না। চিনিলে আর পর থাকে না।

কিছু চাইতে নাই, গুরুর দান অযাচিত। গুরু যে বীজ দেন সেই বীজের সঙ্গে বাস করতে হয়। উহার সঙ্গে ঘরকন্না করতে হয়, উহাকে ভালবাসতে হয়। বীজের সঙ্গে বস্তুতঃ গুরুই জন্মগ্রহণ করেন। তাই ছাড়িয়া যাইবার উপায় নাই।

গুরু কি করেন? না, নৌকাটিকে ঠেলা দিয়া দেন। পরে শিষ্যকে দাঁড় টানিতে হয়। নতুবা শুধু গুরুর ঠেলাতে চলিতে হইলে শিষ্যের অত্যন্ত কষ্ট হয়। কারণ সে সামলাইতে পারে না। নিজের দাঁড়

টানিতে হয় শুধু বেগ সামলাইবার জন্য। গুরু ত সবটা দিয়া রাখিয়াছেন। প্রয়োজন অনুসারে শিষ্য সবটাই প্রাপ্ত হয়।

দীক্ষার কাল আছে। নারী রজস্বলা হইলে যেমন পতিসঙ্গ আবশ্যক, তেমনি শিষ্যের ভিতরের প্রকৃতি যতক্ষণ না রজস্বলা হয় ততক্ষণ গুরু তাহাতে বীজ বপন করেন না। এই বীজ হইতে সৃষ্টি হয়।

বাহির হইতে শক্তি সঞ্চার করায় বিশেষ কিছু লাভ হয় না। সাময়িক একটা উল্লাস আসে মাত্র। পরে অধিক ধাক্কা লাগে। তখন প্রথম যেখানে ছিল তাহা হইতে অধিক নিম্নে পড়িয়া-যায়। ইহাতে সাধকের বহু কষ্ট ভোগ করিতে হয়। শনৈঃ শনৈঃ হইলেও খুব ভাল।

এমন সরল করে সহজ ভাষায় কে বলেছে ধর্মের কঠিন তত্ত্ব-কথা? ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্বকথার সরল ব্যাখ্যা শুনে তাইতো একদিন কবি নবীন সেনও বলেছিলেন, 'রামঠাকুর ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব জলের মত বুঝাইয়া দিত।' সত্যসত্যই তিনি আজীবন ব্যাপী ধর্মের মূল সত্যকে, শুদ্ধ সত্যকে প্রকাশ করবার চেষ্টা করে গেছেন। মিথ্যার আবরণে যে শুদ্ধ সত্য ঢাকা রয়েছে সেই আবরণ বিদীর্ণ করে ভাগবদ বিভূতি, দিব্যশক্তি মানুষের মধ্যে, পৃথিবীর সমস্ত জীবের মধ্যে ফুটিয়ে তুলবার সাধনা করে গেছেন। তিনি বিশেষ কোন সম্প্রদায়ভুক্ত সাধু ছিলেন না। তিনি শক্তি মন্ত্রেও দীক্ষা দিয়েছেন আবার বৈষ্ণব মন্ত্রেও দিয়েছেন। মুসলমান ভক্তদের প্রতিও ছিল তাঁর অপার কৃপা। তাঁর ছিল সমদৃষ্টি। ঈশ্বর আরাধনার ব্যাপারে তাঁর মধ্যে কোনরূপ সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা ছিল না। আধ্যাত্মিক উন্নতি, মুক্তির কথাও যেমন বলেছেন আবার প্রেমধর্ম, নামসঙ্কীর্তন ও নামাশ্রয়কে জীবের একমাত্র আশ্রয় বলে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি একদিকে যেমন মহাবৈষ্ণব অপরদিকে মহাতান্ত্রিক ও মহাযোগীও বটে। সবকিছুই। তিনি কোন সঙ্ঘ করেননি। বিশেষ কোন ধর্মমত পোষণ করে প্রচারের ব্যবস্থাও করেন নি। সর্বদাই প্রচ্ছন্ন থেকে দুঃখতাপিত

প্রপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সমব্যথী হয়ে শান্তি লাভের পথ দেখিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। চিন্ময়লোকের অমৃতবার্তা শুনিয়েছেন, মোহাচ্ছন্ন মনকে সত্যের আলোকে দীপ্তিমন্ত করে তুলবার চেষ্টা করেছেন। তিনি ছিলেন সত্যদ্রষ্টা ঋষি। পরম যোগী। কবি নবীন সেন যথার্থই বলেছেন, 'ভগবদ্দর্শী সাধননিষ্ঠ প্রচ্ছন্ন পুরুষ বিগ্রহ। ফোঁটা তিলক গেরুয়া পোশাক প্রভৃতি দ্বারা সাধু বলিয়া নিজকে প্রচার করিতে আসেন নাই। প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া সত্যধর্ম প্রচাব করাই উদ্দেশ্য ছিল।'

*　　*　　*　　*

—বাবা! যাদবপুরে আমার একটু জায়গা আছে। সেখানে একটা কোঠা করলে কেমন হয়? জিজ্ঞেস্ করলেন ভক্তপ্রবর ক্ষিতিভূষণ সেন। ধনী মানুষ। আসামের চা বাগানের মালিক। রামঠাকুরের নামে পাগল।

—ভালোই হয়। ঠাকুর মৃদু হেসে বললেন। ক্ষিতিভূষণবাবুও দ্বিগুণ উৎসাহে অতি দ্রুত ঘর তৈরী করে ফেললেন।

আবার একদিন জিজ্ঞেস করলেন, বাবা! ঘর তৈরী প্রায় হইছে। ঘরের সামনে একটু বারান্দা করবো?

খুব ভালোই হইবো। বললেন ঠাকর।

বারান্দাও তৈরী হলো। সব কিছুই দ্রুত হচ্ছে। ভক্ত ক্ষিতিভূষণবাবুর ধারণা শ্রীশ্রীঠাকুর যখন বাস করবেন তখন অনেক ভক্ত সমাগম হবে। ভক্ত এবং ঠাকুর কারোরই যাতে কোন প্রকার অসুবিধা না হয় সেই সব দিক চিন্তা করেই সব কিছু করছেন। কারণ ঠাকুর এক সময় বলেছিলেন কেউ যদি একখানি কুঁড়ে ঘর তৈরী করে দেয় তাহলে একটু নিরিবিলিতে শান্তিতে বাস করতে পারি।

আবার একদিন দোতলা করবার ইচ্ছাও প্রকাশ করলেন ঠাকুরের কাছে ক্ষিতিভূষণবাবু। ঠাকুর উৎসাহভরে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। এবং নিজহাতে দোতলার ঘরসহ একটা প্ল্যান করে

দিলেন। তারপর পাঁজি দেখে ১৩ই ফাল্গুন গৃহপ্রবেশের দিনও স্থির করলেন। এবং ভক্তদের বলে দিলেন ঐদিন মায়েদেরও যেন অবশ্যই সঙ্গে নিয়ে আসেন সকলে।

ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো সেই শুভদিনটি। বিচিত্র ব্যাপার! যাঁর জন্য আশ্রম তৈরী হলো তিনি তো যাবার কথা একবারটিও বলছেন না! বিচলিত হলো ভক্ত ক্ষিতিভূষণের মন।

—বাবা! আপনি কখন যাবেন? অধীরভাবে জিজ্ঞেস করলেন ক্ষিতিভূষণবাবু।

—আমি কই যামু? বিস্মিত হয়ে ঠাকুর বললেন।

—কেন? যাদবপুরের আশ্রমে। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন ক্ষিতিভূষণবাবু। আমি তো আপনেদের কাছে সর্বদাই আছি। আবার যামু কই?

ঠাকুরের কথা শুনে ক্ষিতিভূষণবাবুর বাক্ রোধ হয়ে গেল। মহামহোৎসবের আয়োজন হয়েছে। ভক্তবৃন্দদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। সবকিছুই প্রস্তুত। ঠাকুরের অনুপস্থিতিতে উৎসবের আনন্দই যে হয়ে যাবে নিষ্প্রভ। ঠাকুরের পা জড়িয়ে ধরে নয়নজলে ভাসতে লাগলেন ভক্তপ্রবর ক্ষিতিভূষণ সেন। ঠাকুর তাঁকে মধুর বাক্যে সন্তুষ্ট করে পায়ের জুতাজোড়া খুলে দিয়ে বললেন, 'এই নিয়ে যান, আসনে প্রতিষ্ঠা করেন। তা হইলেই আমার থাকন হইল।'

এবং আশ্রম প্রতিষ্ঠার সমস্ত দায়িত্ব দিলেন ডাঃ সতীন্দ্রমোহন দাশগুপ্তের উপর। ডাঃ দাশগুপ্ত এবং তাঁর স্ত্রী ঠাকুরের দেওয়া দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবেই প্রতিপালন করেছিলেন।

অবশেষে সেই পাদুকা নিয়েই মহোৎসব সুসম্পন্ন হলো। ১৩৪৯ সনের ১৩ই ফাল্গুন প্রতিষ্ঠিত হলো যাদবপুরে শ্রীশ্রীরামঠাকুর আশ্রম। শ্রীশ্রীকৈবল্যধাম।

পরের দিন অবশ্য কিছুক্ষণের জন্য ঠাকুর এসে আশ্রমের সম্মুখীন রাস্তায় ভক্তমণ্ডলীকে দর্শনদান করেছিলেন। মোটর গাড়ীতে

এসে গাড়ীতেই অপেক্ষা করেছিলেন কিছু সময়। শ্রীচরণ দর্শন ও স্পর্শ করে নিজেদের ধন্য মনে করেছিল উপস্থিত ভক্তমণ্ডলী। অনির্বচনীয় আনন্দের হিল্লোল প্রবাহিত হয়েছিল ভক্ত প্রাণে প্রাণে।

পরবর্তীকালে ইংরাজী ১৯৫৫-৫৬ সালে যাদবপুরের এই ছোট্ট আশ্রমটিকে কেন্দ্র করে আরও বৃহৎ আশ্রম গড়ে ওঠে। তিন বিঘা জমি নেওয়া হয় এবং নূতন সুবৃহৎ মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়। কতিপয় বিশিষ্ট ভক্তদের অর্থে ও প্রচেষ্টায়। এঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন রামঠাকুরের স্নেহধন্য বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শ্রীরবি মিত্র, এঞ্জিনিয়ার শ্রীযোগেশচন্দ্র গুহ, শ্রীপরেশচন্দ্র চাটার্জি ও শ্রীপ্রিয়নাথ নন্দী।

* * *

তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়েছে। বিভীষিকার সৃষ্টি হয়েছে ইউরোপ খণ্ডে। যুদ্ধের সে বিভীষিকা ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে। ভারতবর্ষের পূবপ্রান্ত পূববঙ্গ ও আসাম অঞ্চলের মানুষেরাও হয়ে পড়েছে ভীতিবিহ্বল। আশঙ্কায় হয়ে উঠেছে বিচলিত। ভক্তপ্রাণ রামঠাকুরও বেরিয়ে পড়লেন গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে ভক্তদের বিচলিত মনকে শান্ত করবার মানসে। পরিধানে একখানি থানধুতি, গায়ে সেই কাপড়েরই আঁচল। নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে। আত্মগোপন করে। মাঝে মাঝে অল্প সময়ের জন্য অন্য প্রদেশেও গেছেন। তাহলেও বিশেষ করে যুদ্ধের সময় তিনি কলকাতা, ঢাকা, চাঁটগা, কুমিল্লা, নোয়াখালি, ফেণী, চাঁদপুর, ময়মনসিংহ ও অসামের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করে, ভক্তদের ঘরে ঘরে অবস্থান করে, ভক্তপ্রাণে করেছেন সাহসের সঞ্চার। কোনদিনই তিনি আশ্রমের নিরালায় বসে নিরলস জীবন যাপন করেন নি। কর্মযোগী মহাপুরুষ মানুষের সেবায় নিজের দেহকে করেছিলেন উৎসর্গ।

দিন মাস বছর। বছরের পর বছরও হলো অতিক্রান্ত। আবার এলো নূতন বছর। নূতন দিন। সেই বিশ্বযুদ্ধেরও হলো অবসান।

ধীরে ধীরে ঠাকুরের শ্রীদেহও ভেঙ্গে পড়লো, ভক্তরাও চিন্তিত হলেন। কোন কোন ভক্ত ঠাকুরকে বললেন, এখন ত যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল, দেশে শান্তি ফিরে আসবে। ঠাকুর যদি কিছুদিন এক জায়গায় থেকে বিশ্রাম করেন, তাহলে শ্রীদেহ একটু সুস্থতা লাভ করতে পারে।

'—আমার চোখে ত যুদ্ধ শেষ হইছে দেখি না। যুদ্ধ চারিদিকে লাইগ্যাই আছে। শান্তিও এখন নাই। শান্ত না হইলে শান্তি আসে না। বিশ্রাম আমার ভাগ্যে নাই। আমি একটা ঝড়ের কুটা। আমারে ঝড়ে যেখানে নিয়া যায় সেখানেই যাই। আর যেখানে যতটুকু সময় রাখে ততটুকু সময় থাকি। ঠাকুর বললেন হেসে হেসে।

তারপর সত্য সত্যই আবার একদিন অশান্ত হয়ে উঠলো পূর্ব-বঙ্গের মাটি আব বাতাস। ১৯৪৬ সালে নোয়াখালীতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হলো সুরু। সেই লঙ্কাদহনের সময় ঠাকুর ছিলেন চৌমুহনীতে। ভক্তদের বাংলোতে। ভক্তপ্রবর উপেন্দ্রকুমার সাহা আর ভক্ত নরেন্দ্রবাবু ও মহেন্দ্রবাবু ছিলেন ঠাকুরের সেই দ্বারকাপুরের সেবাইত। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ভীষণ আকার ধারণ করলে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলকেই ঠাকুর সেখানে আশ্রয় দিলেন। সকলকে অভয় দিয়ে হৃদয়ে সাহস সঞ্চার করে ঐ বাংলোতে সাময়িকভাবে বাস করতে আদেশ দিলেন। কোন রকম হামলা ঐ বাংলোতে হয়নি। সে সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের বহুমুখী বিভূতি অতর্কিতভাবে কোন কোন ভক্তের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়েছিল।

আবার এলো একটি শুভদিন। ১৩৫৫ বঙ্গাব্দের ২৯শে মাঘ পূর্ণিমা তিথিতে ঠাকুরের পূত জন্মভূমি ডিঙ্গামাণিকে শ্রীশ্রীসত্য-নারায়ণ সেবামন্দির প্রতিষ্ঠা উৎসব। ঠাকুর তখনও অবস্থান করছেন চৌমুহনীতে। এই ডিঙ্গামাণিক আশ্রম প্রতিষ্ঠা হয় ১৩৪৯ সনের আষাঢ় মাসে গুরুপূর্ণিমার পুণ্য তিথিতে। এই আশ্রমে একটি সেবা-মন্দির ও তদানুষঙ্গিক গৃহাদি নির্মাণ করবার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর

তাঁর একনিষ্ঠ ভক্ত শ্রীরবীন্দ্রকুমার মিত্রকে বলেছিলেন, তিনি কষ্ট স্বীকার করেও এই কাজটি যেন অতি সত্বর সুসম্পন্ন করতে চেষ্টা করেন। রবীন্দ্র মিত্র মহাশয় কয়েকজন বিশিষ্ট ভক্তের সহযোগিতায় এই কার্য সুসম্পন্ন করেছিলেন। মহামহোৎসবের আনন্দে মুখব হয়ে উঠলো ডিঙ্গামাণিক গ্রাম। দলে দলে হিন্দু মুসলমান দূব দূরান্তের গ্রাম থেকে এসে মহোৎসবে যোগ দিল। সকলেই রামঠাকুরের ভক্ত। এক প্রাণ এক আত্মা, নেই যেন কোন ভেদাভেদ। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে কীর্ত্তনে মেতে উঠলো। উদয়াস্ত চললো কীর্তন। নাম গান। কৃষ্ণ গুণগান। প্রাণস্পর্শী কীর্তনানন্দে বিভোর হলো ভক্তবৃন্দ।

হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীমধুসূদন
বাম নাবায়ণ হবে।

*　　　　*　　　　*

জয় জয় বাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ শ্রীমধুসূদন
রাম নাবায়ণ হরে।

অনির্বচনীয় এক আনন্দ মধুর পবিবেশেব হলো সৃষ্টি। সেই শুচিশুদ্ধ পরিবেশের মধ্যে ৩০-৩৫ হাজার ভক্ত হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান, সকল সম্প্রদায়, সকল ধর্মেব লোকই, এক সঙ্গে বসে গ্রহণ করলেন ঠাকুরেব ভোগপ্রসাদ। শুচি অশুচির ব্যাপার নেই। ছুঁতমার্গেরও নেই কোন বালাই। সেই অভূতপূর্ব দৃশ্য নয়নগোচর করে মুগ্ধ বিস্মিত ও অভিভূত হয়েছিলেন কলকাতার বিশিষ্ট ভক্তবৃন্দ। তখন দেশ বিভাগ হয়েছে। কিন্তু সেই মহোৎসব প্রাঙ্গণে হিন্দু মুসলমানের মিলিত উৎসব দেখে সকলেরই মনে হয়েছিল আমরা মানব জাতি। এক জাতি। এক প্রাণ। আমরা কোন্ সম্প্রদায়? এই প্রশ্নের উত্তরে একদিন ঠাকুব বলেছিলেন—'আমরা মানব সম্প্রদায়।' তারই যেন জীবন্ত উদাহরণ ডিঙ্গামাণিকের এই মহাৎসবের অনুষ্ঠানটি।

ঠাকুর সেদিন শ্রীদেহে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না সত্য, কিন্তু

তাঁর বিরাট সত্তার স্পন্দন সমুদ্রের অন্তহীন বিপুল কলোচ্ছ্বাসের মত ভক্তবৃন্দের হৃদয়কে করে ফেলেছিলো আচ্ছন্ন। তাঁর চিরমধুর লীলাখেলার পশ্চাতে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল ভগবৎশক্তির মূর্ত প্রকাশ। তাইতো তিনি মঙ্গলময়। প্রেমময়। তাঁরই আনন্দে আনন্দময় হয়ে উঠেছে উৎসব প্রাঙ্গণ। ভক্ত প্রাণ। বিশ্বসংসার। আনন্দই ব্রহ্ম। ব্রহ্মই আনন্দ। ভগবান যে আনন্দময়। সত্য-দ্রষ্টা মহাঋষি পরমযোগী রামঠাকুরও আনন্দময়।

১৯৪৯ সনের আষাঢ় মাসে শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তপ্রাণ শ্রীযুত উপেন্দ্র-কুমার সাহাকে জানালেন যে তাঁব কিছুদিন খুব নিরিবিলি থাকবার প্রয়োজন। ঠাকুরের ইচ্ছার কথা জানতে পেরে উপেন্দ্রকুমার সাহা শ্রীশ্রীঠাকুরকে অনুরোধ করলেন চৌমুহনীতে তারঃ খালি বাংলো-টিতে থাকবার জন্য। ঠাকুরও সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। তখনই শ্রীযুত উপেন্দ্রকুমার তার ভাই নরেনকে লিখে দিলেন বাংলোটির সুবন্দোবস্ত করতে, যাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের বাস করবার পক্ষে কোনরূপ অসুবিধা না হয়। তিন চার দিনের মধ্যেই আবশ্যকীয় সব রকম কাজ সুসম্পন্ন করে স্নেহাস্পদ ভ্রাতা নরেন সংবাদ পাঠালেন। উপেন্দ্রকুমারও আর দেরী করেন নি। প্রাণের ঠাকুর রামঠাকুরকে নিয়ে উপস্থিত হলেন চৌমুহনীতে। তখন থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত রামঠাকুর চৌমুহনীতে উপেন্দ্রকুমার সাহার বাড়ীতেই অতিবাহিত করেন।

আর একটি নূতন দিন। ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো সর্পিল গতিতে ঠাকুরের জীবনে। সেদিন ঠাকুর যেন কি এক গভীরতায় আছেন ডুবে। আত্মসমাহিত অবস্থা। ভক্তরা ঘিরে আছেন ঠাকুরকে। ঠাকুর যে অসুস্থ।

'আপনেরা ঐ ঘরে যান। আমি অখন একটু ঘুমাই।' মৃদু কণ্ঠে ঠাকুর বললেন আশ্রিতবৃন্দদের লক্ষ্য করে। সং। সত্যই পরমুহূর্তেই ঠাকুর হলেন চিরনিদ্রায় শায়িত। ঠিক যেন সুস্থ মানুষটি পাশ ফিরে শুলেন। বাংলা ১৩৫৩ সনের ১৮ই বৈশাখ,

রবিবার। পুণ্য অক্ষয়তৃতীয়া তিথিতে। ইংরাজী ১৯৪৯ সালের ১লা মে। নব্বুই বৎসর বয়সে।

মৃত্যুর অন্ধকারে নিমজ্জমান নয়! সমস্ত অন্ধকারের অন্তর্লোকে উদিত হলো যেন একটি তমোহারী সুপ্রভাতের সূর্য। তারই উজ্জ্বল প্রভায় উদ্ভাসিত হয়ে অমৃত আস্বাদনের জন্য অনন্তের পথে ছুটে চললো সেই মহাপ্রাণ। ভক্তপ্রাণ আলোকিত হয়ে উঠলো সেই আলোকদ্যুতিতে। অমৃতের আনন্দধারায় আনন্দের হিল্লোল প্রবাহিত হয়ে চললো ভক্ত প্রাণে প্রাণে। কান্না নয়! মৃত্যুর কান্নাকে ছাপিয়ে তখনও যেন ভক্তবৃন্দের কর্ণগোচর হতে লাগলো ঠাকুরেরই কণ্ঠস্বর: 'আমি ত আপনাদের কাছে সর্বদাই আছি।' আর ওঁর মৃদু মধুর কণ্ঠের 'গোপাল গোবিন্দ নাম'।

গোপাল গোবিন্দ নাম
মধুর মধুর স্বরে
লইলে নিয়ত অন্তরে অন্তরে
(সর্ব) পাপ তাপ হরে।

স্বামী বিবেকানন্দ

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন পাশ্চাত্ত্যের জড় বিজ্ঞানের প্রভাবে ভারতের আধ্যাত্মিক আকাশ তমসাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিল, পাশ্চাত্ত্য ভাবের বন্যা বঙ্গভূমি হতে প্রবাহিত হয়ে সমগ্র ভারত-ভূমিকে প্লাবিত করে তুলেছিল, তরুণ বঙ্গ স্বজাতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে অনুকরণপ্রিয় কৃত্রিম ও বিস্মৃতিশীল হয়ে পড়েছিল, ঠিক সেই সময়ই যেন ভারতের ছায়াচ্ছন্ন তপোবন হতে এক তরুণ তেজোদীপ্ত সন্ন্যাসীর উদাত্ত কণ্ঠে ধ্বনিত হলো উপনিষদের সেই বাণী—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। (ওঠো জাগো, শ্রেষ্ঠ আচার্যগণের কাছে তত্ত্ব অবগত হও।) আত্মাতে জাগ্রত হয়ে ওঠো। সত্যে বিশ্বাসী হতে সাহসী হও। সত্যের অভ্যাসে সাহসী হও। নব্য বঙ্গের মোহনিদ্রা ভঙ্গ করে আত্মবিস্মৃত জাতিকে উদ্বুদ্ধ করে বললেন, 'হে বীর, সাহস অবলম্বন কর। সদর্পে বল, আমি ভারতবাসী। ভারতবাসী আমার ভাই। বল মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই। তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেব-দেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী, বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বল দিনরাত, হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে আমায় মনুষ্যত্ব দাও, মা, আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।'

সেই নবীন সন্ন্যাসী বিশাল উদারতা নিয়ে ভগবান মানুষ ও দেশকে এক করে দেখলেন। ভগবানকে প্রত্যক্ষ করে ভগবানের

সত্তা মানুষের মধ্যে ও বিশ্বের সর্বত্র অনুভব করলেন। বিশ্ববাসীকে সম্বোধন করে বললেন, তুমিই তিনি। তুমিই জগতের ঈশ্বর—'তত্ত্বমসি'। তুমি শুদ্ধ স্বরূপ নিত্যানন্দময়। তোমরা পাপী নয়, দুর্বল নয়। তোমরা সকলেই ঈশ্বর। তোমাকে কিসে দুর্বল করিতে পারে? কিসে তোমাকে ভীত করিতে পারে? একমাত্র তুমিই জগতে বিরাজ করিতেছ। কিসে তোমায় ভয় দেখাইতে পারে? অতএব উঠ, মুক্ত হও। জানিয়া রাখ যে কোন চিন্তা বা বাক্য আমাদিগকে দুর্বল করে তাহাই একমাত্র অশুভ। যাহাই মানুষকে দুর্বল করে, যাহাই তাহাকে ভীত করে তাহাই একমাত্র অশুভ, তাহারই পরিহার করিতে হইবে। অচলবৎ দণ্ডায়মান হও, তুমি অবিনাশী। তুমি জগতের আত্মা ঈশ্বর। 'শিবোহহং শিবোহহং' বল, আমি পূর্ণ সচ্চিদানন্দ, যেমন সিংহ লতাপাতা নির্মিত ক্ষুদ্র খাঁচা ভঙ্গ করিয়া ফেলে. সেইরূপ এই বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেল ও অনন্তকালের জন্য মুক্ত হও। কিসে তোমাকে ভয় দেখাইতে পারে? কিসে তোমাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে? কেবল অজ্ঞান, কেবল ভ্রম। তাইতো ঈশ্বব না দেখিয়া মানুষ দেখিতেছ। তিনিই তুমি। আর সমুদায় জীবন ঐ ছাচে গঠন কর। যে ব্যক্তি এই তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া তাহার সমুদয় জীবন এই ভাবে গঠন করে, সে আর কখনও অন্ধকারে ভ্রমণ করিবে না।'

সেদিন শুধুমাত্র বঙ্গভূমি আর ভারতবর্ষ নয়, সমগ্র বিশ্ববাসী মুগ্ধ চিত্তে শ্রবণ করেছিল সেই তেজস্বী তরুণ সন্ন্যাসীর শাশ্বত বাণী আর লাভ করেছিল অনুপ্রেরণা। পথভ্রান্ত মানুষ আলোকময় পথের পেয়েছিল সন্ধান। ভারতের নবজাগরণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পথিকৃৎ সেই তেজোদীপ্ত তরুণ সন্ন্যাসীই হলেন বিশ্ববিশ্রুত যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ।

ইংরাজী ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী সোমবার। বাংলা ১২৬৯ সালের পৌষ সংক্রান্তির দিনে কৃষ্ণাসপ্তমী তিথিতে প্রত্যূষে এই মহাপুরুষ আবির্ভূত হলেন। বাংলার মাটিতে। কলকাতা

শহরে। কলকাতার বিখ্যাত কায়স্থ বংশে, সিমলা পল্লীর দত্ত বাড়ীতে।

পিতা বিশ্বনাথ দত্ত ছিলেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ এটর্নি। উন্নত চরিত্র ও উদার হৃদয়সম্পন্ন পুরুষ। পরদুঃখকাতরতার জন্যই তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন কিন্তু সঞ্চয় করতে পারেন নি। আত্মীয়স্বজনকে পোষণ ছাড়াও বহু দুঃস্থ পরিবারকে অর্থ সাহায্য করতেন। তাঁর কাছে হাত পেতে কেউ বিমুখ হয় নি কখনও। মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী ছিলেন তেজস্বিনী, পরম নিষ্ঠাবতী ও ধর্মপ্রাণা রমণী। সর্বসুখের নিকেতনে বাস করেও মনের শান্তি হারিয়েছিলেন ভুবনেশ্বরী দেবী। চার কন্যার জননী হয়েছেন কিন্তু পুত্রমুখ দেখলেন না তখনও। শিবের পূজা করেন আর পুত্রলাভের প্রার্থনা জানান। অবশেষে কাশীর একজন আত্মীয়াকে নিযুক্ত করলেন পুত্র কামনায় বীরেশ্বর বিশ্বনাথের নিত্য পূজা দেওয়ার জন্য। বীরেশ্বর মুখ তুলে চাইলেন।. অনিন্দ্যসুন্দর শিশুর রূপ ধরে স্বপ্নে দেখা দিলেন। ভুবনেশ্বরী আনন্দবিহ্বল হলেন। মনোবাসনা পূর্ণ হলো। পুত্রসন্তান লাভ করলেন।

বীরেশ্বর শিবের পূজা দিয়ে পুত্র লাভ করেছেন, তাইতো পুত্রের নাম রাখলেন বীরেশ্বর। বাপ-মায়ে আদর করে ডাকেন—'বিলে' বলে। দিনে দিনে শিশু বড় হয়ে ওঠে। গৌরকান্তি, পদ্মপলাশ লোচন, মায়ের কোল আলো করা ছেলে। পাড়া-প্রতিবেশী যে দেখে সেই মুগ্ধ হয়। অন্নপ্রাশনের সময় নামকরণ হলো নরেন্দ্রনাথ। নরেন—নরেন্দ্র—নরেন্দ্রনাথ।

সকলেরই চোখের মণি বিলে বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মহা দুরন্ত হয়ে উঠলো। ধাত্রী তো হিমসিম খেয়ে যায় চপলমতি শিশুকে সামলাতে। আর দিদিরা অতিষ্ঠ হয়ে যায় তার দুষ্টুমিতে।

শৈশবের সেই দিনগুলিরও একদিন হলো অবসান। এলো বাল্যকাল। বাড়ীতেই পাঠশালা। শুরু হলো বাল্যের পাঠ। অসাধারণ মেধা ও স্মৃতিশক্তির পরিচয় দিলো ছোট্ট বিলে। নিজে

শুয়ে থেকে গৃহশিক্ষককে বললো, আপনি পড়ে যান, আমি শুনি। একবার শুনেই তার পাঠ আয়ত্ত হয়ে যেতো। আর মায়ের কোলে শুয়ে শুয়ে মায়ের মুখ থেকে রামায়ণ মহাভারত পাঠ শুনে মুখস্থ হয়ে গেল রামায়ণ মহাভারত। বিস্মিত হলেন গৃহশিক্ষক আর আশ্চর্যান্বিত হলেন পিতামাতা।

যেমন পড়াশুনায় তেমনিই খেলাধূলায়ও ছিল মহা উৎসাহ। বাল্যের রাজা রাজা খেলায় বন্ধুদের মধ্যে রাজার আসন গ্রহণ করতো বালক নরেন। আর বন্ধুরা হতো কেউ মন্ত্রী, কেউ কোটাল। রাজার আদেশ অমান্য করা দুঃসাধ্য ছিল। হয়তো কোন দস্যুর ফাঁসীর হুকুম হয়েছে। দস্যু তো হুকুম শুনেই লম্বা দৌড়। তাতেও নিস্তার নেই। সিপাহীর দল ছুটলো তার পিছনে রাজার হুকুম তামিল করবার জন্য। আর সেই কলকোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠলো দত্তবাড়ীর প্রাঙ্গণ।

আর একটা প্রিয় খেলা ছিল 'ধ্যান' 'ধ্যান' খেলা। বন্ধুদের কাছে সেটা নিছক খেলা। কিন্তু বিলের কাছে ছিল সেটা সত্যিকার ধ্যান-তন্ময়তা। ঐ অবস্থায় একবার এক গোখরো সাপ ঘরে ঢুকে পড়ে। সকলেই পালিয়েছে। কিন্তু বিলে তখনও ধ্যানস্থ। গোখরো সাপ অবশ্য বালক নরেনের কোন অনিষ্ট করে নি।

এটর্নি বিশ্বনাথ দত্ত নিজের জুড়ি গাড়ি করে কোর্টে যেতেন। কোচোয়ানের সঙ্গে বিলের ছিল খুব ভাব। আর ঐ কোচোয়ান ছিল বিলের আদর্শ। কারণ অমন দুটো তেজী ঘোড়ার সে নিয়ন্তা। পিতা একদিন জিজ্ঞেস করলেন পুত্রকে,—হ্যাঁরে বিলে, বড় হয়ে তুই কি হবি রে? নিঃসঙ্কোচে উত্তর দিয়েছিল,—কোচোয়ান হবো, বাবা!

বিশ্বনাথ দত্তের বৈঠকখানায় ছিল অনেকগুলি হুঁকো। কোনটাতে ব্রাহ্মণ তামাক খাবেন, কোনটাতে কায়স্থ, কোনটাতে শূদ্র। চিহ্ন দেওয়া থাকতো। তখনকার সমাজ প্রথাই ছিল এই রকম। নইলে জাত যাবে যে! এই জাত যাওয়ার ব্যাপারটা বালক নরেন্দ্র কিছুতেই বুঝতে পারছিলেন না। তাইতো একদিন কৌতুহলী

হয়ে ঘরে যখন কেউ ছিল না, একটার পর একটা হুঁকোতে টান দিয়ে যেতে লাগলেন। অকস্মাৎ ধরা পড়লেন পিতার হাতে। পিতা বিশ্বনাথও বিস্মিত হয়ে পুত্রের কাণ্ড দেখে গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করলেন,—ও কি হচ্ছিলো রে? নির্ভয়ে বলল বালক নরেন্দ্রনাথ,—দেখছিলাম জাত যায় কিনা।

লোকের দুঃখদুর্দশা দেখলে বালক নরেন কিছুতেই পারতো না স্থির থাকতে। হাতের কাছে মূল্যবান জিনিস পেলেও দান করে দিতো। সাধু সন্ন্যাসীর উপরও শ্রদ্ধা ছিল অসীম। একবার নূতন কাপড় পরে সগর্বে সকলকে দেখাচ্ছে এমন সময় 'নারায়ণ' 'নারায়ণ' বলে এক সন্ন্যাসীঠাকুর এসে হাজির। তাঁর কাপড়ের প্রয়োজন আছে শুনেই কাপড়খানি খুলে দিয়ে দিলো সাধুকে। সন্ন্যাসীঠাকুর তো হাসতে হাসতে ছোট্ট কাপড়খানি গ্রহণ করলেন আর প্রাণভরে করলেন আশীর্বাদ। বালক নরেনের হৃদয়াবেগ দেখে বিস্মিত হলেন আত্মীয়স্বজনেরা আর আশ্চর্যান্বিত হলেন পিতামাতা।

পিতামাতার শিক্ষাপ্রণালীও ছিল অভিনব। তাঁরা জানতেন বালক নরেন নির্ভীক ও স্বাধীনতাপ্রিয় কিন্তু তার মধ্যে যাতে কোন রকম সংকীর্ণতা নীচতা প্রবেশ না করে সেদিকে ছিল উভয়েরই সজাগ দৃষ্টি। একদিন বিলে হঠাৎ রেগে গিয়ে মায়ের সঙ্গে অসংযত ভাষায় কথা বলে। পিতা সবকিছু শুনে, বিলের ঘরের দরজার সামনে লিখে রাখলেন, 'নরেনবাবু আজ তাঁর মাকে এই সব কথা বলেছেন .. . .।' বন্ধুরা এলেই যাতে দেখতে পায়। ব্যস্, এতেই যথেষ্ট। আর কোনদিন নরেন তার মায়ের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করে নি। মাতা ভুবনেশ্বরী দেবীও ছিলেন তেজস্বী রমণী, তাইতো উপদেশচ্ছলে একদিন পুত্রকে বললেন, 'যা সত্য বলে জানবে তাই করে যাবে। এ জন্য কষ্ট সহ্য করতে হয় করবে। কিন্তু সত্যকে ছাড়বে না। সত্যকে আশ্রয় করেই জীবন পথে অগ্রসর হবে।'

বাল্যকালে জননী ভুবনেশ্বরী দেবী বালক নরেনের অন্তরে সত্য-সাধনার বীজ বপন করে ভবিষ্যৎ সাধনার জীবনে অনেকখানি

প্রভাবিত করেছিলেন।

বাল্যে কৈশোরে শুধুমাত্র পড়াশুনার মধ্যেই আবদ্ধ ছিলেন না নরেন্দ্রনাথ। খেলাধূলা, শরীরচর্চা, সঙ্গীতবিদ্যাদিতেও পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন। আর লোকহিতৈষণা ও বন্ধুপ্রীতি ছিল তাঁর সহজাত সংস্কার। এক উচ্ছল প্রাণচাঞ্চল্যময় সিংহপুরুষ যেন। তাইতো উত্তরকালে শিক্ষার প্রণালী সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'শবীর মন ও হৃদয় তিনের যথাযথ বিকাশ সাধনই শিক্ষার উদ্দেশ্য। শুধু বই মুখস্ত করে বেশী নম্বর পেলেই এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। যে শিক্ষা মানুষকে আশিষ্ঠ বলিষ্ঠ দ্রঢ়িষ্ঠ করে, মানুযেব অন্তর্নিহিত পূর্ণত্বকে বিকশিত করে তাই সুশিক্ষা।'

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে এণ্ট্রান্স পাস করে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হলেন। সেখানে এক বৎসব পড়ে, জেনাবেল এসেম্‌ব্লিজ ইন্‌স্টিটিউ-শনে অধ্যয়ন শুরু করলেন। বর্তমানের স্কটিশ চার্চ কলেজ। এইখানেই তাঁর স্বাধীন চিন্তার পূর্ণ উন্মেষ হয়। এই সময়েই নরেন্দ্রনাথ ইতিহাস, দর্শন ও সাহিত্য সম্বন্ধে বিস্তব গ্রন্থ পড়ে সুপণ্ডিত হয়ে ওঠেন। পাশ্চাত্ত্য দর্শন পড়ে তিনি যুক্তিবাদী অজ্ঞেয়বাদী হয়ে পড়েন। আর ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি হন আকৃষ্ট। সে যুগেব প্রগতিশীল সংস্থা ছিল ব্রাহ্ম সমাজ। স্ত্রী শিক্ষার প্রসার ও জাতিভেদ প্রথার উচ্ছেদেব প্রচেষ্টা নব্য তরুণদের মনকে আকৃষ্ট করেছিল। অতীত যুগের কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে তরুণ বঙ্গের মনকে নবীন আদর্শের চেতনায় করেছিল উদ্বুদ্ধ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কেশবচন্দ্র সেন ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য হয়েছিলেন নরেন্দ্রনাথ আর পাশ্চাত্ত্য দর্শনের প্রভাব ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁর মনে দিয়েছিল সংশয়ের দোলা। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে একদিন প্রতিবেশী সুরেন্দ্রনাথ মিত্র এসে ধরলেন নরেন্দ্রনাথকে তাঁর বাড়ীতে গান গাইতে হবে। ছোটখাট উৎসবের আয়োজন হয়েছে। দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আসবেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে

নরেন্দ্রনাথের এই প্রথম সাক্ষাৎ। প্রথম দর্শনেই শ্রীরামকৃষ্ণ তরুণ নরেনের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। নরেন্দ্রনাথের সুন্দর দেহ সৌষ্ঠব পদ্মপলাশ নেত্র, নির্ভীক কথাবার্তা আর মধুর কণ্ঠের ভাবপূর্ণ ভজন শুনে মুগ্ধ ও অভিভূত হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। আর বার বার করে আমন্ত্রণ জানালেন দক্ষিণেশ্বরে যাবার জন্য।

অবশেষে সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গেই একদিন দক্ষিণেশ্বরে এসে উপস্থিত হলেন নরেন্দ্রনাথ। ঠাকুর খুবই আনন্দিত হলেন। সরল বালকের মত আব্দারের সুরে একখানি গান গাইতে অনুরোধ করলেন। নরেন্দ্রনাথও মনপ্রাণ ঢেলে পর পর দুখানি গান করলেন।

মন চল নিজ নিকেতনে সংসার বিদেশে
বিদেশীর বেশে ভ্রম কেন অকারণে।..

গান শুনেই ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হলেন। তারপর ভাবানন্দে বিভোর হয়ে নরেন্দ্রের হাত ধরে পাশের নির্জন বারান্দায় গেলেন। অশ্রুসজল চোখে বললেন, এতদিন পরে আসতে হয়? আমি যে তোর পথ চেয়ে বসে আছি!

পরমুহূর্তেই আবার করজোড়ে বললেন, 'জানি প্রভু তুমি সেই পুরাতন ঋষি। নররূপী নারায়ণ। জীবের দুর্গতি নিবারণ করতে শরীর ধারণ করেছো।'

ইংরাজী শিক্ষিত তরুণ নরেন্দ্রনাথ, ঠাকুরের সরল স্নেহপূর্ণ ব্যবহারে মুগ্ধ হলেন সত্য কিন্তু মনে মনে ভাবলেন—ইনি একজন বদ্ধ পাগল। নইলে এমন কথা কেউ কাউকে বলে। পরে আবার ভক্তবৃন্দের সামনে এসে ঠাকুর বিপরীত আচরণ করলেন। ভগবৎ প্রসঙ্গ সম্বন্ধে প্রকৃতিস্থ মানুষের মতই আলোচনা করতে লাগলেন। বিস্মিত হলেন নরেন্দ্রনাথ। সংশয়ের দোলা লাগলো মনে। যুক্তিবাদী নরেন্দ্রনাথ স্থির সিদ্ধান্তে এলেন, জ্বলন্ত ত্যাগ ও পবিত্রতার জন্যই অর্ধোন্মাদ অবস্থা। তখনও শ্রীরামকৃষ্ণকে যোগসিদ্ধ শক্তিধর মহাপুরুষরূপে গ্রহণ করতে নরেন্দ্রনাথের মন প্রস্তুত হয় নি। কিন্তু মনে মনে অজানা এক মধুর আকর্ষণ অনুভব করতে লাগলেন।

আবার একদিন এলেন দক্ষিণেশ্বরে একাকী। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ঘরে ছোট খাটটিতে বসে নরেন্দ্রনাথকে পাশে বসালেন। ভাবানন্দে বিভোর হয়ে অকস্মাৎ তাঁর দক্ষিণ পা দিয়ে নরেন্দ্রনাথকে ছুঁতেই, কি যেন হয়ে গেল ইংরাজী শিক্ষিত তেজস্বী তরুণ নরেন্দ্রের। মনোজগতে তুমুল আলোড়নের হলো সৃষ্টি। সবকিছুই যেন এলোমেলো হয়ে গেল। মনে হলো এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রচণ্ড বেগে ঘুরছে। ঘুরতে ঘুরতে শেষ হয়ে যাবে আকাশে, অস্তিত্ব বুঝি এখনই লোপ পাবে। ভয়ে বিস্ময়ে চীৎকার করে উঠলেন, 'ওগো, তুমি আমার একি করলে, আমার যে বাবা মা আছেন।'

মৃদু মৃদু হেসে হেসে রামকৃষ্ণ তরুণ নরেন্দ্রনাথের বুকে হাত বুলিয়ে দিয়ে সুস্থ করে তুললেন।

তৃতীয় সাক্ষাৎকার হলো যদু মল্লিকের বাগানে। বৈঠকখানায় কেউ নেই। বাগানে বেড়াচ্ছেন শুধু শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্রনাথ। সজাগ ও সচেতন থাকা সত্ত্বেও শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য স্পর্শে নরেন্দ্রনাথ এবারেও চেতনা হারালেন। জ্ঞান হলে দেখলেন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর বুকে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যস্পর্শে ইংরাজী শিক্ষিত অজ্ঞেয়বাদী নরেন্দ্রনাথের মনের সংশয়ের আবরণ ধীরে ধীরে হতে লাগলো অপসারিত। শ্রীরামকৃষ্ণের একমাত্র লক্ষ্য হলো নরেন্দ্রনাথকে তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন করে দেওয়া এবং শক্তি সঞ্চার করে লোকশিক্ষা ও সেবাধর্মে উদ্বুদ্ধ করা।

আর নরেন্দ্রনাথও নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে সনাতন হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রকৃত স্বরূপ অবগত হওয়ার জন্য সচেষ্ট হলেন। ঠাকুরও অসীম ধৈর্য নিয়ে নরেন্দ্রনাথের সেই সন্দেহ দূর করবার জন্য নানা পরীক্ষার হলেন সম্মুখীন।

এইভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে এসে তরুণ নরেন্দ্রনাথের মন আধ্যাত্মিক রসে হয়ে উঠলো সিক্ত। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষা ও

ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শ লাভ করে, তাঁর মন তখন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার মধ্যে দোদুল্যমান। অন্তর্জীবনের গতিও বিক্ষিপ্ত। মানসিক জগতের এই সঙ্কট-সন্ধিক্ষণে সত্যলাভের আকাঙ্ক্ষা নরেন্দ্রনাথের মনে তীব্র হতে তীব্রতর হয়ে উঠলো। সত্যানুসন্ধানী নরেন্দ্রনাথের মন, প্রকৃতই ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে কিনা, এই প্রশ্নেই ব্যাকুল হয়ে উঠলো। অনুভব করেন, তাঁর অন্তরের গভীরে যেন এক আকুলতার পদ্মকোরক আলোকের স্পর্শলাভের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছে। তারপর অপ্রত্যাশিতভাবে অকস্মাৎ একদিন ছুটে গেলেন ব্রাহ্মসমাজের গুরু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নিকট। ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি ভগবানকে দর্শন করেছেন?

দেবেন্দ্রনাথ আকস্মিক এমন ধরনের প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। সদুত্তর দিতে পারলেন না। বললেন, ভগবানের ধ্যান কর, তাঁর দর্শন পাবে।

এই পরোক্ষ উত্তরে নরেন্দ্রনাথের মন তৃপ্ত হলো না।

অবশেষে আকুল হয়ে ছুটে এলেন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ সমীপে। সোজা জিজ্ঞেস করলেন, আপনি ভগবানকে দেখেছেন?

তপোবনের সত্যদ্রষ্টা ঋষির মত শ্রীরামকৃষ্ণের মুখ হতে অকুণ্ঠ উত্তর এলো: হ্যাঁ, দেখেছি। তোকে যেমন দেখছি, তার চেয়েও স্পষ্ট। তোকেও দেখাতে পারি।

অব্যক্ত বিস্ময়ে ও ভয়ে অভিভূত হলেন নরেন্দ্রনাথ। শ্রীরামকৃষ্ণের অমিত দৈবশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করলেন যুক্তিবাদী ইংরাজী শিক্ষিত নব্যবঙ্গের প্রতিনিধি তরুণ নরেন্দ্রনাথ। মনের সব দ্বন্দ্ব ও চাঞ্চল্য শান্ত হয়ে গেল। ধীরে ধীরে নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের একান্ত ভক্ত ও অনুরক্ত হয়ে উঠলেন। জানলেন চিনলেন অচিন্ত্য অব্যক্ত পুরুষরূপে শ্রীরামকৃষ্ণকে। অনুভব করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ সাধারণ মানুষ নন—দেব-মানব। যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ। নরেন্দ্রনাথের মনে শক্তি সঞ্চারিত করে পরমভক্তরূপে নরেন্দ্রনাথকে লাভ করে

শ্রীরামকৃষ্ণও পরমানন্দ অনুভব করতে লাগলেন মনে মনে। সেই দিন হতেই শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন গুরু আর শিষ্য হলেন নরেন্দ্রনাথ। অভাবনীয় ভাবে মিলন হলো গুরু আর শিষ্যের। নরেন্দ্রনাথ হলেন শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র।

আর একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তবৃন্দ পরিবৃত হয়ে বৈষ্ণব ধর্মের সারমর্ম বোঝাচ্ছেন সকলকে। উপদেশচ্ছলে বললেন, নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণব পূজন। যেই নাম সেই ঈশ্বর—নাম নামী অভেদ জেনে সর্বদা অনুরাগের সঙ্গে নাম করবে।···কৃষ্ণেরই জগৎ সংসার একথা হৃদয়ে ধারণা করে সর্বজীবে দয়া করবে···। বলতে বলতেই সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। সমাধি ভঙ্গ হলে আবার বলতে লাগলেন, —জীবে দয়া, জীবে দয়া! দূর শালা! কীটানুকীট তুই জীবকে দয়া করবি? দয়া করবার তুই কে? না না, জীবে দয়া নয়—শিবজ্ঞানে জীবের সেবা। এ উক্তির গভীর তাৎপর্য উপলব্ধি করে নরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন,—'কি অদ্ভুত আলোকই আজ ঠাকুরের কথায় দেখতে পেলাম। ঠাকুর আজ ভাবাবেশে যা বললেন, তাতে বোঝা গেল, বনের বেদান্তকে ঘরে আনা যায়। সংসারের সকল কাজে উহাকে অবলম্বন করতে পারা যায়। ভগবান যদি দিন দেন তো আজ যা শুনলাম এই অদ্ভুত সত্য সংসারে সর্বত্র প্রচার করবো —পণ্ডিত মূর্খ ধনী দরিদ্র ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সকলকে শুনিয়ে মোহিত করবো।'

সত্য সত্যই এদিন শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথের মনোজগতে সেবা-ধর্মের যে বীজ রোপণ করেছিলেন সেই বীজ অঙ্কুরিত হয়ে ধীরে ধীরে বিশাল মহীরুহে হয়েছিল পরিণত।

ভগবান ও মানুষকে এক করে দেখবার সূত্র পেয়েছিলেন আর ভবিষ্যৎ জীবনে রামকৃষ্ণ মিশনের মত বিরাট সেবা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবার অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন সেদিনের সেই তরুণ নরেন্দ্রনাথ।

নরেন্দ্রনাথের জীবনধারায় এলো আমূল পরিবর্তন। সর্বপ্রকার

বিলাসিতা ত্যাগ করে ব্রহ্মচারীর আদর্শে চলতে আরম্ভ করলেন। পড়াশুনা আর ধ্যান ধারণার মধ্য দিয়ে দিন অতিবাহিত হতে লাগলো। তারপর বি. এ. পরীক্ষাও দিলেন, কিন্তু পরীক্ষার ফল বেরুবার পূর্বেই অকস্মাৎ পিতৃদেব দেহলীলা সংবরণ করলেন। হঠাৎ যেন বজ্রাঘাত হলো দত্ত পরিবারের উপর। বিশ্বনাথ কিছুই রেখে যান নি। অপর্যাপ্ত অর্থ উপার্জন করা সত্ত্বেও সঞ্চয় করতে পারেন নি। যত আয় করেছেন ততোধিক করেছেন ব্যয়। রেখে গেলেন কয়েকটি নাবালক সন্তান আর অজস্র দেনা। তারপর বিশ্বনাথের অন্নে যাঁরা এতদিন প্রতিপালিত হয়েছিলেন তাঁরাও সরে দাঁড়ালেন। নরেন্দ্রনাথ জ্যেষ্ঠ পুত্র, তাঁর উপরই সংসারের দায়িত্ব পড়লো। সংসারের গতিও দিনের পর দিন নিম্নগামী হতে লাগলো। এদিকে আবার পারিবারিক মামলায় সর্বস্বান্ত হয়ে গেলেন।

বিচলিত হয়ে ছুটে গেলেন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট। রামকৃষ্ণ আবেগভরে নরেন্দ্রনাথকে জড়িয়ে ধরলেন। নয়নে নয়নে অঝোরে ঝরতে লাগলো অশ্রুধারা। তারপর বললেন, 'আমি তো মার কাছে কিছুই চাই না। তাছাড়া তুই-ই তো মাকে মানিস না।' নরেন্দ্রনাথও ছাড়বার পাত্র নন। অবশেষে ঠাকুর বললেন,— 'আচ্ছা যা, আজ মঙ্গলবার। রাত্রিতে মন্দিরে গিয়ে মাকে প্রণাম করে যা চাইবি তাই পাবি।'

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে এই প্রথম মা কালীকে ভক্তিভরে প্রণাম করলেন নরেন্দ্রনাথ। মন্দির প্রাঙ্গণ নীরব নিস্তব্ধ। শুধু কানে ভেসে আসে পুণ্যসলিলা গঙ্গার জল-কলরোল। অপূর্ব মোহনীয় রাত্রির সেই পরিবেশে, নবীন তেজোদীপ্ত যুবক দিব্য ভাবে হলেন বিভোর। পাষাণময়ী প্রতিমাকে প্রাণময়ী মূর্তিতে দর্শন করে মুগ্ধ বিস্মিত ও অভিভূত হলেন। ভুলে গেলেন অর্থচিন্তা। সংসারের দুঃখদুর্দশার কথা, করজোড়ে প্রার্থনা করলেন, মা, জ্ঞান ভক্তি বিবেক বৈরাগ্য দাও। তারপর নিস্পৃহ হৃদয়ে ঠাকুরের কাছে ফিরে এলেন।

উদ্বিগ্ন হৃদয়ে ঠাকুর অপেক্ষা করছিলেন, জিজ্ঞেস করলেন,—হ্যাঁরে, মাকে ভালো করে বলেছিস তো ?

নরেন্দ্রনাথ লজ্জিত হয়ে অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে রইলেন। ঠাকুর সবকিছু বুঝে মৃদু হেসে আবার পাঠালেন মায়ের কাছে নরেন্দ্রকে সংসারের অভাব দারিদ্র্য দূর করবার প্রার্থনা জানাতে।

কিন্তু মন্দিরে এসে মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে নরেন্দ্রনাথ আবার সব ভুলে গেলেন। অন্তরে অন্তরে প্রবাহিত হয়ে চললো অনির্বচনীয় ভাব-হিল্লোল। পাষাণময়ী রূপে প্রতিমাকে দেখতে পেলেন না। দেখলেন মায়ের জীবন্ত মূর্তি। চৈতন্যময়ী ভবতারিণী। আরও দেখলেন মায়ের নয়নে অপার করুণামাখা দৃষ্টি। অধরে দিব্য হাসি। অভিভূত হয়ে প্রাণভরে প্রণাম করে প্রার্থনা জানালেন, শুদ্ধা ভক্তির আর বিবেক বৈরাগ্যের। বার বার তিনবার। তিনবারই ঐ একই প্রার্থনা জানালেন মাকে নরেন্দ্রনাথ।

শ্রীরামকৃষ্ণ সবকিছুই হৃদয়ঙ্গম করলেন আর মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। তারপর বললেন, আচ্ছা যা, তোদের সংসারে আর মোটা ভাত কাপড়ের অভাব হবে না।

দিব্য ভাবে বিভোর হয়ে নরেন্দ্র ফিরে এলেন গৃহে।

অবশেষে সংসার চালানোর মত সামান্য আয়ের ব্যবস্থা হলো। বি-এলও পড়ছেন। কিন্তু স্থায়ী কোন চাকরী জুটলো না। দিনে দিনে সংসারের প্রতি বীতস্পৃহ হয়ে উঠলেন নরেন্দ্রনাথ। অনুভব করলেন, ঘর সংসার করা তাঁর দ্বারা সম্ভব নয়। আকুল প্রাণে আবার একদিন ছুটে এলেন দক্ষিণেশ্বরে। গৃহত্যাগের সংকল্প নিবেদন করলেন রামকৃষ্ণ-চরণে। শ্রীরামকৃষ্ণ সস্নেহে বললেন,—জানি আমি, তুমি মায়ের কাজের জন্যই এসেছো। সংসার তোমার জন্য নয়। তবুও আমি যতদিন আছি আমার জন্য থাকো।

রামকৃষ্ণ অন্যান্য ভক্তদের নরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলতেন,—জাতপুরুষ, এত ভক্ত আসছে কিন্তু ওর মতো একটিও না। কেশবের যদি একটা শক্তি থাকে, তবে নরেনের তেমন আঠারোটা শক্তি আছে।

আবার সেই দক্ষিণেশ্বরের আনন্দপূর্ণ দিনগুলিরও হলো অবসান। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গলায় কঠিন ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হলেন। চিকিৎসার সুবিধার জন্য প্রথমে কলকাতায় শ্যামপুকুরে ও পরে কাশীপুরের উদ্যানবাটীতে এনে রাখা হলো। এই কাশীপুরই শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তলীলাক্ষেত্র। ব্রহ্মচারী যুবক ভক্তবৃন্দ দিবারাত্র পরিশ্রম করে সেবাশুশ্রূষা করতে লাগলেন ঠাকুরের। এইখানেই একদিন ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন নরেন্দ্রনাথকে,—তুই কি চাস?

—নির্বিকল্প সমাধির আনন্দে ডুবে থাকতে চাই।

—ছিঃ ছিঃ, তোর মুখে একথা শোভা পায় না। কোথায় ভেবেছিলাম তুই বিরাট বটগাছের মত বহু লোককে আশ্রয় দিবি, তা নয়, তুই শুধু নিজের সুখটুকু নিয়ে থাকতে চাস? বললেন রামকৃষ্ণ।

নরেন্দ্রনাথ লজ্জিত হয়ে নত মস্তকে দাঁড়িয়ে রইলেন। অবশ্য একদিন সত্য সত্যই নির্বিকল্প সমাধি লাভ হলো নরেন্দ্রনাথের। ধর্মজগতের সর্বোচ্চ অনুভূতি। দেহ স্থির। প্রাণস্পন্দন থেমে গেছে। একজন ভক্ত ছুটে এসে রামকৃষ্ণকে বললেন নরেন মারা গেছে। রামকৃষ্ণ মৃদু হেসে বললেন, বেশ হয়েছে। থাক কিছুক্ষণ ঐ ভাবে। এর জন্য আমায় জ্বালাতন করে তুলেছিল।

এইভাবে রামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথের ধর্মজীবনে দিব্যালোক সম্পাত করলেন। সমাধি ভঙ্গ হলে রামকৃষ্ণ বললেন,—কেমন, মা তো আজ তোকে সব দেখিয়ে দিলে। চাবি আমার হাতে রইলো। তোকে অনেক কাজ করতে হবে। (আমার) কাজ শেষ হলে আবার চাবি খুলবো।

আর এই কাশীপুরের উদ্যান বাটীতেই শ্রীরামকৃষ্ণ সমস্ত যুবক ব্রহ্মচারী ভক্তদের সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষিত করে গেরুয়া দিলেন।

ধীরে ধীরে ঠাকুরের গলরোগ ভীষণ ভাব ধারণ করলো। শরীর শীর্ণ হয়ে পড়লো। আহার জল-বার্লি। তাও গিলতে পারেন না। মৃদুস্বরে ফিস্ ফিস্ করে দুই-চারিটি কথা বলেন।

একদিন রাত্রে নরেন্দ্রকে ডেকে সজল নয়নে বললেন, 'আজ তোকে সর্বস্ব দিয়ে ফকীর হলুম।'

নরেন্দ্র এখন কাশীপুরে ঠাকুরের সেবা করেন আর গভীর রাত্রিতে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতে গিয়ে করেন ধ্যান সাধনা। নরেন্দ্র বুঝলেন ঠাকুরের লীলাবসানকাল আসন্ন প্রায়। আকুল হলেন ঠাকুরের জন্য। ভাবাবেগ দমন করতে না পেরে কক্ষ ত্যাগ করলেন।

অবশেষে সত্য সত্যই সে ভীষণ দিন এসে উপস্থিত হলো। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট রবিবার। মহাপুরুষের শয্যা ঘিরে ভক্ত ও শিষ্যবৃন্দ শোকভারাক্রান্ত হৃদয়ে মহাসমাধির প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

হঠাৎ নরেন্দ্রের মনে হলো,—আচ্ছা, রামকৃষ্ণ কি সত্যই ভগবান! রামচন্দ্র, গিরিশ এঁরা তো স্বয়ং ভগবান বলেই মনে করেন। এখন যদি ঠাকুর স্বয়ং এ সমস্যার সমাধান করে দেন তাহলেই বুঝবো সত্যিই ইনি ভগবান, অবতার পুরুষ! অন্তর্যামী শ্রীরামকৃষ্ণ হঠাৎ চোখ মেলে পূর্ণ দৃষ্টিতে নরেন্দ্রের প্রতি চেয়ে বললেন,—কি নরেন, এখনও তোর বিশ্বাস হলো না? যে রাম যে কৃষ্ণ সে-ই এবার একাধারে রামকৃষ্ণ—কিন্তু তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়।

অকস্মাৎ চমকে উঠলেন নরেন্দ্রনাথ। মুগ্ধ বিস্মিত ও অভিভূত হলেন। মনের সংশয় চিরতরে তিরোহিত হলো।

ক্রমে রজনী গভীর হতে গভীরতর হলো। মহান আত্মা মহাকাশে বিলীন হওয়ার জন্য প্রস্তুত হলো। নাসাগ্র নিবদ্ধ, দৃষ্টি স্থির, বদন মৃদুহাস্যে অনুরঞ্জিত। শ্রীরামকৃষ্ণ সুমধুর কণ্ঠে বারত্রয় মাতৃনাম 'কালী কালী কালী' উচ্চারণ করে, জ্যোৎস্নাপ্লাবিত মহানিশায় ধীরে ধীরে মহাসমাধিতে নিমগ্ন হলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর নরেন্দ্রনাথই গুরুভাইদের একত্র করে বরানগরে মঠ প্রতিষ্ঠা করলেন, একটা পোড়ো বাড়ী ভাড়া নিয়ে মঠে শ্রীরামকৃষ্ণের ফটোই মূর্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হলো। গৃহস্থ

ভক্তরা মাঝে মাঝে মঠে এসে দু-চার দিন কাটিয়ে যেতেন। তখন নরেন্দ্রনাথের মনেপ্রাণে তীব্র বৈরাগ্য।

একমাত্র লক্ষ্য কি করে ভগবৎ সান্নিধ্য লাভ হবে। ধ্যান ভজন আর শাস্ত্রালোচনার মধ্য দিয়ে দিন অতিবাহিত হতে লাগলো।

১৮৮৬ থেকে ১৮৯২ সাল পর্যন্ত মঠ বরানগরে ছিল। আর ১৮৯২ থেকে ১৮৯৭ সাল পর্যন্ত ছিল আলমবাজারে, এই মঠজীবন সম্বন্ধে উত্তর কালে নরেন্দ্রনাথ বলেন, 'বরানগরে এমন কতদিন গেছে যে, খাবার কিছুই নেই, জপ ধ্যানের প্রবল তোড়ে আমরা তখন ভাসছি। সে কঠোরতায় ভূত পালিয়ে যেত। মানুষের কথা কি!'

পিতার মৃত্যুর পর তিন বৎসর নরেন্দ্রনাথ সংসারে ছিলেন। যখন বুঝলেন তাকে বাদ দিয়েও সংসার চলবে তখন ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে এলেন। তবে গর্ভধারিণী জননীর প্রতি কর্তব্যচ্যুত হন নি কোনদিন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে এই বরানগর মঠেই যুবক ব্রহ্মচারী ভক্তরা বিরজা হোম করে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন।

অবশেষে শুরু হলো নরেন্দ্রনাথের পরিব্রাজক জীবন। সমস্ত ভারতভূমি পরিক্রমা মানসে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের একদিন অপ্রত্যাশিত ভাবে বেরিয়ে পড়লেন। একাকী। কপর্দকহীন অবস্থা। সম্বলের মধ্যে গেরুয়া বসন, একখণ্ড গীতা আর দণ্ড কমণ্ডুল। প্রব্রজ্যার পথে প্রথম এসে উপস্থিত হলেন কাশীধামে। এই কাশীধামেরই এক নির্জন পথে একদল বানর স্বামীজীকে তাড়া করলো। ভয় পেয়ে স্বামীজী দৌড়তে লাগলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে বানরের সংখ্যাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলো। সেই অসংখ্য বানরের হাতে জীবন হানির সম্ভাবনা দেখে, একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী চীৎকার করে বললেন, 'বৎস, থাম থাম, বানরদের সামনে রুখে দাঁড়াও।' স্বামীজী এবারে সাহস ফিরে পেলেন। বানরদের সামনে রুখে দাঁড়ালেন। স্বামীজী একাকী আর বানরের দল অগণিত। স্বামীজীকে তেজোদীপ্ত ভাবে রুখে দাঁড়াতে দেখে বানরেরা কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েই পেছন ফিরে পালালো। এই ঘটনা থেকে স্বামীজী জীবনে অভূতপূর্ব এক

শিক্ষালাভ করলেন। এবং উত্তরকালে আমেরিকায় একটি ভাষণে বলেছিলেন, 'প্রকৃতি মায়া অবিদ্যা প্রভৃতির মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াতে হয়। ভয় পেয়ে কাপুরুষের মত পালালে চলবে না।'

কাশীধামে ত্রৈলঙ্গ স্বামী ও ভাস্করানন্দ সরস্বতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, গৌতমবুদ্ধের সাধনভূমি সারনাথের পথে যাত্রা করলেন। সারনাথ থেকে আবার ফিরে এলেন বারাণসী ধামে। উত্তর ভারতের আরও বিভিন্ন তীর্থভূমি পরিভ্রমণ করে এসে উপস্থিত হলেন শ্রীধাম বৃন্দাবনে। বৃন্দাবনের রাধাকুণ্ডে এক অলৌকিক ব্যাপার ঘটলো। একখানি মাত্র কৌপীন। রাধাকুণ্ডের জলে ধুয়ে কৌপীনখানি শুকোতে দিয়ে, নগ্ন দেহেই স্নান করছেন। অকস্মাৎ এক বানর এসে কৌপীনখানি নিয়ে গাছের ডালে উঠে বসে রইলো। অনেক চেষ্টার পর শতছিন্ন অবস্থায় কৌপীনখানি ফেরৎ পেলেন। ক্ষুব্ধ হলেন স্বামীজী। শ্রীরাধারাণীর উপর। মনে মনে স্থির করলেন আর লোকালয়ে যাবেন না। জঙ্গলেই থাকবেন। দেখি ভক্তের জন্য ভগবান কি ব্যবস্থা করেন। তারপর জঙ্গলের পথ ধরলেন। অভাবনীয় ব্যাপার। অপ্রত্যাশিত ভাবে একটি লোক ছুটতে ছুটতে এসে স্বামীজীর চরণে আত্মসমর্পণ করলো। তারপর একান্তভাবে অনুনয় বিনয় করে স্বামীজীকে নিয়ে এলো তার গৃহে। পরিতৃপ্ত সহকারে খাইয়ে একখানি নূতন বস্ত্র দান করলো।

স্বামীজী এবারে এসে উপস্থিত হলেন হাতরাসে। হাতরাসের ষ্টেশন মাষ্টার শরৎচন্দ্র গুপ্ত, স্বামীজীকে দর্শন করেই অভিভূত হলেন এবং শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করলেন। গৃহে নিয়ে পরিতৃপ্ত সহকারে খাওয়ালেন। তারপর স্বামীজীর নিকট হতে দীক্ষা গ্রহণের জন্য অনুনয় বিনয় করতে লাগলেন। স্বামীজী তাঁকে নানাভাবে পরীক্ষা করে অবশেষে শিষ্যরূপে গ্রহণ করলেন। ইনিই হলেন গুপ্ত মহারাজ। স্বামী সদানন্দ। স্বামীজীর অনেক সেবা করেছেন। এ যাত্রায় হৃষিকেশ পর্যন্ত গিয়ে অসুস্থতার জন্য স্বামী শিবানন্দ

সহ বরানগর মঠে ফিরে এলেন।

পরে স্বামীজী দেওঘর প্রয়াগ কাশী হয়ে গাজীপুরে এসে উপস্থিত হন। এইখানেই যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ পওহারী বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎলাভ হয় এবং আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। দীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্তও করে ফেলেন। অকস্মাৎ রাত্রিতে স্বপ্নে শ্রীরামকৃষ্ণের করুণামাখা বদনমণ্ডল দর্শন করে পওহারী বাবার প্রভাব হতে মুক্ত হয়ে আবার যাত্রা করলেন সম্মুখের পথে। ইতিমধ্যে সংবাদ পেলেন রামকৃষ্ণের পরমভক্ত সুরেন্দ্র মিত্র ও বলরাম বসু খুবই অসুস্থ। তাইতো আর অগ্রসর না হয়ে মঠে ফিরলেন। দেড় মাসের ব্যবধানে উভয়েই দেহলীলা সংবরণ করলেন।

অবশেষে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে স্বামীজী আবার প্রব্রজ্যার পথে পা বাড়ালেন। আর মঠে ফিরেছিলেন চার বছর পর বিশ্বজয় করে। পরিব্রাজক অবস্থায় পরিচয় গোপন রাখবার জন্য স্বামীজী কখনও বিবিদিষানন্দ কখনো বা সচ্চিদানন্দ নামে পরিচয় দিতেন। আর বিবেকানন্দ নাম গ্রহণ করেন আমেরিকায় যাত্রার অব্যবহিত পূর্বে।

এবারে হিমালয় অভিযানে যাত্রা হলো শুরু। হিমময় হিমালয়ের জন্য ব্যাকুল হলেন স্বামীজী, তিব্বতের অভিমুখে যাত্রা করলেন। যাত্রাসঙ্গী হলেন গুরুভ্রাতা গঙ্গাধর, (স্বামী অখণ্ডানন্দ)। আলমোড়ায় এসে সঙ্গী হলেন স্বামী সারদানন্দ (শরৎ)।

হিমালয়ের লীলা সাঙ্গ করে ফিরে এলেন সমতল ভূমিতে। মীরাটে। তিব্বতে আর যাওয়া হলো না। পথে স্বামী অখণ্ডানন্দ ও নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ধীরে ধীরে অন্যান্য গুরুভ্রাতারাও মীরাটে এসে মিলিত হলেন। আনন্দের হাট বসে গেল মীরাটে। অকস্মাৎ একদিন সে আনন্দের হাটকে ভেঙে দিয়ে স্বামীজী একাকীই বের হয়ে পড়লেন। আলোয়ার জয়পুর হয়ে বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে আবু পাহাড়ে এলেন। এখানেই খেতড়ীর মহারাজা অজিত সিংজী স্বামীজীর তেজোদীপ্ত দেহের

দিকে তাকিয়ে আর তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ বিস্মিত ও অভিভূত হয়ে আত্মসমর্পণ করলেন। মহারাজ নিজ রাজ্যে স্বামীজীকে নিয়ে এসে দীক্ষা নিয়ে গুরু সেবায় হলেন রত। সর্বসুখের আলয়ে বাস করেও মহারাজের মনে শান্তি ছিল না, কোনও পুত্রসন্তান ছিল না বলে। স্বামীজীও মহারাজাকে খুবই স্নেহ করতেন। অবশেষে মহা-রাজের একান্ত অনুরোধে আশীর্বাদ করলেন পুত্রসন্তান লাভ হওয়ার জন্য। সত্যসত্যই দুই বৎসর পর মহারাজা পুত্রসন্তান লাভ করেন। মহারাজা অজিত সিংয়েরই অনুরোধে স্বামীজী 'বিবেকানন্দ' * নাম গ্রহণ করলেন।

আবার যাত্রা হলো শুরু। পথেরও নেই শেষ। চলারও নেই বিরাম। তারপর সমগ্র গুজরাট প্রদেশ পরিভ্রমণ করে মহারাষ্ট্রের পুণাতে এসে উপস্থিত হলেন। এই মহারাষ্ট্র পরিভ্রমণের সময় এক ট্রেনের কামরায় অপ্রত্যাশিত ভাবে পরিচিত হলেন বালগঙ্গাধর তিলকের সঙ্গে।

বালগঙ্গাধর তিলক স্বামীজীর অগাধ পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে সাদরে নিয়ে এলেন নিজ গৃহে। একমাস কাল স্বামীজী বালগঙ্গাধর তিলকের গৃহে অবস্থান করলেন। তারপর ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ-ভারতের পথে যাত্রা করলেন। মহীশূর হয়ে কোচিন, ত্রিবান্দ্রম, মাদুরাকে প্লাবিত করে এসে উপস্থিত হলেন রামেশ্বর সেতুবন্ধে। এলেন কন্যাকুমারীর মন্দিরে। কন্যাকুমারীর মন্দির ঠিক সমুদ্রের উপর। ভারতের শেষ প্রান্তে। সমুদ্রের কোলে শেষ প্রস্তর-

* 'বিবেকানন্দ' নামের ইতিহাস রয়েছে—'ক্ষেত্রী নরেশ ঔর বিবেকানন্দ' হিন্দী গ্রন্থে। লেখক পণ্ডিত ঝাবরমলজী শর্মা। নামকরণের ঘটনাটি প্রত্যক্ষদর্শী মুন্সী জগমোহনলাল লেখককে বলেছেন। স্বামীজী মাদ্রাজে সচ্চিদানন্দ নামে ঘুরেছেন। মাদ্রাজ থিয়োজফিক্যাল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট কর্ণেল অলকট তাঁকে 'সচ্চিদানন্দ' রূপেই জানতেন। স্বামীজীর অন্তরঙ্গ বন্ধু অধ্যাপক আলাসিঙ্গা পেরুমলও তাঁকে 'সচ্চিদানন্দ' রূপেই জানতেন। রাজা অজিৎ সিং প্রদত্ত 'বিবেকানন্দ' নাম তিনি আমেরিকা যাত্রার অব্যবহিত পূর্বেই গ্রহণ করেন।

খণ্ডটির উপর বসে স্বামীজী ধ্যানমগ্ন হলেন। ধ্যাননেত্রে তিনি ভারতমাতার আধ্যাত্মিক ভাবময় এক রূপ নয়নগোচর করে অভিভূত হলেন। সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করে দেখলেন চতুর্দিকে দুঃখ-দারিদ্র্য কুসংস্কার অস্পৃশ্যতা আর অজ্ঞতার করাল ছায়া। আবার সেই পার্থিব জগতের সুখদুঃখকে অতিক্রম করে নয়নগোচর করলেন—ভারতমাতার ঐশ্বর্যময়ী মূর্তি। হাতে তাঁর জ্ঞান আনন্দ ও প্রেমের রত্নভাণ্ডার। সেই আধ্যাত্মিক রত্নভাণ্ডার থেকে অমৃত বিলিয়ে তৃষ্ণার্তের প্রাণ শীতল করছেন। আর ভারতমাতার সন্তানরা অমিত উৎসাহে ভরপূর হয়ে শৌর্যবীর্যে মহান হয়ে জগৎকে শোনাচ্ছে শান্তির বাণী, সমন্বয়ের বাণী। সাম্য ও মৈত্রীর বাণী।

ধ্যান ভঙ্গ হলো। কর্তব্য স্থির হলো। চিকাগো ধর্ম-মহাসভায় যাওয়া স্থির করলেন। সে দিন যে প্রস্তরখণ্ডে বসে স্বামীজী আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষকে নয়নগোচর করে প্রেরণা লাভ করেছিলেন, বিশ্ববাসীকে সাম্য ও মৈত্রীর বাণী শুনিয়ে ভারত-মাতাকে জগজ্জননী রূপে সমগ্র জগতের মানুষের হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন; সেই প্রস্তরখণ্ডটি আজও স্বামীজীর পুণ্যস্মৃতি বহন করে সমাসীন। তারই নাম দিয়েছেন ভক্তরা বিবেকানন্দ রক।

খাণ্ডোয়াতে ও মাদ্রাজে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে চিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদানের প্রয়োজনীয়তা

'রাজা অজিৎ সিংজীনে কহা—মেরী সমঝ সে আপকো যোগ্য নাম হৈ 'বিবেকানন্দ', স্বামীজীনে পরমানুরক্ত রাজাজী কী ইচ্ছাকে অনুসার উস দিনসে আপনা নাম বিবেকানন্দ মানকর উশকা হী ব্যবহার আরম্ভ কর দিয়া।' বিবেকানন্দ নাম ব্যবহার প্রসঙ্গে বলছেন অধ্যাপক আলাসিঙ্গা, 'আমরা যখন স্বামীজীর সঙ্গে বম্বেতে ছিলুম, আমরা বললুম, 'স্বামীজী! আপনি আমেরিকায় যাচ্ছেন. সেখানে সময়ের বড় মূল্য। তাই আপনার ঘড়ি থাকা বড় দরকার। তিনি অবিলম্বে উত্তর দিলেন, 'বেশ ত, আমায় একটা কিনে দাও।

আপনার কতকগুলো ভিজিটিং কার্ড দরকার।

বেশ ত, একশো ছাপিয়ে দাও।

তখন তিনি সচ্চিদানন্দ রূপে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু যখন আমি জিজ্ঞেস করলুম কার্ডের উপর কি নাম দেবো? তিনি বললেন, স্বামী বিবেকানন্দ। এই সময়েই তিনি ঐ নাম গ্রহণ করেছিলেন।'

উপলব্ধি করেন স্বামীজী। স্বামীজীর মনে পাশ্চাত্ত্যে যাবার চিন্তা ওঠে জুনাগড়ে ও পোরবন্দরে। পরে ক্রমশ তা দানা বাঁধতে থাকে। কিন্তু অন্তরের গভীর হতে কোন সাড়া না পাওয়ায় এতদিন চুপচাপ ছিলেন। অবশেষে এক রাত্রে অর্ধজাগ্রত অবস্থায় দেখলেন শ্রীরামকৃষ্ণ সমুদ্রের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন এবং তাঁকে অনুসরণ করতে ইঙ্গিত করছেন। এ দর্শনেব কথা জানিয়ে আর বিদেশযাত্রার অনুমতি চেয়ে পত্র লিখলেন শ্রীশ্রীমাকে (শ্রীসারদাদেবী)। প্রাণভরা আশীর্বাদসহ অনুমতি দিলেন শ্রীমা। কয়েকদিনের মধ্যেই সমুদ্রযাত্রাব ব্যবস্থাও হয়ে গেল। স্বামীজীর আশীর্বাদে পুত্রলাভ করেছেন খেতড়ীর মহারাজা অজিত সিং। তাইতো আমেরিকা যাবার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করলেন মহারাজা অজিত সিং। স্বামীজীও নবজাত শিশুকে আশীর্বাদ কবে বম্বের পথে রওনা হলেন। রাজার দেওয়ান মুন্সী জগমোহন স্বামীজীর সঙ্গে বম্বে পর্যন্ত এসে তাঁকে আমেরিকাগামী 'পেনিনসুলার' জাহাজে দিলেন তুলে। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মে। এই প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষদর্শী অধ্যাপক আলাসিঙ্গা বলেছেন, 'জাহাজের সব শ্বেতাঙ্গ এক টেবিলে বসে ভোজনরত, তার মাঝখানে স্বামীজীকে সুন্দর দেখাচ্ছিল গেরুয়া পরা, মাথায় পাগড়ী।' জগমোহন ভাবছেন স্বামীজী যেন রাজশোভা ধাবণ করে বসেছেন। আহারান্তে পুনরায় ঘন্টা পড়ল। যাঁরা বন্ধুদের বিদায় দিতে এসেছিলেন তাঁরা চলে গেলেন। জগমোহন সকলের শেষে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নামলেন, অমনি জাহাজ খুলে গেল। যাত্রা হলো শুরু।

শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র স্বামী বিবেকানন্দ সমগ্র ভারতবর্ষ পরিক্রমা কবে ভারতের জনমানসের চিত্ত জয় করে, বিশ্ববাসীর হৃদয় জয় করবার মানসে পাশ্চাত্ত্যের পথে করলেন যাত্রা। বিশ্বজননী ভারতমাতাকে বিশ্ববাসীর হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করাই এখন হলো স্বামী বিবেকানন্দের জপতপ ধ্যানধাবণা সাধনা জীবনব্রত। পরিধানে গৈরিক বসন আর অন্তরে সাম্য ও মৈত্রীর বাণী। সেই সনাতন মহান সত্য, সেই প্রাচীন ঋষি দার্শনিকদের চিন্তা, দেবতাদের চিন্তা,

ঈশ্বরের চিন্তা, সত্যদ্রষ্টা দেবমানব শ্রীরামকৃষ্ণের চিন্তাকে মানুষের হৃদয়ের ভাষায় প্রকাশ করবার জন্যই উদগ্রীব হয়ে উঠলেন।

সে সময় খৃষ্টান মিশনারীরা ভারতবর্ষ 'ভারতবাসী আর তাদের ধর্ম চিন্তা ভাবনা দর্শন সম্বন্ধে ইউরোপ ও আমেরিকার অধিবাসীদের অন্তরে বিচিত্র এক ধারণার করেছিলেন সৃষ্টি। ভারতবাসীরা অসভ্য এবং পুতুল পূজা করে। অজ্ঞানের অন্ধকারে নিমজ্জমান। পাশ্চাত্ত্যবাসীদের অন্তরের সে ভ্রান্ত ধারণাকে অপসারিত করে ব্রাহ্ম-সমাজের প্রচারকরা সনাতন ধর্মের মহান সত্যকে তখনও সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন নি। পাশ্চাত্ত্যবাসীদের সম্মুখে ভারতমাতার এই অবমাননা তখনও নব্যশিক্ষিত ভারতসন্তানরা নীরবে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তাইতো বিশ্বধর্মসম্মেলনে হিন্দুধর্মের কোনও প্রতিনিধিকে আহ্বান জানানো হতো না।

বোম্বাই ছেড়ে যাবার পর ভারতবর্ষীয় ইংরেজরা স্বামীজীর প্রতি একটু গম্ভীর ভাব ধারণ করেছিলেন। কিন্তু কলম্বো ও অন্যান্য বন্দর থেকে যে সব ইংরেজ জাহাজে উঠলেন তাঁরা বেশ সহজ সরল ভাবে স্বামীজীর সঙ্গে নানা বিষয়ে কথাবার্তা বলতে লাগলেন। স্বামীজী রাজাসাহেব অজিত সিংকে পত্রে লিখেছিলেন, 'এ সকল ইংরাজ তাজা বিলাতী,এজন্য ইহারা ভারতবাসীকে অবজ্ঞা করে না।' জাহাজ জীবনে আরও মজার ঘটনা—স্বামীজীর পেটের অবস্থা ধীরে ধীরে ভাল হয়ে ওঠে। কারণ পরিব্রাজক কালে স্বামীজীর পেটের অবস্থা খুব খারাপ ছিল। জাহাজে স্বামীজীর প্রথম পরিচিত সহযাত্রী ছিলেন ব্যারিস্টার ছবিলদাস। বোম্বাইতে ওঁর বাড়ীতে ১৮৯২ সালে প্রায় দুইমাস স্বামীজী বাস করেছেন। দ্বিতীয় সহযাত্রী মিঃ সি. লালুভাই। 'লালুভাই বষ্টন পর্যন্ত আমার সঙ্গে ছিলেন। তিনিও আমার প্রতি খুব সহৃদয় ব্যবহার করেছেন,' স্বামীজী বলছেন।

১০ই জুলাই স্বামীজী লিখেছেন, 'নাগাসাকি থেকে কোবি গেলাম। কোবি গিয়ে জাহাজ ছেড়ে দিলাম। স্থলপথে ইয়োকোহামা এলাম জাপানের মধ্যবর্তী প্রদেশ সমূহ দেখবার জন্য।'

জাপান থেকে স্বামীজী খেত্‌রিরাজ অজিত সিংকে কয়েকখানি পত্র লিখেছিলেন তাতে জাপানের শিল্পকার্য ও জাতিগত উন্নতির বিষয়ে ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন।

এবারে স্বামীজী ক্যানেডিয়ান প্যাসেফিক রুটের জাহাজ 'এমপ্রেস অব্‌ ইণ্ডিয়ায়' আরোহণ করে চিকাগোর পথে যাত্রা করলেন। সুপ্রসিদ্ধ জামসেদজী টাটা সেই জাহাজে ছিলেন। স্বামীজী টাটাকে বলেছিলেন, 'জাপান থেকে দেশলাই নিয়ে গিয়ে বিক্রয় করে জাপানকে টাকা দিচ্ছ কেন? তুমি তো সামান্য কিছু দস্তুরি পাও মাত্র। এর চেয়ে দেশে দেশলাইয়ের কারখানা করলে তোমারও লাভ হবে, দশটা লোকেরও প্রতিপালন হবে এবং দেশের টাকা দেশে থাকবে।' পরবর্তীকালে টাটাজী ভারতে দেশলাইয়ের কারখানা করেছিলেন। স্বামীজীর প্রেরণায়।

অবশেষে স্বামীজী যখন বিশ্বজয় করে বিখ্যাত হয়েছিলেন, সে সময়ে জামসেদজী টাটা স্বামীজীকে এক পত্রে লিখেছিলেন, 'আমার বিশ্বাস জাপান হতে চিকাগো যাবার পথে সহযাত্রিরূপে আমাকে আপনার মনে আছে।'

স্বামীজী যখন জাপান ভ্রমণ করছিলেন সে সময় স্বামীজী সম্বন্ধে জাপানের অধিবাসীদের ধারণা প্রসঙ্গে জামসেদজী টাটা বলেছিলেন নিবেদিতাকে।* ১৯০১ সালের লেখা পত্রে নিবেদিতা বলছেন, Mr. Tata told me that when Swamiji was in Japan everyone who saw him was immed iately struck by his likeness to Buddha. অর্থাৎ 'মিঃ টাটা আমাকে বলেছিলেন যে স্বামীজী যখন জাপানে ছিলেন তখন সকলে বুদ্ধের সঙ্গে তাঁর চেহাবাব সাদৃশ্য লক্ষ্য করে সঙ্গে সঙ্গে অভিভূত হয়ে যেত।'

---

* (i) Probuddha Bharata, Nov. 1936.
(ii) বিবেকানন্দ: বম্বে থেকে বস্তুবর—স্বামী চেতনানন্দ, উদ্বোধন, ১৩৮০।
(iii) শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত।

জাহাজ জীবনের আর এক বিচিত্র ঘটনা হলো, স্বামীজী যখন বম্বে ছেড়েছেন' তখন ভারতে গ্রীষ্মকাল সুতরাং শীতবস্ত্র নেননি। তারই ফলে স্বামীজীকে জাহাজে শীতকষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে ২০-৮-৯৩ তাং পত্রে স্বামীজী লিখছেন, -'প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তরাংশ দিয়া আমাকে যাইতে হইয়াছিল। খুব শীত ছিল। গরম কাপড়ের অভাবে বড় কষ্ট পাইতে হইয়াছিল।'

অবশ্য স্বামীজীর সে শীতকষ্ট দেখে অধীর হয়েছিল জাহাজের ক্যাপ্টেনের মন। তিনি নিজের গরম ক্লোক ও অন্যান্য শীতবস্ত্র দিয়ে স্বামীজীর শীতকষ্ট নিবারণের চেষ্টা করেছিলেন।

* * *

আর একটি নূতন দিন আলোকিত হয়ে উঠলো। রাত্রি প্রভাত, নব উষা! ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর। সোমবার। চিকাগো ধর্মমহাসভার অধিবেশন হলো শুরু। আর্ট ইনস্টিউট হলে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের পাঁচ-ছ হাজার মহা মহা পণ্ডিতেরা উপস্থিত। আমেরিকার প্রধান রোমান ক্যাথলিক ধর্মযাজক কার্ডিন্যাল গিবনস একটি গভীর প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা দিয়ে সভার উদ্‌বোধন করলেন। একে একে প্রতিনিধিরা তাঁদের লিখিত ভাষণ পড়ে যেতে লাগলেন। স্বামী বিবেকানন্দ কিছুই লিখে আনেন নি। তারপর পৃথিবীর বিশিষ্ট পণ্ডিতমণ্ডলী ও দার্শনিক পরিবেষ্টিত সভায় বক্তৃতা দেওয়ার সাহসও যেন হারিয়ে ফেললেন। যতবারই সভাপতি ইশারা করেন ততবারই 'এখন নয়' বলে সময় নিয়ে নেন। অবশেষে তাঁকে জিজ্ঞেস না করেই সভাপতি স্বামী বিবেকানন্দ নাম ঘোষণা করলেন। অগত্যা উঠতে হলো ভারতের সনাতন হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধি তরুণ সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দকে। দেবী সরস্বতীকে স্মরণ করে জলদ-গম্ভীর স্বরে ভাষণ আরম্ভ করলেন। কয়েক সহস্র নরনারীকে সম্বোধন করে বললেন, 'হে আমার আমেরিকাবাসী ভ্রাতা ও ভগিনীগণ!'—মুহূর্তে সেই বিশাল বিদ্বৎমণ্ডলী আনন্দে আত্মহারা হয়ে দু মিনিট ধরে করতালি ধ্বনি দিয়ে মুখরতি করে তুললেন

সভাস্থলকে। সেই স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দনের উত্তরে জ্বলন্ত অগ্নির মত বিকশিত হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। ওজস্বিনী ভাষায় সংক্ষিপ্ত ভাষণ আরম্ভ করলেন। বিষয়বস্তু ছিল 'আমাদের মতভেদ কেন'। সহজ সরল ভাষায় হিন্দু ধর্মের বহুব মধ্যে একের প্রকাশের ব্যাখ্যা করলেন। কোন ধর্মকে কোন জাতিকে আঘাত না করে সনাতন মহান সত্যকে প্রকাশ কবলেন হৃদয় দিয়ে, মানুষের হৃদয়ের ভাষায়। বিশ্বমৈত্রী ও সমন্বয়ের বাণী শোনালেন। স্তম্ভিত হয়ে শুনলেন সভা-জনতার মানুষেরা। মুগ্ধ বিস্মিত ও অভিভূত হলেন। একদিনেই স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকাবাসীর চিত্ত জয় কবে ফেললেন। পরদিন শহরের সমস্ত কাগজে অজস্র প্রশংসাসহ স্বামী বিবেকানন্দের ছবি ছাপা হলো। সম্মেলন সতেরো দিন ধরে চলে। স্বামীজী বারোটি বক্তৃতা দিলেন। স্বামীজীর বক্তৃতা হবে শুনলেই শ্রোতারা ধৈর্য সহকারে শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন। ইংরেজ জীবনীকার বলেন, 'খ্রীষ্টের পর এমন আশার বাণী প্রচারে আর কেউ সক্ষম হন নি।'

চিকাগো ধর্মমহাসভার মধ্য দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ হঠাৎ দিবাকরের ন্যায় প্রজ্বলিত হয়ে উঠলেন। সাধনা ও পাণ্ডিত্যেব যশঃসৌরভ বিকীর্ণ হলো সমগ্র পাশ্চাত্ত্য জগতে। সমগ্র বিশ্বের মানুষ জানলো চিনলো স্বামী বিবেকানন্দকে। গুরু শ্রীরামকৃষ্ণকে। ভারতমাতার আসনও সুপ্রতিষ্ঠিত হলো সমগ্র বিশ্ববাসীর হৃদয়ে।

শ্রীরামকৃষ্ণের সেই বাণী 'নরেন জগৎ মাতাবে' এতদিনে সত্যে পরিণত হলো। গঙ্গার তরঙ্গধ্বনির মতো ভারতের মানুষের কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হলো স্বামী বিবেকানন্দ নাম।

আমেরিকার সিকাগো ধর্মমহাসভায় অধিবেশন সমাপ্ত হলে শুরু হলো বিজয় পর্যটন। নিউ ইয়র্ক প্রভৃতি বড় বড় শহরে ও গ্রামে গ্রামে বেদান্তবাণী প্রচার করতে লাগলেন। এই সময়ের বাণীগুলিই রাজযোগ ও জ্ঞানযোগ নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। কর্মযোগী মহাপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ কর্মের মধ্যেই করলেন আত্মবিসর্জন।

সমগ্র আমেরিকাকে বেদান্ত বাণী শুনিয়ে জাগিয়ে মাতিয়ে প্লাবিত করে ইউরোপ বিজয়ে বহির্গত হলেন। আমেরিকা থেকে এলেন ফ্রান্সের প্যারিস শহরে। ফ্রান্স থেকে এলেন ইংলণ্ডে। লণ্ডন শহরে বিপুল সম্বর্ধনা পেলেন। শুরু হলো বক্তৃতা। বেদান্ত ও আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে। লণ্ডনবাসীর অন্তরও জয় করে ফেললেন। এই লণ্ডনেই আইরিশ তরুণী মিস মার্গারেট নোব্‌ল স্বামীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সেবাব্রতে দীক্ষিত হয়ে নিজ জীবন করলেন উৎসর্গ দুঃস্থ ভারতবাসীর সেবার কার্যে। গুরুদেবের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে বলছেন, 'নভেম্বর মাসের একটি রবিবাসরীয় হিমসন্ধ্যা। ওয়েস্ট এণ্ডের একটি বসবার ঘরে আগুনের দিকে পিছন ফিরে তিনি বসে আছেন। সামনে অর্ধ-বৃত্তাকারে শ্রোতাগণ। তিনি যখন প্রশ্নের পর প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন, মনে হচ্ছিল তিনি সংস্কৃত কোন গ্রন্থ আবৃত্তি করছেন—যা গীতধ্বনির সহিত তুলনীয়। তাঁর মনে নিশ্চয় এই প্রায়-অন্ধকার গোধূলি লগ্ন ভারতের কোনো গ্রামপ্রান্তে সূর্যাস্তে স্তূপ সন্নিকটে অথবা বৃক্ষমূলে উপবেশিত জনৈক সাধু এবং তাঁর চতুষ্পার্শ্বের শ্রোতাদের কৌতুককর রূপান্তর বলেই বোধ হয়ে থাকবে। ইংলণ্ডে এমন অনাবিল ভাবে স্বামীজীকে আমি আর দেখিনি। পরিধানে গেরুয়া—মাঝে মাঝে এক একবার শিব শিব ধ্বনি, আর তাঁর মুখমণ্ডলে অপূর্ব কোমলতা পরিস্ফুট যার সঙ্গে র‍্যাফায়েল চিত্রিত 'সিষ্টিন চাইল্ডের' ললাটলিপি তুলনীয়। এই সময়ে তিনি গীতা থেকে 'ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মনিগণা ইব' শ্লোকটির ব্যাখ্যা করে বললেন, 'সূত্রে গাঁথা বহু মনির মতো আমাতে সমস্ত রয়েছে।' এই মহিয়সী মহিলা মিস নোবল্‌ই হলেন ভগিনী নিবেদিতা।

অল্পদিনের মধ্যেই ইংলণ্ডবাসীরা স্বামীজীকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করলেন। এবং ইংলণ্ডে যাওয়ার আশাতিরিক্ত ফল পেলেন। ইংলণ্ডের জমিতে বেদান্তধর্মের বীজ বপন করে আবার ফিরে এলেন

আমেরিকায়। এবারে কর্মযোগের উপর বেশির ভাগ আলোচনা করলেন। বক্তৃতামালা 'কর্মযোগ' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলো। আমেরিকার প্রতিটি শহর মুখরিত হয়ে উঠলো স্বামীজীর ভাষণে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মিস্টার ফক্স স্বামীজীকে আমন্ত্রণ জানালেন। সেখানে তিনি অধ্যাপকমণ্ডলী ও ছাত্রদের সম্মুখে সরল ভাষায় বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। 'বোষ্টন ট্রান্সক্রিপ্ট' এ বিষয়ে লিখলেন, 'স্বামীজী প্রমাণ করেছেন ধর্ম শুধু কতকগুলি কথার কথা বা চমৎকার ভাব মাত্র নয়। জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে সেই ভাব দেখাতে পারলেই তবে ধর্মলাভ হয়। নরজীবনের মধ্যেই বেদান্ত ধর্মের সাহায্যে মানুষের পক্ষে দেবত্ব লাভ সম্ভব।'

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হলো 'বেদান্তসভা' নিউইয়র্ক শহরে। এ সময়ে স্বামীজীর রাজযোগ গ্রন্থ নিয়ে পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে তুমুল আলোড়নের হলো সৃষ্টি।

আবার ফিরে এলেন লণ্ডনে। এবারে বিখ্যাত মনীষী ম্যাক্স-মুলারের সঙ্গে পরিচিত হলেন। ম্যাক্সমুলার আপন গৃহে স্বামীজীকে আপ্যায়িত করলেন। এবং শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনলীলা ও দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করলেন। পরবর্তীকালে এই তথ্যের উপর ম্যাক্সমুলার গ্রন্থ রচনা করেন।

ম্যাক্সমুলার প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেন, 'দেখলাম তিনি যেন স্বয়ং সায়ন। কি অদ্ভুত অধ্যবসায়! কি প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য! বৃদ্ধ স্বামী স্ত্রীকে দেখে আমার বশিষ্ঠ-অরুন্ধতীর কথা মনে হয়েছিল।'

১৮৯৬ সালের ১০ই জুন ইংলণ্ডের রক্ষণশীল কাগজ 'দি লণ্ডন ডেলী ক্রনিকল' লিখলেন. 'স্বামীজী একজন বিখ্যাত বেদান্তবাদী। কিন্তু তাঁকে আঙুল তুলে কোনো ধর্মাবলম্বী বলে নির্দেশ করা যায় না। সমস্ত ধর্ম থেকেই তিনি যেন সার সংগ্রহ করেছেন।'

তারপর ইউরোপের বিভিন্ন শহরে বেদান্ত প্রচারে বহির্গত হলেন। সুইজারল্যাণ্ড জার্মানী ও প্যারী শহর হয়ে আবার ফিরে এলেন লণ্ডনে। ফ্রান্সে বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক রোমা রোঁলার সঙ্গে

সাক্ষাৎ হলো। উভয়ের সাক্ষাৎ আলোচনা ও হৃদ্যতা সার্থক হয়েছিল। তারই ফলশ্রুতিস্বরূপ পরবর্তীকালে রোমা রোঁলা রচনা করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী গ্রন্থ।

ইউরোপ ভ্রমণকালে স্বামীজী দেশের সহকর্মী ও গুরুভ্রাতাদের সঙ্গেও পত্রে যোগাযোগ রক্ষা করছিলেন। মাতৃভূমির সেবায় জীবন উৎসর্গ করবার প্রেরণা দিচ্ছিলেন। গুরুভ্রাতাদের উদ্দেশ্য করে লিখলেন, 'যে নরকে পর্যন্ত গিয়ে জীবের জন্য কাতর হয়···সেই রামকৃষ্ণের পুত্র—ইতরে কৃপণাঃ (অপরে হীনবুদ্ধি) অনওয়ার্ড অনওয়ার্ড (এগিয়ে চলো এগিয়ে চলো)।···মুক্তির সময় নাই, ভক্তির সময় নাই। দেখা যাবে পরে। এখন এ জন্মে অনন্ত বিস্তার··· উত্তিষ্ঠত জাগ্রত (ওঠো, জাগো)—হরে হরে। তিনি পিছনে আছেন। সে যে তাঁর সেবার জন্য—তাঁর সেবা নয়—তাঁর ছেলেদের, গরীব গুরবো, পাপী তাপী, কীট পতঙ্গ পর্যন্ত—তাদের সেবার জন্য যে যে তৈরী হবে, তাদের ভেতর তিনি আসবেন—তাদের মুখে সরস্বতী বসবেন—তাদের বক্ষে মহামায়া মহাশক্তি বসবেন।'

অপর এক চিঠিতে লিখেছেন:

বল অস্তি অস্তি—নাস্তি নাস্তি করে দেশটা গেল। ওরে হতভাগাগুলো, নেই নেই বলে কি কুকুর বেড়াল হয়ে যাবি নাকি! কিসের নেই? কার নেই? শিবোহহং শিবোহহং। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ (বলহীন ব্যক্তির আত্মসাক্ষাৎকার হয় না)। এ দুনিয়া ছেলেখেলা নয়। বড়লোক তাঁরা যাঁরা আপনার বুকের রক্ত দিয়ে রাস্তা তৈরী করেন। এই হয়ে আসছে চিরকাল—একজন আপনার শরীর দিয়েসেতু বানায়, আর হাজার হাজার জন তার উপর দিয়ে নদী পার হয়। এবমস্তু, এবমস্তু, শিবোহহং, শিবোহহং (এরূপই হোক, এরূপই হোক, আমিই শিব)। বীর্যমসি বীর্যং, বলমসি বলং, ওজহসি ওজঃ, সহোহসি সহোময়ি ধেহি (তুমি বীর্যস্বরূপ, আমায় বীর্যবান কর; তুমি বলস্বরূপ, আমায় বলবান কর; তুমি তেজস্বরূপ, আমায় তেজস্বী কর; তুমি সহনশক্ত, আমায় সহনশীল কর।)

অবশেষে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর কয়েকজন ইউরোপীয় শিষ্য সহ স্বামী বিবেকানন্দ ভারত অভিমুখে যাত্রা করলেন। সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকার জ্ঞানী গুণীও সাধারণ মানুষের চিত্তকে বেদান্তধর্মের প্লাবনে প্লাবিত করে স্বদেশ ভূমি অভিমুখে যাত্রা হলো শুরু। ইতিমধ্যে বিপিনচন্দ্র পাল ইণ্ডিয়ান মিরর কাগজে স্বামীজীর ইউরোপ ও আমেরিকার সাফল্যময় জীবন সম্বন্ধে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছেন। ভারতবর্ষের সমস্ত পত্র ও পত্রিকায় স্বামী বিবেকানন্দের পাশ্চাত্ত্য জয়ের বার্তা প্রকাশিত হয়েছে। ভারতবর্ষের সমস্ত প্রান্তের মানুষই উন্মুখ হয়ে আছে স্বামীজীকে দর্শন করবার জন্য আর তাঁর শ্রীমুখনিঃসৃত অমৃতময় বাণী শ্রবণ করে ধন্য হবার জন্য। তাইতো কলম্বো জাহাজ ঘাটে নামতেই অগণিত অপেক্ষমান জনতার অভ্যর্থনা লাভ করলেন স্বামীজী। অবশেষে কলম্বো পাবলিক হলে অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা দিলেন। এই ভাবে প্রথমে সিংহলকে প্লাবিত করে, পাম্বান দ্বীপ হয়ে প্রথম ভারতের মাটিতে পদার্পণ করলেন রামেশ্বরে। আতিথ্য গ্রহণ করলেন রামনাদ মহারাজের। রামনাদের পর মাদ্রাজ অভিমুখে করলেন যাত্রা।

বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করলেন মাদ্রাজে। মাদ্রাজ প্রদেশের প্রতিটি প্রান্ত থেকে প্রতিটি মানুষের অন্তরের অভ্যর্থনা লাভ করলেন স্বামী বিবেকানন্দ। সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্মের উদ্দীপনা দেখে স্বামীজী বললেন, —'দেখ যেন এ আগুন নিভে না যায়।' মাদ্রাজে এক বক্তৃতায় বললেন, 'ভারত তুমি জাগো, স্মরণ করো তোমার প্রাণ-শক্তি রয়েছে তোমার মৃত্যুহীন আত্মায়। জেনো, ব্যক্তির মতো প্রতিটি জাতির জীবনেও একটি করে মূল সুর থাকে তাকে কেন্দ্র করে জীবনের সব কিছু ব্যঞ্জিত হয়। কোনো জাতি যদি তার সহস্র বৎসরের প্রবণতা ত্যাগ করে নতুন কোনো খাতে তার প্রাণ-শক্তিকে চালিত করতে চায়, তবে তার মৃত্যু নিশ্চিত। ইংরেজদের প্রাণশক্তি যেমন রাজনৈতিক ক্ষমতায় বা গ্রীকদের যেমন ছিল সৌন্দর্যপ্রিয়তায়, ভারতের প্রাণশক্তি তেমনি তার ধর্মে নিহিত।

কাজেই তোমরা ভারতবাসীরা যদি এই ধর্মকে ত্যাগ করে রাজনীতি বা সমাজনীতিকে জীবনের লক্ষ্য বলে ধরো, তবে তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য। ভারতে রাজনীতি বা সমাজনীতি ধর্মের মাধ্যমেই প্রচার করতে হবে।'

তারপর এসে উপস্থিত হলেন কলকাতাতে। বাংলা দেশও অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করলো ত্যাগী মহাপুরুষ চিরসন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দকে। ১৮৯৭ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী মহানগরীর জনসাধারণের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানানো হলো। বক্তৃতার মাধ্যমে স্বামীজী অনুপ্রেরণা দিলেন যুবক সম্প্রদায়কে ত্যাগ ও সেবাব্রতে আত্মনিয়োগ করবার জন্য।

স্বামীজীর প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে বহু শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবক ধীরে ধীরে সন্ন্যাস ব্রতে দীক্ষিত হয়ে স্বামীজীর নির্দেশিত সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করলেন। নূতন প্রাণে সঞ্জীবিত করে তুললেন সমগ্র বঙ্গভূমিকে স্বামী বিবেকানন্দ। অগ্নিময় বাক্যে যুবকদের মধ্যে শ্রদ্ধা ও সাহসকে উদ্বুদ্ধ করে তুললেন। স্বামীজী বললেন,—বীর্যবত্তা, অভীঃ। ভয়শূন্য হও। চাই ক্ষাত্রবীর্য, ব্রহ্মতেজ। সবল লোকই ধর্মের মহৎ তত্ত্ব ধারণা করতে সমর্থ। তাইতো বললেন—'ফুটবল খেলার ভেতর দিয়ে তোমরা গীতা আরও ভাল বুঝতে পারবে।'

এতদিন পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যরা প্রধানতঃ সাধন ভজন পূজাপাঠ তীর্থ পর্যটন নিয়েই ছিলেন। স্বামীজী এবারে তাঁদের জীবনধারায় এনে দিলেন আমূল পরিবর্তন। স্বামীজী বললেন —'সন্ন্যাসী শুধু নিজের মুক্তির চেষ্টা করবে না। জগতের হিতের জন্য তাকে নিষ্কাম কর্মে আত্মনিয়োগ করতে হবে।' শ্রীরামকৃষ্ণের সেই জীবে সেবা। সেবাব্রতকেই স্বামী বিবেকানন্দ বাস্তব কর্মের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত করতে সচেষ্ট হলেন। তাইতো প্রতিষ্ঠা করলেন সেবা সংঘ। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১লা মে। ভক্তপ্রবর বলরাম বসুর বাড়ীতে। ভক্তপ্রবর নাট্যকার গিরিশ ঘোষ সেবা

প্রতিষ্ঠানটির নাম দিলেন 'রামকৃষ্ণ প্রচার'। আজকের সুবৃহৎ সেবা প্রতিষ্ঠান—শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হলো।

এদিকে অন্যতমা শিষ্যা নিবেদিতা রইলেন বাগবাজারে শ্রীমা'র পদতলে। হিন্দু ব্রহ্মচারিণীর মত জীবন যাপন করতে লাগলেন। আর স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের কার্যে করলেন আত্মনিয়োগ। মেয়েদের জন্য একটি স্কুলও খুললেন। যে সময় কলকাতা শহরে প্লেগ মহামারীরূপে দেখা দেয়, সেই দুর্দিনে স্বামী বিবেকানন্দের পার্শ্বে এসে দাঁড়িয়েছিলেন এই তপস্বিনী মহাসাধিকা ভগিনী নিবেদিতা সেবা-ব্রত পালনের জন্য। শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য ভক্তদের সেবায় কলকাতার জনমানসের চিত্ত জয় করলো রামকৃষ্ণ সেবা সংঘ। ভারত ভূমির বিভিন্ন অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ ও প্লাবনে পীড়িত দুঃস্থ আর্ত মানুষের সেবার কার্যে ব্রতী হলো এই প্রতিষ্ঠান। জাতি বিচার না করে। সেবা প্রতিষ্ঠানের কার্যে শিষ্য ভক্ত গুরুভ্রাতাদের আত্মনিয়োগ করতে দেখে উৎফুল্ল চিত্তে স্বামী বিবেকানন্দ লিখলেন স্বামী অখণ্ডানন্দকে, 'ক্ষুধিতের পেটে অন্ন পোঁছাতে যদি নামধাম সব রসাতলেও যায়, অহোভাগ্যম অহোভাগ্যম।' পড়েছো 'মাতৃদেব ভব' 'পিতৃদেব ভব', আমি বলি 'দরিদ্রদেবো ভব' 'মূর্খদেবো ভব'। একজন লোকের মুক্তির জন্য আমি হাজার বার নরকে যেতে প্রস্তুত।'

তারপর অকস্মাৎ একদিন স্বামী বিবেকানন্দ কলকাতার আনন্দের হাটকে ভেঙ্গে দিয়ে ভারতভূমি পর্যটনে বহির্গত হলেন। বিজয়ীর বেশে। গেলেন খেতড়ীতে, জয়পুর যোধপুর আলমোড়া সমগ্র উত্তর মধ্য ও পশ্চিম ভারত পরিভ্রমণ করে সমগ্র দেশবাসীকে ত্যাগ ও সেবাব্রতের মধ্য দিয়ে মনুষ্যত্ব বিকাশের ধর্মে উদ্বুদ্ধ করে এলেন কাশ্মীরে। শ্রীনগরে। অমরনাথে। এখানেও তিনি সাধারণ মানুষের মধ্যে বিতরণ করলেন জ্ঞানের আলোক। সুপ্ত নিদ্রিত ভারতভূমিকে ভারতবাসীকে জাগ্রত করে তুললেন। প্রাণবন্ত করে তুললেন। সমগ্র ভারতবর্ষকে জাগিয়ে মাতিয়ে প্লাবিত করে আবার ফিরে এলেন কলকাতায়। প্রতিষ্ঠা করলেন বেলুড়ে

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ। পুণ্যসলিলা গঙ্গাতীরের বেলুড় মঠে শুরু হলো স্বামী বিবেকানন্দের লীলা। জ্ঞানতপস্বী কর্মযোগী স্বামী বিবেকানন্দের অধ্যাত্মজ্ঞান ও কর্মের বাণী দিকে দিকে প্রচারিত হতে লাগলো। আর মহাসাধকের অবস্থানে বেলুড় মঠ মহাতীর্থে হলো পরিণত।

আবার রাত্রি প্রভাত! নব উষা!

চারিদিকের বায়ুমণ্ডলে যেন বিষাদতরঙ্গ বয়ে চলেছে। গঙ্গার জলবিধৌত তীরের বেলুড় মঠে অবস্থান কালেই অকস্মাৎ স্বামীজীর কর্ণগোচর হলো পওহারীবাবার দেহান্তরিতের ও বিদেশী শিষ্য ভক্ত স্টেনোগ্রাফার গুডউইনের মৃত্যুসংবাদ। শোকাকুল হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। সাধক জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণের পরই তিনি যে পওহারীবাবাকে হৃদয়ে স্থান দিয়েছিলেন। আর গুডউইনকে দিয়েছিলেন হৃদয়ের স্নেহ। এই গুডউইনেরই অক্লান্ত পরিশ্রমে স্বামী বিবেকানন্দের ইউরোপ ও আমেরিকার অমূল্য বক্তৃতাবলী গ্রন্থাকারে হয়েছিল প্রকাশিত। প্রিয় ভক্ত গুডউইনের জন্য স্বামীজীর অন্তর হতে মর্মবেদনা রূপায়িত হয়ে উঠলো কাব্যে। রচনা করলেন একটি কবিতা—'সে শান্তিতে থাকুক।'

ইতিমধ্যে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের সম্পাদনায় উদ্বোধন পত্রিকা হয়েছে প্রকাশিত। স্বামীজী পত্রিকার আদর্শ পথ ও পাথেয় সম্বন্ধে নানা উপদেশ দিলেন। প্রস্তাবনায় লিখলেন, 'যাহা আমাদের নাই, বোধ হয় পূর্বকালেও ছিল না। যাহা যবনদিগের ছিল, যাহার প্রাণস্পন্দনে ইউরোপীয় বিদ্যাধার হইতে ঘন ঘন মহাশক্তির সঞ্চার হইয়া ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিতেছে, চাই তাহাই। চাই সেই উদ্যম, সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভর, সেই অটল ধৈর্য, সেই কার্যকারিতা, সেই একতাবন্ধন, সেই উন্নতি তৃষ্ণা; চাই সর্বদা-পশ্চাদ্দৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়া অনন্ত সম্মুখ সম্প্রসারিত দৃষ্টি, আর চাই—আপাদমস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ।......

রজোগুণের মধ্যে দিয়া না যাইলে কি সত্ত্বে উপনীত হওয়া যায়? ভোগ শেষ না হইলে যোগ কি করিবে? বিরাগ না হইলে ত্যাগ

কোথা হইতে আসিবে? অপরদিকে তালপত্রবহ্নির ন্যায় রজোগুণ শীঘ্রই নির্বাণোন্মুখ সত্ত্বের সন্নিধান নিত্যবস্তুর নিকটতম, সত্ত্ব প্রায় নিত্য, রজোগুণ-প্রধান জাতি দীর্ঘজীবন লাভ করে না, সত্ত্বগুণ-প্রধান যেন চিরজীবী। ইহার সাক্ষী ইতিহাস। ভারতে রজোগুণের প্রায় একান্ত অভাব। পাশ্চাত্ত্যে সেই প্রকার সত্ত্বগুণের। ভারত হইতে সমানীত সত্ত্বধারার উপর পাশ্চাত্ত্য জগতের জীবন নির্ভর করিতেছে নিশ্চিত, এবং নিম্নস্তরে তমোগুণকে পরাহত করিয়া রজোগুণ প্রবাহ প্রতিবাহিত না করিলে আমাদের ঐহিক কল্যাণ যে সমুৎপাদিত হইবে না ও বহুধা পারলৌকিক কল্যাণের বিঘ্ন উপস্থিত হইবে, ইহাও নিশ্চিত। এই দুই শক্তির সম্মিলনের ও মিশ্রণের যথাসাধ্য সহায়তা করা—'উদ্বোধনের জীবনোদ্দেশ্য।'

স্বামীজী দেশের সুপ্ত শক্তিকে সামগ্রিক ভাবে উদ্‌বুদ্ধ ও বিকশিত করে তুলবার যে চেষ্টা করেছিলেন, যে প্রেরণা দিয়েছিলেন তার মধ্যে বাংলা ভাষার উন্নতি বিধান করবার চেষ্টা অন্যতম। বাংলা ভাষার মধ্যে তিনি নবপ্রাণ সঞ্চার করে দিয়েছিলেন। সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দ যে একজন সচেতন সুদক্ষ শিল্পী ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। তাঁর বাংলা রচনা 'ভাববার কথা', 'বর্তমান ভারত', 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য' প্রভৃতি মৌলিক গ্রন্থগুলি সে যুগে এবং বর্তমানকালে পাঠক-সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথও তাঁর 'জীবন্ত প্রাণময়' চলতি বাংলা ভাষার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য' গ্রন্থটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'যেমন ভাষা তেমনি ভাব, তেমনি সূক্ষ্ম উদার দৃষ্টি। আর পূর্ব পশ্চিমের সমন্বয়ের আদর্শ দেখে অবাক হতে হয়।'

সাধু গদ্য ও চলতি গদ্য—এ দুইয়েরই ক্ষেত্রে স্বামীজীর মৌলিক দান রয়েছে। বাংলা গদ্যে যে ক্রিয়াপদের আতিশয্য লেখকদের কাছে সমস্যা সে বিষয়েও বিবেকানন্দ চিন্তা করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে বলছেন, 'ভাষার ভেতর ক্রিয়াপদগুলি ব্যবহারের মানে

কি জানিস? ঐরূপে ভাবের বিরাম দেওয়া। সেজন্য ভাষায় অধিক ক্রিয়াপদ ব্যবহার করাটা ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলার মতো দুর্বলতার চিহ্নমাত্র। ঐরূপ করলে মনে হয় যেন ভাষায় দম নেই।...ভাষার উপর যার দখল আছে, সে অত শীগগির শীগগির ভাব থামিয়ে ফেলে না। তোদের ডালভাত খেয়ে শরীর যেমন ভেতো হয়ে গেছে, ভাষাও ঠিক সেইরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে; আহার চালচলন ভাব ভাষাতে তেজস্বিতা আনতে হবে, সব দিকে প্রাণের বিস্তার করতে হবে,...যাতে সকল বিষয়েই একটা প্রাণস্পন্দন অনুভূত হয়। তবেই এই ঘোর জীবন সংগ্রামে দেশের লোক বাঁচতে পারবে।'

আবার বলছেন, 'আমার মনে হয় সকল জিনিসের মত ভাষা এবং ভাবও কালে একঘেয়ে হয়ে যায়। এদেশে এখন ঐরূপ হয়েছে বলে বোধ হয়। ঠাকুরের আগমনে ভাব ও ভাষায় আবার নূতন স্রোত এসেছে। এখন সব নূতন ছাঁচে গড়তে হবে। নূতন প্রতিভার ছাপ দিয়ে সকল বিষয় প্রচার করতে হবে। এই দেখ না—আগেকার কালের সন্ন্যাসীদের চালচলন ভেঙ্গে গিয়ে এখন কেমন এক নূতন ছাঁচ দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।...দেশ সভ্যতা ও সময়ের উপযোগী করে সকল বিষয়ই কিছু কিছু পরিবর্তন করে নিতে হবে। এর পর বাংলা ভাষায় প্রবন্ধ লিখবো মনে কবছি। সাহিত্য-সেবীগণ হয়তো তা দেখে গালমন্দ করবে। করুক, তবু বাংলা ভাষাটাকে নূতন ছাচে গড়তে চেষ্টা করবো।'

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেরণায় যে বিপুল মননের উত্তরাধিকার বিবেকানন্দ পেয়েছিলেন তাই বাংলা ভাষাকে সংহত গাম্ভীর্যে এক নূতন সম্ভাবনার পথে নিয়ে গেল। একটি সমগ্র জাতির অন্তর যেন বিবেকানন্দের মন্ত্রকণ্ঠে আত্মসম্বিৎ ফিরে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলো। প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর সমন্বয়ে মাতৃভূমিকে গড়ে তুলবার সঙ্কল্প নিয়েই বাংলা ভাষার মধ্যে নব প্রাণের সঞ্চার করেছিলেন। আর সেই মিলনবাণী বাংলা গদ্যের সুগম্ভীর মৃদঙ্গ ধ্বনির মধ্য দিয়ে বাঙ্গালীর চিত্তে সঞ্চারিত হলো।

'স্বামী বিবেকানন্দ—এক ডাইনামিক পার্সোনালিটি। ডাইনামিক সে-ই যার ভিতর বারুদের ধর্ম আছে, প্রচণ্ড তেজ, প্রচণ্ড ভাঙাগড়ার শক্তি। সেই বারুদের আগুন থেকে একটা স্ফুলিঙ্গ আমার ভিতর এসে পড়েছিল। আমায় ভেঙে গড়ে তুলেছিল।' বলছেন রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ী সরলাদেবী।

রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'আধুনিককালে ভারতবর্ষে বিবেকানন্দই একটি মহৎ বাণী প্রচার করেছিলেন। তিনি দেশের লোককে ডেকে বলেছিলেন, তোমাদের সকলেব মধ্যেই ব্রহ্মেব শক্তি, দরিদ্রের মধ্যে দেবতা তোমাদের সেবা চান। এই কথাটি যুবকদের চিত্তকে সমগ্রভাবে জাগিয়েছে। তাই এই বাণীর ফল দেশের সেবায় বিচিত্রভাবে- বিচিত্র ত্যাগে ফলেছে। তাঁর বাণী মানুষকে যখনই সম্মান দিয়েছে তখনই শক্তি দিয়েছে। বাংলাদেশের যুবকদের যে সব দুঃসাহসিক অধ্যবসায়ের পরিচয় পাই তার মূলে আছে বিবেকানন্দের সেই বাণী।'

বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'দরিদ্রের মধ্য দিয়ে নারায়ণ আমাদের সেবা পেতে চান।' বিবেকানন্দের এই বাণী সম্পূর্ণ মানুষের উদ্বোধন বলেই কর্মের মধ্যে দিয়ে ত্যাগের মধ্যে দিয়ে মুক্তির বিচিত্র পথে আমাদের যুবকদের প্রবৃত্ত করেছে।'

শ্রীঅরবিন্দ স্বামী বিবেকানন্দের বাংলা প্রবন্ধগুলি পাঠ করে বলেছিলেন, 'স্বামীজীর ভাষায় প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়। ভাষার ভাবের এরূপ ঝঙ্কার শক্তি ও তেজ অন্যত্র দুর্লভ।' স্বামী বিবেকানন্দও ভবিষ্যতের ঋষি শ্রীঅরবিন্দের অন্তর্জগতে দিয়েছিলেন প্রেরণা।

* * *

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ২০শে জুন স্বামীজী আবার যাত্রা করলেন পাশ্চাত্ত্যের পথে। সমুদ্র পারে। লণ্ডন অভিমুখে। সঙ্গী হলেন স্বামী তুরিয়ানন্দ আর ভগিনী নিবেদিতা। ৩১শে জুলাই লণ্ডন শহরে পৌঁছালেন। এবার আর বৃহৎ জনসভায় বক্তৃতা করলেন না। বিভিন্ন ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হয়ে বেদান্ত ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা

করলেন। সহজ সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করলেন। প্রেরণা দিলেন লণ্ডনের অধিবাসীদের, ইউরোপবাসীদের অন্তর্জগতে।

এই জাহাজের দীর্ঘ দেড়মাসের অলস জীবনে ভগিনী নিবেদিতা গুরু স্বামী বিবেকানন্দের নিকট থেকে ভারতের সাহিত্য দর্শন ধর্ম সম্বন্ধে বিস্তর জ্ঞান আহরণ করলেন। একান্তভাবে গুরু সান্নিধ্য লাভের এই সুযোগ সযত্নে ব্যবহার করেছিলেন নিবেদিতা। এই প্রসঙ্গে ভগিনী নিবেদিতা বলেন, 'এই সময়টুকু আমার জীবনের সর্বপ্রধান ঘটনা।' স্বামীজী এই সময় কিছু কিছু বাংলা প্রবন্ধও রচনা করেন।

আবার আমেরিকার ভক্তদের একান্ত আগ্রহে ১৬ই আগষ্ট আমেরিকা অভিমুখে করলেন যাত্রা। স্বামী অভেদানন্দ তখন আমেরিকায় বেদান্ত ধর্ম প্রচারে ব্রতী হয়েছেন। তিনি ১৮৯৬ সালে স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বানে আসেন লণ্ডনে। বেদান্ত ধর্ম প্রচার করবার জন্য এবং স্বামীজী ভারতে প্রত্যাবর্তন করলে স্বামী অভেদানন্দ আমেরিকায় গিয়ে নিউ-ইয়র্কে বেদান্ত সোসাইটির ভার গ্রহণ করলেন। ভারতের দর্শন, রাজনীতি, ধর্ম শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে আলোচনা ও বক্তৃতা করতে লাগলেন। দার্শনিক ম্যাক্সমুলার, পল-ডয়সন অধ্যাপক উইলিয়ম জেমস, অধ্যাপক জোসিয়া রয়েস প্রভৃতি ইউরোপ আমেরিকার বিশিষ্ট জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের সংস্পর্শে আসেন এবং স্বামী বিবেকানন্দের অবর্তমানে তিনিই সমুদ্রপারে বেদান্ত ধর্ম প্রচারের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তরুণ বয়স থেকেই তিনি দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসেন। এবং বিবেকানন্দের অধ্যাত্ম সাধনা ও কর্ম সাধনার সহযাত্রী হন। স্বামীজীর আগমনে আবার আমেরিকার বিভিন্ন প্রান্ত প্লাবিত হয়ে উঠলো। তাঁর বক্তৃতা শোনবার জন্য সাড়া পড়ে গেল শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে। ক্যালিফোর্নিয়ায় বেদান্তের প্রভাব অভাবনীয়রূপে ছড়িয়ে পড়লো যুবকদের মধ্যে। বহু যুবক উদ্বুদ্ধ হয়ে বেদান্ত ধর্ম প্রচারে হলেন ব্রতী। স্থানে স্থানে রামকৃষ্ণ মঠও স্থাপিত হতে

লাগলো। অবশেষে গুরুভ্রাতা শিষ্যদের উপর কার্যভার অর্পণ করে স্বামীজী চলে এলেন প্যারিস শহরে। ২২শে জুলাই। মিস্টার ও মিসেস লেগেটের আতিথ্য গ্রহণ করলেন। দার্শনিক কবি বৈজ্ঞানিক শিল্পীর সমাগমে লেগেট গৃহ মুখরিত হয়ে উঠলো। প্রতিটি বিষয়েই গভীর জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে সকলেই মুগ্ধ হলেন।

প্যারীর কংগ্রেসে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করলেন প্রাঞ্জল ভাষায়। ফরাসী ভাষা তিনি জানতেন না। কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যে আয়ত্ত করে ফেললেন ফরাসী ভাষা।

সনাতন হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছিলেন পণ্ডিতমণ্ডলী। প্যারী সম্বন্ধে স্বামীজী বলেন, 'প্যাবী এক সহাসমুদ্র—এই নগরী ইউরোপীয় সভ্যতা-গঙ্গার গোমুখ। মর্ত্যেব অমরাবতী, সকল জায়গায় এদের নকল।' প্যারীব এই মহতী সভায় সাক্ষাৎ হয় স্বামীজীর সঙ্গে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর। স্বামীজী এই প্রসঙ্গে লিখছেন,—'চারিদিক থেকে নিজের দেশের শ্রেষ্ঠতা নিয়ে মানুষ এখানে এসেছে। অথচ এই মহামিলন কেন্দ্রে বাংলা তুমি কই? কে তোমার নাম নেয়? সমবেত সেই প্রতিভামণ্ডলীর মধ্য থেকে বীর বঙ্গভূমির একটি সন্তান তবু মাতৃনাম উচ্চারণ করলেন—তিনি জগদীশচন্দ্র বসু। আপন প্রতিভা দিয়ে মুগ্ধ কবলেন বৈজ্ঞানিক মণ্ডলীকে। ধন্য বীব তিনি।'

এইভাবে তিনমাস ফ্রান্সে অতিবাহিত করে সনাতন ধর্মেব মহান সত্যকে প্রচাব কবে, উপস্থিত হলেন এসে ভিয়েনাতে। হাঙ্গেবী সার্ভিয়া রুমানিয়া বুলগেরিয়া হয়ে কনস্টান্টিনোপল এলেন। সেখান থেকে এসে উপস্থিত হলেন এথেন্স শহবে। সমগ্র ইউরোপ মহাদেশকেই প্লাবিত কবে স্বামী বিবেকানন্দ আবাব দেশাভিমুখে কবলেন যাত্রা।

সমগ্র ইউরোপবাসীকে শোনালেন সমন্বয়েব বাণী·········
'বুদ্ধদেবে আমরা দেখি হৃদয়, অনন্ত সহ্য গুণ। তিনি ধর্মকে সর্বসাধারণের উপযোগী করিয়া প্রচাব করিলেন। অসাধারণ

ধীশক্তিসম্পন্ন শঙ্করাচার্য উহাকে জ্ঞানের প্রখর আলোকে উদ্ভাসিত করিলেন। আমরা এক্ষণে চাই এই প্রখর জ্ঞানসূর্যের সঙ্গে বুদ্ধদেবের এই অদ্ভুত হৃদয়—এই অদ্ভুত প্রেম ও দয়া সম্মিলিত হউক। খুব উচ্চ দার্শনিক ভাবও উহাতে থাকুক, উহা বিচারপূত হউক, আবার সঙ্গে সঙ্গে যেন উহাতে উচ্চ হৃদয় প্রবল প্রেম ও দয়ার যোগ থাকে। তবেই মণিকাঞ্চন যোগ হইবে। তবেই বিজ্ঞান ও ধর্ম পরস্পরকে কোলাকুলি করিবে। ইহাই হইবে ভবিষ্যতের ধর্ম।'

সেই প্রাচীনকালের ভারতবর্ষের ছায়াচ্ছন্ন তপোবনের জ্ঞানী বালকটির মত জগৎবাসীকে যেন বললেন, হে দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্রগণ! শ্রবণ কর, আমি পথ পাইয়াছি। যিনি অন্ধকারের অতীত, তাঁহাকে জানিলে অন্ধকারের বাহিরে যাইবার পথ পাওয়া যায়। মুগ্ধ চিত্তে শ্রবণ করলেন পাশ্চাত্যবাসী অজ্ঞেয়বাদী জন মানুষ মহাযোগী স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্ত বাণী।

অকস্মাৎ ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর রাত্রে স্বামীজী অপ্রত্যাশিত ভাবে এসে উপস্থিত হলেন বেলুড় মঠে। গুরুভ্রাতা শিষ্য ভক্তের দল আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন। বহুদিন পর খিচুড়ী প্রসাদ খেয়ে যেন অমৃতের আস্বাদন লাভ করলেন স্বামীজী। অকস্মাৎ স্বামীজীর আগমনে আবাব বসে গেল আনন্দের হাট। বেলুড় মঠে।

আবার একদিন সেই আনন্দের হাটকে ভেঙ্গে দিয়ে স্বামীজী চলে গেলেন আলমোড়ায়, মায়াবতী আশ্রমে। সেখান থেকে ফিরে এসে গেলেন পূর্ববঙ্গ ও আসাম পরিভ্রমণে। আসামের কামাখ্যা দর্শন করে যাত্রা করলেন শিলংয়ের পথে। কর্মযোগী স্বামী বিবেকানন্দের কর্মময় জীবনে শ্রান্তি বিশ্রাম বলে কিছু ছিল না। তিনি বলতেন, 'কাজ কথা বলুক। মুখকে বিরাম দাও। কর্ম কর্ম কর্ম, হাম আওর কুছ নহি মাংতে হেঁ—কর্ম কর্ম কর্ম, ইভেন আনটু ডেথ (আমরণ)।' তাইতো সেবাব্রতের মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক ভাবের বন্যায় তিনি দেশকে সেদিন ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। ধর্মকে

সমাজজীবনের কেন্দ্র করে স্বদেশসেবা ও নরনারায়ণের সেবায় স্বামীজী উদ্বুদ্ধ করেছিলেন সমগ্র জাতিকে। আর শুনিয়েছিলেন আশার বাণী, 'নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান হতে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে, বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে বাজার থেকে। বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে—তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। এরা একমুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উল্টে দিতে পারবে। আর আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না। এরা রক্তবীজের প্রাণসম্পদ।'

এই শিলং থেকেই অসুস্থ শরীর নিয়ে স্বামীজী মঠে ফিরলেন। এ ভাঙ্গা শরীর আর সুস্থ সবল হয়ে ওঠেনি কোনদিন। অবশেষে ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই বেলুড় মঠে কর্মযোগী মহাসাধক স্বামী বিবেকানন্দ ধীরে ধীরে মহাসমাধিতে হলেন নিমগ্ন। মাত্র উনচল্লিশ বৎসর বয়সে করলেন ইহলীলা সংবরণ।

সেই পবিত্র পুণ্যময় ভূমিও বেলুড় মঠ স্বামীজীর স্মৃতি বহন করে আজও সমাসীন। স্বামীজীর নীরব নিস্তব্ধ কক্ষ হতে কানে ভেসে আসে পুণ্যসলিলা গঙ্গার কলমর্মর। শুধু কলমর্মর কলধ্বনি নয়, জলকলরোলও নয়, যেন সেই তেজোদীপ্ত কণ্ঠধ্বনিরই পুনরাবৃত্তি—'উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।'

কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ

নবদ্বীপের মহাশ্মশান। কে জানে কত যুগের চিতাভস্ম এই শ্মশানভূমির স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে। কখনো করুণ কখনো বীভৎস এই মহাশ্মশানের মাটি ও অন্ধকারে বহু ঘটনার কাহিনী আছে লুকিয়ে। মনে হয় শ্মশানের মাটি হতে যেন এক শোক রাগিণী গুঞ্জরিত হয়ে উঠছে। একদিকে জীবনের কলরব আর একদিকে মৃত্যুর স্তব্ধতা। অমারজনীর গভীর তমিস্রায় এই নির্জন শ্মশানভূমির বুকে ধ্যানমগ্ন এক নবীন মাতৃসাধক। প্রতি অমাবস্যা তিথিতে গভীর রজনীতে গঙ্গাতীরের এই শ্মশানে এসে 'ঘটে' শ্যামামায়ের পূজা সম্পন্ন করেন। তারপর মহাশ্মশানের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে শ্যামামায়ের ধ্যানে হন মগ্ন। যখন উষার আলোয় শ্মশানভূমির মাটি হয়ে ওঠে উদ্ভাসিত, তখন ধ্যান ভঙ্গ হয়। গঙ্গা-স্নান করে ফিরে আসেন গৃহে।

এইভাবে দিন সপ্তাহ মাসের পর মাস অতিক্রান্ত হয়। আবার আসে নূতন সপ্তাহ, নূতন দিন। প্রতি রাত্রির মতনই আসে সাধকের নিকট আর এক নূতন রাত্রি। ধীরে ধীরে রাত্রিও গভীর হয়ে আসে। অতীত ও বর্তমানের তন্ত্রসাধনার ধারার কথা চিন্তা করতে করতে নবীন সাধক আত্মসমাহিত হন।

সে সময় তন্ত্রসাধনা অবনতির চরম সীমায় এসে পৌঁছেছিল। কদাচার আর দুর্নীতির প্রাবল্যে বাংলার সমাজজীবন কলুষিত হয়ে উঠেছিল। তাইতো সাধকের মনে বড় ক্ষোভ শক্তিসাধনার মহান ক্ষেত্র যে পঙ্কিল হয়ে উঠেছে। পরিত্রাণের উপায় কোন্ পথে হবে সম্ভব? তন্ত্রসাধনার ধারাটি কেমন করে আবার হয়ে উঠবে উজ্জীবিত? এই চিন্তাতেই অকস্মাৎ চঞ্চল হয়ে উঠলো তন্ত্রসাধকের

মন। আর ঘটের পূজায়ও তো মন ভরে না।' ইচ্ছা হয় শ্যামা-মায়ের রূপময়ী বিগ্রহকে পূজা করতে। শুধু তাই নয়, বাংলার ঘরে ঘরে জনসমাজে এই মাতৃমূর্তির, শ্যামামায়ের বিগ্রহের প্রচলন করবারও একান্ত ইচ্ছা জাগে মনে। এই বিগ্রহ পূজা আরাধনার মধ্য দিয়ে শক্তিসাধনাকে মাতৃভাবনায় উদ্বুদ্ধ করে, ভক্তিরসে সিঞ্চিত করে তোলার মধ্যেও হয়তো তন্ত্রসাধনাকে উজ্জীবিত করবার পথের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। এই চিন্তাতেই সাধকের চিত্ত আরও ব্যাকুল হয়ে উঠলো। মা-মা রবে শ্মশানভূমি প্রকম্পিত করে তুললেন যোগীবর।—'মা-মাগো! একবার দেখা দাও ছেলেকে। ওগো কৃপাময়ী! কৃপা করো। তোমার রূপময়ী বিগ্রহ কেমন হবে বলে দাও মাগো!' মাতৃভাবনার ব্যাকুলতায় নৈশ বাতাসও যেন উচ্ছ্বাসে শ্মশানের বুকে আছাড় খেয়ে পড়ছিল বিচিত্র শব্দের শিহর জাগিয়ে। সে যাই হোক, অকস্মাৎ নবীন সন্ন্যাসী চমকে উঠেছিলেন, ভয়ও পেয়েছিলেন নিজের কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি শুনে নয়, নীরব নিস্তব্ধ শ্মশানভূমিতে দৈববাণীর মত শ্যামামায়ের কণ্ঠধ্বনি শুনে। হয়তো বা অন্তরের অন্তস্তল হতে উত্থিত আত্মারই বাণী। 'বৎস, বিচলিত হয়ো না। বাংলার তন্ত্রসাধনার মূল ধারাটি আজও অব্যাহতই রয়েছে। তা যে অন্তঃসলিলা তা চিরদিন বীর সাধকদের সাধনার মধ্য দিয়ে এখানে বয়ে চলবে। আজ যে পঙ্কিলতা দেখতে পাচ্ছ, সে তো বহিরঙ্গ। সে পঙ্কিলতা কলুষ কালিমা তুমিই দূর করতে সক্ষম হবে। আমার বরে তন্ত্রশাস্ত্রের পুনরুদ্ধার তুমিই করবে। তুমি আগামীকাল থেকেই আমার বিগ্রহের পূজা শুরু করে দাও। অচিরেই বাংলার ঘরে ঘরে এই বিগ্রহ পূজা প্রচলিত হবে।'

অভিভূত নবীন সাধক ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন,—'মাগো বলে দাও কোন্ রূপে তোমায় পূজা করবো? কোন্ মূর্তি এদেশের মানুষ হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করবে? স্থূল জগতের আরাধ্য বিগ্রহকে স্থূলভাবে আমায় দেখিয়ে দাও—মাগো!'

—'বৎস, তাই হবে। যে মূর্তিতে, আর যে ভঙ্গীতে আমার এই

বিগ্রহের পূজা তোমার দ্বারা প্রচলিত হবে তা মানবদেহের মাধ্যমেই দেখতে পাবে। আগামীকাল প্রভাতে সর্বপ্রথমে যে নারীমূর্তিটি যে রূপ, যে ভঙ্গীতে তুমি দেখতে পাবে তাই হবে আমার ভক্ত, সাধক, সাধারণ মানুষের হৃদয়বিহারিণী মূর্তি। বাংলার ঘরে ঘরে সকলেই আমার সেই মূর্তির আরাধনা করবে।'

আবার রাত্রি প্রভাত হয়। নব উষা। আলোকিত হয়ে ওঠে নবীন সাধকের মনোরাজ্য। চলেছেন গঙ্গাস্নানে। অকস্মাৎ দেখতে পেলেন অপরূপা এক গোপকুমারীকে। অপরূপ ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। দক্ষিণ পদটি কুটিরের অনুচ্চ বারান্দার উপর স্থাপিত। আর বাঁ পাটি রয়েছে মাটিতে। ডান হাতে একতাল গোময়। এমনভাবে উঁচু করে ধরে আছে, মনে হয় যেন হাতের বরাভয় মুদ্রারই এক প্রতিচ্ছবি। বাঁ হাতটি তার কর্মচঞ্চল। ঐ হাত দিয়ে বেড়ার গায়ে দিচ্ছে গোময়ের প্রলেপ। কিশোরীর কেশরাশি ঘন-কৃষ্ণবর্ণ। আলুলায়িত। পরিধানের শাড়ীটি ক্ষুদ্র ও অপরিসর। যোগীবরকে অকস্মাৎ সামনে দেখতে পেয়ে লজ্জায় জিব কেটে অদ্ভুত ভঙ্গিমাতে সে ফিরে দাঁড়ালো।

এতক্ষণ বিস্মিত ও অভিভূত হয়ে দেখছিলেন যোগীবর সেই কিশোরী মেয়েকে, আর ভাবছিলেন শ্যামামায়ের প্রত্যাদেশের কথা। যেন কোটি-চন্দ্র-সুশীতল ও কোটি-সূর্য-সমুজ্জল এক জ্যোতির্ময়ী শ্যামা মাকে মানুষের চোখ দিয়ে নয়নগোচর করছিলেন এত সময় ধরে। শ্যামামায়ের মাতৃরূপিণী বিগ্রহের এ যেন এক জীবন্ত মূর্তি নয়নগোচর করলেন। তারপর মুহূর্তের মত ভাবনায় বিহ্বল মনকে শান্ত করে বিচলিত লজ্জাশীলা কিশোরী মেয়েটির পাশ কাটিয়ে যোগীবর গঙ্গা অভিমুখে আবার যাত্রা করলেন। হৃদয়ঙ্গম করলেন ঐশী নির্দেশেই কিশোরী মেয়েটি ওঁর দৃষ্টির সম্মুখে এসে পড়েছিল। আর এই ভঙ্গিমাতেই শ্যামামায়ের বিগ্রহ তৈরী করতে হবে। ঘট ও যন্ত্রের স্থলে শক্তিরূপিণী মাতৃমূর্তিই যে হবে সাধকের ভাবকল্পনা, পূজা ধ্যান ধারণার মাধ্যম। মাতৃ-আরাধনা মাতৃমূর্তির মাধ্যমেই করতে

হবে সম্পন্ন। শক্তিসাধনার সঙ্গে ভক্তিরসেরও ঘটাতে হবে সংমিশ্রণ। এই চিন্তাতেই বিভোর হয়ে সেদিন গঙ্গাস্নান করেছিলেন যোগীবর। ধ্যানস্থ হয়ে মাতৃমূর্তির বিগ্রহের সম্পূর্ণ ধারণা করে ফেললেন। মৃন্ময়ী মাতৃমূর্তিও ফেললেন গড়ে। মায়ের রূপ হলো ঘোর কৃষ্ণকালো, শরীর বিবস্ত্র, কেশপাশ বিমুক্ত, ত্রিনয়নী, চার হাতে চতুর্ভাবের সমাবেশ। উধ্বর্স্থিত বাম করে উদ্যত খড়্গ, দক্ষিণ করে বরাভয়। নিম্নস্থ বাম করে ছিন্নমুণ্ড, দক্ষিণ করে বরাশীষ, কণ্ঠদেশে নৃমুণ্ডমালা, কটিদেশে নরহস্তের কটিবন্ধ, উন্মুক্ত মুখবিবরে বিকট হাস্য ও বিকশিত দন্তপাটি ও রক্তাক্ত লোলজিহ্বা। মায়ের এক উন্মাদিনী রণরঙ্গিণী মূর্তি যেন বিশ্বসংসার ধ্বংস করতে উদ্যতা। মহাকালী যেন নিদারুণ রোষবশে মহাপ্রলয়ে ব্রতী। মায়ের এই ধ্বংসলীলা বাহ্যদৃষ্টিতে ভয়ঙ্কর বলে মনে হলেও এর মধ্যে রয়েছে স্নেহময়ী জননীর অনন্ত কৃপা ও করুণার মহাভাব। জগজ্জননী প্রয়োজন বশে তাঁরই সৃষ্ট আসুরী শক্তিকে সংহার করে পুনরায় তাদের নিজের বক্ষে, কণ্ঠে ও কটিদেশে স্থান দিচ্ছেন। তাঁর এই ধ্বংস তাই বিনাশ নয়, তা হচ্ছে তাঁর বিচিত্র সংহরণ-লীলা! রক্তাক্ত লোলজিহ্বায় মা সংহরণ করছেন এই বিশ্বচরাচরকে। জিহ্বার দ্বারা তিনি সবকিছু যেন নিজের মধ্যে গ্রাস করছেন। মায়ের হাতে যে উদ্যত খড়্গ, কণ্ঠে নরকপাল, হাতে দানবমুণ্ড, কটিদেশে যে কর-কটিবন্ধ তা তাঁর প্রলয়ঙ্কর ধ্বংসমূর্তিরই পরিজ্ঞাপক। মা এই রুদ্র রূপ নিয়ে জগতের যা কিছু অশিব অকল্যাণ, যা কিছু কুৎসিত কদর্য—তা ধ্বংস করবার জন্য যেন চির-উদ্যতা। একদিকে যিনি দু'হাতে ধ্বংসলীলা সম্পাদন করছেন, অপরদিকে তিনিই আবার অপর দুই হাতে ভীত-সন্ত্রস্ত সন্তানসন্ততিকে বর ও অভয়দানে তৃপ্ত ও পরিতুষ্ট করছেন। এমনই দুই ভাবের সমন্বয়ে মৃন্ময়ী মাতৃমূর্তি গড়ে তুললেন সাধক-প্রবর।

মায়ের উলঙ্গ নগ্নরূপের রহস্য হচ্ছে—যিনি সর্বব্যাপী অসীম অনন্ত, তাঁকে জাগতিক কোন কিছু দিয়েই আচ্ছাদন করা যায় না। সামান্য বস্ত্রখণ্ড দিয়ে অসীমকে আবৃত করার চেষ্টা হাস্যকর ও অসাধ্য।

তাইতো শ্যামা মা হলেন বিবস্ত্রা। মা মুক্তকেশী কারণ তিনি সর্বপ্রকার বন্ধনের অতীত। তিনি যে নিত্যমুক্তা। মায়ের ঊর্ধ্ব চক্ষু হচ্ছে তাঁর সর্বজ্ঞতার পরিচায়ক। তিনি অন্তর্যামীরূপে সবকিছু দেখছেন। তাঁর অজ্ঞাত অজানা কোন কিছুই নেই। তাঁর বর্ণ কালো কারণ যা কিছু অনন্ত অপার, যা আমাদের স্থূল দৃষ্টির অগোচর তাইতো কালো বরণ। কৃষ্ণবর্ণ সেই অনন্ত অসীমেরই দ্যোতক। আর মায়ের পদতলে শায়িত শিব নির্গুণ নিষ্ক্রিয় সেই পরব্রহ্মেরই দ্যোতক। তাঁর স্বরূপে কোন বিকার নাই, কোন ক্রিয়া নাই, কোন স্পন্দন নাই, কোন গুণের বা শক্তির আড়ম্বরপূর্ণ পরিচয় নাই। আপাতঃ-দৃষ্টিতে তিনি শব যেহেতু তিনি নিত্য আত্মসমাহিত। অথচ তাঁরই জীবনজ্যোতিতে বিশ্ব সঞ্জীবিত প্রকাশিত। কোন দেশের সীমার মধ্যে আবদ্ধ নয় বলে তিনি নিরাকার। কোন কালের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয় বলে তিনি মহাকাল। বিশ্বজগতের পরম আত্মা শিব। তাঁকে আশ্রয় করেই দেশের বিস্তার, কালের প্রবাহ, আদিঅন্ত-বিহীন দেশ ও কাল তাঁরই দেশ, কালাতীত অখণ্ড চৈতন্যময় বক্ষস্থলে লীলায়মান। যোগীবর বিশ্বপ্রপঞ্চের বহিরাবরণ ভেদ করে দিব্য দৃষ্টিতে দর্শন করলেন জগৎপ্রবাহকে। মহাকাল শিবের বুকের উপর মহাকালী শিবানীর মহানৃত্য দর্শন করে অভিভূত হলেন। সচ্চিদানন্দ স্বরূপ শিব নিত্য স্বমহিমায় বিরাজমান রয়েছেন আর তাঁরই সচ্চিদানন্দময়ী মহাশক্তি তাঁকে আশ্রয় করে দেশে কালে তাঁকেই বিচিত্র জড়-চেতনাত্মক খণ্ড খণ্ড রূপে প্রকটিত করে, তাঁরই বুকের উপর হেসে খেলে নেচে গেয়ে চলেছেন।

ভক্ত মাতৃসাধকের শুদ্ধ হৃদয়ে বিশ্বপ্রকৃতির অনবগুণ্ঠিতা মূর্তির বিচিত্র চিন্ময় আত্মপ্রকাশ ঘটলো। শক্তিমন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করে কালী-মূর্তির স্বরূপ প্রকাশ করলেন। তারপর তন্ত্রসাধনার সংস্কার সাধনে ব্রতী হলেন। রচনা করলেন 'তন্ত্রসার'* গ্রন্থ। তাঁর শ্যামাপূজার পদ্ধতি রীতি ও মৃন্ময়ী মূর্তি সমগ্র বাংলাদেশ অন্তর দিয়ে গ্রহণ

* 'তন্ত্রসার' সর্বসম্প্রদায়ের জন্য লিখিত একটি সংগ্রহ গ্রন্থ।

করলো। তন্ত্রসাধনার শুষ্ক খাতে প্রবাহিত হলো মাতৃসাধনার উচ্ছলিত রসধারা। ইনিই হলেন আগমশাস্ত্রে সুপণ্ডিত মাতৃসাধক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। নবদ্বীপের আগমেশ্বরীতলা আজও সেই তন্ত্রসিদ্ধ সাধক ও আচার্যের স্মৃতিকে বহন করে সমাসীন রয়েছে। আগমেশ্বরী মন্দিরে কৃষ্ণানন্দ স্থাপিত ঘট আজও বর্তমান আছে।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ। নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজে তখন মহেশ্বর ভট্টাচার্যের প্রবল প্রতিষ্ঠা। মহেশ্বর ভট্টাচার্যের পূর্বপুরুষদের আদি নিবাস ছিল উত্তর বঙ্গে। নবদ্বীপে বসবাস করবার পর হতে তন্ত্রশাস্ত্রে সুপণ্ডিত বলে এই বংশের যশঃসৌরভ দূরদূরান্ত পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। মহেশ্বব ভট্টাচার্যও তন্ত্রবিদ্ ধর্মনিষ্ঠ আচার্য রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। মহেশ্বর পণ্ডিত 'গৌড়াচার্য' উপাধিতে হলেন ভূষিত। মহেশ্বর পণ্ডিত হলেন মহেশ্বর গৌড়াচার্য। আর এই মহেশ্বর গৌড়াচার্যের জ্যেষ্ঠপুত্ররূপে আবির্ভূত হলেন কৃষ্ণানন্দ। নবদ্বীপধামে। নবদ্বীপের আগমেশ্বরীতলার এঁক পবিত্র কুটিরে। প্রায় একই সময়ে প্রেমভক্তি সাধনার মূর্ত প্রকাশরূপে নবদ্বীপেব মাটিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। বিদ্যাচর্চার একই ক্ষেত্রে, সামাজিক পরিবেশে ভবিষ্যতেব দুই মহাপুরুষ মহাসাধক বর্ধিত হতে থাকেন। অবশ্য পরবর্তীকালে দুইটি বিশিষ্ট সাধনার ধারায় প্রবাহিত হয়ে দুইটি মহাজীবন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। জনশ্রুতি আছে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ মহাপ্রভুর* সহপাঠী ছিলেন। প্রভু বাল্যকালে এঁকে ন্যায়েব ফাঁকি জিজ্ঞেস করতেন।

---

* শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু তাঁর লেখা জাতীয় ইতিহাসের 'বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বিবরণ' গ্রন্থে বলছেন, 'এই বংশ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজে কাশ্যপগোত্রীয় মণ্ডলজানীব মৈত্র নামে খ্যাত। ইহাদের পূর্ব বাসস্থান শ্রীধাম নবদ্বীপে আগমেশ্বরীতলাতে ছিল। পরে বংশবৃদ্ধির সাথে সাথে বঙ্গের নানাস্থানে বসতি স্থাপন করেন।*** কৃষ্ণানন্দ, শ্রীচৈতন্য এবং রঘুনাথশিরোমণি একই গুরুর চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করিতেন। কৃষ্ণানন্দের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের প্রথমে হরিহরাত্মা ছিল। যৎকালে শ্রীচৈতন্য সখীভাবে শ্রীকৃষ্ণ ভজনে আকৃষ্ট হন, তদবধি দুজনের মনোমালিন্য আরম্ভ হয়।'

কৃষ্ণানন্দ শ্রীকমলাকান্ত, মুরারি গুপ্তে।
এথা রহি ফাঁকি জিজ্ঞাসয়ে হর্ষচিত্তে ॥

[ভক্তি ১২/২১৮৭]

সাধনার প্রথম জীবনে কৃষ্ণানন্দ ছিলেন কিছুটা উগ্রপন্থী। শক্তি আরাধনার তুলনায় ভক্তি সাধনা তাঁর নিকট অতি তুচ্ছ বলেই মনে হতো। নিজের ইষ্টদেবী শ্যামামায়ের তুলনায় বালগোপালের গুরুত্ব তাঁর কাছে তেমন কিছুই নয়। কিন্তু তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা সহস্রাক্ষ বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি এক সহজাত আকর্ষণ নিয়েই যেন জন্ম-গ্রহণ করেছিলেন। গৃহের একপাশে এক ক্ষুদ্র কুটিরে গোপাল বিগ্রহ স্থাপন করে, তাঁরই পূজা অর্চনা ধ্যান ধারণা নিয়ে দিন অতি-বাহিত করতেন।

সেদিন অমাবস্যা তিথি। গভীর রজনীতে কৃষ্ণানন্দের শ্যামাপূজা অনুষ্ঠিত হবে। গৃহ থেকে কিছুটা দূরে নির্জন স্থানে কৃষ্ণানন্দের সাধন কুটির ও পঞ্চমুণ্ডির আসন। প্রতি অমারজনীতে কৃষ্ণানন্দ মায়ের আদিষ্ট বিগ্রহ গঙ্গামাটি দিয়ে স্বহস্তে নির্মাণ করে পূজা করেন। নিভৃতে পূজা অনুষ্ঠিত হয়। বিগ্রহ জীবন্ত রূপ ধারণ করে ভক্তের সেবা পূজা গ্রহণ করেন। পূজার উপকরণ ও উপচার যেদিন যেমন জোটে তাই দেন। পূজা ও সাধনা সমাপন হলে বিগ্রহ গঙ্গাজলে দেন বিসর্জন। পূজার উপকরণ সংগ্রহের জন্য প্রভাতে গৃহসংলগ্ন

অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সরকার 'তন্ত্রাচার্য্য কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ' প্রবন্ধে লিখছেন, তন্ত্রসার রচয়িতা কৃষ্ণানন্দকে চৈতন্য এবং রঘুনাথ শিরোমণির সহপাঠী জ্ঞান করা সম্ভব নয়। চৈতন্য ১৪৮৬ খৃঃ ১৮ই ফেব্রুয়ারী আবির্ভূত হন এবং ১৫৩৩ খৃঃ ৪৮ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

কৃষ্ণানন্দের 'তন্ত্রসার' গ্রন্থখানি সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রচিত হইয়াছিল। প্রাণতোষণীতন্ত্রের আখ্যাপত্রে লিখিত আছে, এই গ্রন্থখানি কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের বৃদ্ধ প্রপৌত্র রামতোষণ বিদ্যালঙ্কার কর্তৃক রচিত। রামতোষণের 'প্রাণতোষিণী' ১৮২০ খৃঃ রচিত হলে, তদীয় ঊর্ধ্বতন সপ্তমপুরুষ কৃষ্ণানন্দের তন্ত্রসার ঐ সময়ের দেড়শত বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৬৭০ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্তী কোন সময়ে রচিত হইয়াছিল।

উত্থানে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ লক্ষ্য পড়লো এক কাঁদি সুপুষ্ট কলার প্রতি। মনে মনে ভাবলেন কৃষ্ণানন্দ, রাত্রে মায়ের ভোগে কাজে লাগাবেন এবং বিকালের দিকে কাঁদিটি কাটবেন। কিন্তু দিনশেষে বাগানে প্রবেশ করে দেখলেন কলার কাঁদিটি নেই। কে যেন কেটে নিয়ে গেছে। মনে বড় অনুতাপ হলো, সঙ্কল্প করা বস্তুটি মায়ের ভোগে লাগানো গেল না যে!

গৃহে ফিরে শুনলেন, সহস্রাক্ষ ঐ কলা গোপালের ভোগে নিবেদন করেছেন। কিছুই বললেন না ছোট ভাইকে। মনের ব্যথা মনেই চেপে রাখলেন। মধ্যরাত্রে বিষাদমগ্ন মন নিয়েই মায়ের পূজায় বসলেন।

বারে বারে ঐ সুপুষ্ট সুপক্ক কলার কাঁদিটিই স্মৃতিপটে উদিত হতে লাগলো। ধ্যানে বসলেন, ধ্যানও তেমন জমলো না। আনুষ্ঠানিক ভাবে পূজা সমাপন করে কুটির থেকে বের হয়ে এলেন। নির্জন বাগানে ইতস্ততঃ ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ লক্ষ্য পড়লো সহস্রাক্ষের গোপাল বিগ্রহের কুটিরের দিকে। ঘরে আলো। এতরাত্রে গোপালের বিগ্রহের ঘরে আলো এলো কেমন করে? মনে মনে চিন্তা করে অগ্রসর হলেন। বিগ্রহ কুটিরে প্রবেশ করে এক অভাবনীয় দৃশ্য নয়নগোচর করে বিস্ময়ে অভিভূত হলেন কৃষ্ণানন্দ। ভয়ার্তকণ্ঠে কয়েকবার মা-মা উচ্চারণ করেই স্তব্ধ হয়ে গেলেন। যোগীবরের জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হলো। ধ্যানস্থ হলেন।—স্বয়ং শ্যামা মা বালগোপালকে কোলে তুলে নিয়ে একটা একটা করে কলা

ভারতীয় ন্যায়শাস্ত্রের ইতিহাস রচয়িতা সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের মতে, নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণির আবির্ভাবকাল ১৪৭৭ এবং ১৫৪৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। কৃষ্ণানন্দের সহিত চৈতন্য এবং রঘুনাথের বাল্যবন্ধুতামূলক কিম্বদন্তী সত্য হইলে স্বীকার করিতে হয় যে আগমবাগীশ ১৪৮০ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্তী কোন সময় জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে দেহরক্ষা করেন। কিন্তু কৃষ্ণানন্দের 'তন্ত্রসার' গ্রন্থখানি ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দের কিছু পরবর্তীকালে রচিত হইয়াছিল তার প্রমাণ আছে। [প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩৫৪ সন]

খাওয়াচ্ছেন। এই প্রাণস্পর্শী অলৌকিক দৃশ্য নয়নগোচর করে এক নূতনতর সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো তন্ত্রাচার্য কৃষ্ণানন্দের হৃদয়মন্দির। শ্যামা ও শ্যামের পার্থক্যবোধ দূরীভূত হলো চিন্তা থেকে। মনোরাজ্য থেকে। কালী ও কৃষ্ণ যেখানে একাকার সেই উদার সার্বভৌম অনুভূতি লাভ করলেন কৃষ্ণানন্দ। উগ্র তন্ত্রসাধকের অন্তর গোপাল ও কৃষ্ণপ্রেমের ভাবরসে সিঞ্চিত হলো। নূতন এক সরস ভাবরসের মধ্য দিয়ে শক্তি সাধনা বাংলার মাটিতে প্রবাহিত হবার পথের সন্ধান পেল। কৃষ্ণপ্রেম মাতৃপ্রেমে রূপান্তরিত হলো। মাতৃস্তনের দুগ্ধধারার মত মাতৃস্নেহধারা যেন বর্ষিত হলো মাতৃসাধকদের উপর। তাদের দেহ মনে জেগে উঠলো আনন্দের বন্যা। শক্তিসাধনার মধ্যে হলো প্রাণের সঞ্চার। সংস্কার-মুক্ত শক্তিসাধনার নূতন এক পথের ইঙ্গিত দিলেন তন্ত্রাচার্য কৃষ্ণানন্দ। ভবিষ্যতে সেই পথকে অনুসরণ করেই বাংলার মাটিতে শত শত মাতৃসাধক মাতৃসাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন। নব উপলব্ধ সত্যটিকে সঙ্কলিত তন্ত্রশাস্ত্রের গ্রন্থে সন্নিবেশিত করলেন।

নত্বা কৃষ্ণপদদ্বয়ং ব্রহ্মাদিসুর পুজিতম্
গুরুঞ্চ জ্ঞানদাতারং কৃষ্ণানন্দেন ধীমতা।

মৈমনসিংহ জেলার অধিবাসী সুপ্রসিদ্ধ তন্ত্রাচার্য্য পূর্ণানন্দ পরমহংস ১৫৭৭ খৃঃ শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি সংজ্ঞক বিখ্যাত তন্ত্রগ্রন্থ রচনা করেন। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ তদীয় তন্ত্রসারে এই তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থ থেকে কয়েক পঙক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং 'তন্ত্রসার' রচনাকাল ১৬০০ খৃষ্টাব্দের অধিককাল পূর্বে নির্দেশ করা যায় না।

'আগমবাগীশ ভট্টাচার্য্যের কাল নির্ণয়' প্রসঙ্গে শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখছেন,—১৬৭৯ খৃষ্টাব্দের বহু পূর্বেই তন্ত্রসার গ্রন্থ বাংলার সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। সুপ্রাচীন পুঁথির পাঠ মিলাইয়া কৃষ্ণানন্দের রচনা বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া কষ্টসাধ্য ব্যাপার। * * * তন্ত্রসার রচনাকালের অধস্তন সীমা ১৬২৫ খৃষ্টাব্দে নিঃসন্দেহে নির্ণয় করা যায়। * * তন্ত্রসারের রচনা ১৫৮০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে কিছুতেই হয় না। ১৬০০ সনে ধরা যুক্তিযুক্ত। এই কাল নির্ণয় দ্বারা চৈতন্যের সহাধ্যয়নাদি অমূলক প্রবাদ এক কথায়ই নিরস্ত হয়। প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৫৪]

মাতৃসাধক কৃষ্ণানন্দের অধ্যাত্ম-অনুভূতি ধীরে ধীরে গভীর থেকে গভীরতর হয়ে উঠলো। এখন আর তিথি অনুসারে নয়, প্রতি নিশীথে গঙ্গামাটি দিয়ে মাতৃমূর্তি গড়ে পূজা করেন। আনুষ্ঠানিক পূজা নয়, ঠিক যেন জীবন্ত মায়ের পূজা। সন্তানের সম্মুখে মাও আর ভয়ঙ্করী নন। স্নেহময়ী জননী যেন ছেলের কাছে এসে নানা আবদার পালন করছেন। অভিমানী ছেলের কাছ থেকে শুনছেন কত শত অভিমানের কথা। এই ভাবেই প্রতিটি রাত্রি অতিক্রান্ত হয়। সব কিছুই হয় লোকচক্ষুর অন্তরালে। রাত্রি শেষ প্রহরে সকলের অগোচরে ইষ্টবিগ্রহ গঙ্গার জলে বিসর্জন দিয়ে গৃহে ফিরে আসেন।

সে সময় জটাধারী পরমহংস তন্ত্রসাধকদের মধ্যে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। অসামান্য যোগবিভূতির অধিকারী ছিলেন এই মহাপুরুষ। তাঁর সম্বন্ধে নানা অলৌকিক কাহিনী প্রচারিত হয়েছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে। তাইতো গ্রামের লোকেরা বলতো 'জটিয়াযাদু।' এই মহাকৌল সাধক সিদ্ধপুরুষের সাথে অলৌকিক ভাবে যোগাযোগ হয় কৃষ্ণানন্দের। কৃষ্ণানন্দ এই শক্তিধর সাধকের নিকট থেকে লাভ করেন শক্তি ও প্রেরণা।

সেদিন ছিল কার্তিকী অমাবস্যার পুণ্যতিথি। কুটিরের দরজা বন্ধ করে পঞ্চমুণ্ডির আসনে যোগাসীন হলেন কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। পায়সান্ন ও বহু উপচার কালীমূর্তির সম্মুখে রেখেছেন। আনুষ্ঠানিক সবকিছু কাজ করছেন যন্ত্রচালিতের মত। অর্ধবাহ্য অবস্থায় বাষ্পাচ্ছন্ন চোখে দেবীর দিকে তাকিয়ে মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলেন তন্ত্রাচার্য। মন্ত্র চৈতন্যময় হয়ে উঠলো। দিব্যপ্রভায় সমস্ত ঘর উদ্ভাসিত হলো। দেখলেন মৃন্ময়ী মূর্তি চিন্ময়ী হয়ে উঠেছেন। দেবী-মূর্তির মুখে মৃদু মৃদু হাসি। আত্মহারা কৃষ্ণানন্দ ব্যাকুল কণ্ঠে মা-মা বলে চীৎকার করে উঠলেন। অনির্বচনীয় আনন্দে বিভোর হয়ে কিছু সময়ের জন্য ধ্যাননিষ্ঠ হয়ে রইলেন। অনুভব করলেন অন্তরের গভীরে এক আকুলতার পদ্মকোরক এতদিন ধরে যে

আলোকের স্পর্শলাভের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছিল, আজ সেই আলোকলাভ হলো। তার হৃদয়তন্ত্রী কার মধুর স্পর্শে যেন এক সুমধুর তানে বেজে উঠলো। মনের সকল রুদ্ধ দুয়ার খুলে গেল।

নির্গুণ ও সগুণের উপলব্ধি হলো। অনুভূতির উন্নতস্তরে অধিরূঢ় হলেন। অব্যক্তং অচিন্ত্যং অনির্বচনীয়ং অবস্থা। আরও অনুভব করলেন, বিশ্বপ্রপঞ্চের অন্তরালে একই তত্ত্ব বিদ্যমান। মূলে যা এক ও অভিন্ন তাই বিবর্তিত হয়েছে বহুরূপে। অনুভূতির শেষে আবার অবতরণ করলেন দ্বৈতভূমিতে। ভাবাবিষ্ট অবস্থায়ই কোনমতে পূজা সমাপন করে ভোগের পায়সান্ন নিবেদন করে যেই দেবীকে আচমনজল নিবেদন করতে যাবেন, অকস্মাৎ শুনতে পেলেন গুরুগম্ভীর স্বরের কণ্ঠধ্বনি,—'কৃষ্ণানন্দ, দেখছো না মা এখনও ভোগ গ্রহণ করেন নি। এরই মধ্যে কি করে আচমনের জল দিচ্ছো? ভালো করে তাকিয়ে দেখো পুষ্প পত্র নির্মাল্যের ভীড়ে তোমার নিবেদিত পায়সান্ন চাপা পড়ে গেছে। আর মা হাতড়াচ্ছেন।'

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে কৃষ্ণানন্দ দেখলেন, সত্যই তো! মায়ের এখনও খাওয়া হয় নি। নিষ্ঠাভরে আবার ভোগ নিবেদন করে দিলেন। এবং কৌতূহল ও বিস্ময়ে অস্থির হয়ে উঠলো তাঁর মন। এই গভীর নিশীথে অর্গলবদ্ধ গৃহনিভৃতে এ কার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন তিনি! পরমুহূর্তেই পিছন ফিরে দেখলেন, তাঁর বিস্ময়াপ্লুত অন্তরের সকল কৌতূহলকে শান্ত করে দিয়ে দণ্ডায়মান রয়েছেন রক্তাম্বর পরিহিত একজন তন্ত্রাচারী মহাপুরুষ। তেজপুঞ্জ নয়নযুক্ত। মস্তকে জটাজূটশোভিত দীর্ঘ দেহ। সর্ব অঙ্গ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে এক অপূর্ব স্নিগ্ধ সমুজ্জ্বল জ্যোতি।

বিচলিত চোখের দৃষ্টি তুলে জিজ্ঞেস করলেন কৃষ্ণানন্দ,—কে আপনি?

মৃদু হেসে স্নেহার্দ্র কণ্ঠে মহাপুরুষ বললেন,—'বাবা, তোমরা যাকে জটিয়াবাবা বলো, আমিই সেই। তোমার কোনো ভয় নেই। তোমার সাধনার কথা আমার কানে এসেছে। আরও শুনেছি

শ্যামামায়ের তোমার প্রতি বিশেষ কৃপার কথা। তাইতো চুরি করে ঘরে ঢুকে মায়ে-পোয়ের ব্যাপারখানা দেখতে এসেছিলাম। এসে তো বুঝলাম শ্যামামায়ের যাদুতে পড়ে গেছি। তোমার পূজা অনুষ্ঠান মন্ত্র উচ্চারণ আর অন্তরের আকুলতা যত দেখছি ততই যে আমি নয়নজলে ভাসছি। এই তো সত্যিকারের পূজা। এতদিনে একজন প্রকৃত তন্ত্রসাধককে দেখলাম। বাংলার শক্তিসাধনা তোমার ভিতর দিয়েই আবার উজ্জীবিত হয়ে উঠবে এ বিষয়ে আমার আর কোন সন্দেহ নেই। মা যাকে স্বয়ং বরণ করেছেন, তাকে দিয়ে মা-ই সবকিছু করিয়ে নেবেন।'

অপার বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় সেই সৌম্যমূর্তির পায়ে মাথা লুটিয়ে প্রণাম করলেন কৃষ্ণানন্দ। এবং তাঁর অনুরোধে মহাপুরুষ কিছুকাল নবদ্বীপে অবস্থান করলেন। কৃষ্ণানন্দ তাঁর নিকট থেকে শক্তি-সাধনার নানা গূঢ় ও দুরূহ তত্ত্ব শিক্ষা করলেন। অল্পদিনের মধ্যে বাংলার পণ্ডিত ও সাধকসমাজে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ সিদ্ধ যোগীরূপে স্বীকৃতি লাভ করলেন। তাঁর সম্বন্ধে নানা অলৌকিক কাহিনী ও সাধনার যশঃসৌরভ দূরদূরান্ত পর্যন্ত সমগ্র বঙ্গভূমিতে ব্যাপ্ত হয়ে পড়লো। 'তন্ত্রসার' ও 'শ্রীতত্ত্ববোধিনী' গ্রন্থরাজিও সাধক সমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করলো। তাঁর কাছে কৌল সাধনার দীক্ষা নিয়ে শত শত সাধক সাধনজীবনে হলেন উন্নীত।

এবারে কৃষ্ণানন্দ শ্যামাপূজা ও তন্ত্রসাধনাকে শুধুমাত্র যোগী ও পণ্ডিত সমাজে আবদ্ধ না রেখে জনপ্রিয় করে তুলবার জন্য ব্যাকুল হলেন। অল্পদিনের মধ্যে জনজীবনে কালীপূজার অনুষ্ঠানের নূতন এক চেতনা এনে দিলেন। বামাচারী সাধকদের পূজা অনুষ্ঠানের অনাচার ক্লেদ ও সঙ্কীর্ণতা দূরীভূত করে, মাতৃভাবনার বন্যা প্রবাহিত করে দিলেন জনসাধারণের মধ্যে। মাকে ডাকবে, পূজা করবে, মনের দুঃখ বেদনা ও শান্তির কথা জানাবে, তার জন্য অনুষ্ঠানের যেমন প্রয়োজন আছে, সেই সঙ্গে হৃদয়ের দাবীও কম নয়। সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে কালীপূজা প্রচলিত হলো। শহরে গ্রামে

বারোয়ারী তলায় শ্যামামায়ের পূজা শুরু হয়ে গেলো। কৃষ্ণানন্দের তিরোভাবের পরও তাঁর প্রবর্তিত তন্ত্রসাধনার ধারা প্রবাহিত হয়ে চললো বাংলার সুপ্ত শক্তিপীঠগুলির মধ্য দিয়ে। তন্ত্রাচারী সাধকদের মাতৃভাবনার মহাশক্তির আরাধনার মধ্য দিয়ে।

কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ আজ আর নেই কিন্তু সেই সাধকের সাধনার পুণ্যে শাক্তভূমিরূপে একদিন নবদ্বীপ জাগ্রত হয়ে উঠেছিল। সেই নবদ্বীপধাম সাধনভূমি আগমেশ্বরীতলা আর কৃষ্ণানন্দের স্থাপিত ঘট আজও আছে। আজও শত শত পুণ্যার্থীর মেলায় মুখর হয়ে ওঠে আগমেশ্বরীতলার আগমেশ্বরী মন্দিব। সেই তন্ত্র-সাধকের স্মৃতিকে পাঁচশো বছর ধরে শ্রদ্ধা জানিয়ে আসছে বাংলাব বিভিন্ন প্রান্তের মানুষেরা। আর তন্ত্রাচারী সাধকেরা।

সাধক চণ্ডীদাস

চতুর্দশ শতাব্দীতে যখন বাংলার হিন্দুসমাজজীবনে আর ধর্মীয় চিন্তারাজ্যে উপস্থিত হয়েছিল এক মহাদুর্দিন, অপ্রতিহত ভাবে প্রসারলাভ করছিল বিকৃত তান্ত্রিক মত, একশ্রেণীর মানুষ তন্ত্রের পঞ্চম'কারের দোহাই দিয়ে সমাজের চোখে ধর্মের নামে করছিলো অধর্ম সাধন। মদ্যমাংসই হয়ে উঠেছিল দেবীর অর্চনার প্রধান উপকরণ, ইতিমধ্যে হিন্দুধর্ম বৌদ্ধধর্মকে আপনার প্রকৃতিতে এমনভাবে রূপান্তরিত করে নিয়েছিল যে বৌদ্ধধর্মের পৃথক অস্তিত্ব একেবারেই পেয়েছিল লোপ। হিন্দুরা বুদ্ধদেবকে নিজস্ব করে নিয়ে অবতার বলে করেছিলো ঘোষণা। বৌদ্ধ-উৎসবগুলি হিন্দু উৎসবে হয়েছিল পরিণত। একে একে গ্রাম্য দেবদেবীরাও হয়েছিলেন আবির্ভূত। মনসা শীতলা ষষ্ঠী কার্তিকেয় মঙ্গলচণ্ডী শুভচণ্ডী গজলক্ষ্মী বিশালাক্ষী বা বাশুলী দেবী। বাংলার সেই সঙ্কীর্ণ কুসংস্কারপূর্ণ ধর্মীয় ক্রিয়া অনুষ্ঠান সর্বস্বের যুগে সাধারণ মানুষের জীবনে ছিল না শান্তি। নিম্নজাতিগুলির উপর সমাজের উপেক্ষা ও নির্যাতন, অপরদিকে ইসলামের সাম্যের আদর্শ ও শাসক জাতির প্রলোভন উপেক্ষিত জনমানুষের প্রাণে এনে দিয়েছিল ইসলাম ধর্ম গ্রহণের প্রবণতা। সেই মহাদুর্দিনে অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারপূর্ণ গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে আবির্ভূত হলেন চণ্ডীদাস। বীরভূম জেলার নান্নুর গ্রামে।* চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে। চণ্ডীদাসের ভক্তি-

* চণ্ডীদাসের আবির্ভাব কালের কোন নির্দিষ্ট সন বা শকাব্দ পাওয়া যায় না। নানাজনে নানা অভিমত প্রকাশ করেছেন। চণ্ডীদাস চরিত রচয়িতা শ্রীব্রজসুন্দর সান্ন্যালের মতে ১৩৮৬ খৃঃ (১৩০৫ শকাব্দ)। বসুমতীর প্রকাশিত সংস্করণে ১৪১৭ খৃঃ (১৩৩৬ শক), বঙ্গবাসীর প্রকাশিত সংস্করণে ১৪২০ খৃঃ (১৩৩৯ শক), বঙ্গীয় সাহিত্য সেবকের লেখক শ্রীযুত শিবরতন মিত্র মহাশয়ের মতে ১৩৮৩ খৃঃ (১৩০৬ শক)। তবে চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মের বহু পূর্বে যে চণ্ডীদাস জন্মগ্রহণ করেছিলেন বর্তমানে এ বিষয়ে কোনও দ্বিমত নাই। চৈতন্যচরিতামৃতে দেখতে পাওয়া যায় যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চণ্ডীদাসের পদাবলী আগ্রহে ও আনন্দে শুনছেন।

সাধনার প্রভাবে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো বঙ্গভূমির মানুষের মনের আকাশ। আর সিক্ত করে তুললো মনের মাটি। মিটিয়ে দিল জীবনের সকল তত্ত্বকঠিন ভাবনার পিপাসা। অতি প্রাচীনের আর্যঋষি প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম পেল নব ভাব। নব ভাষা। বাঙ্গালীর ধর্মীয় চিন্তারাজ্যে কাব্যে সাহিত্যে হলো নব জাগরণের সূচনা। মানুষের হৃদয়ের ধর্ম প্রেমধর্ম বৈষ্ণবধর্মের বীজ বাংলার মাটিতে বপন করে দিলেন সাধক কবি চণ্ডীদাস। ভবিষ্যতে সেই বীজেরই ফসল হলেন প্রেমের মূর্ত বিগ্রহ দেবমানব চৈতন্যমহাপ্রভু। যিনি একদিন প্রেমধর্মের বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন সমগ্র বঙ্গভূমিকে। বহুদিনের সঞ্চিত অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কারকে দুরীভূত করে দিয়েছিলেন সমাজজীবন থেকে।

পিতা ভবানীচরণ আর মাতা ছিলেন ভৈরবী দেবী। নান্নুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বাশুলীর (বিশালাক্ষীর) কৃপায় পুত্ররত্ন লাভ করেছিলেন বলে পিতা নাম রেখেছিলেন চণ্ডীদাস। চণ্ডীদাসের আর একটি নাম ছিল অনন্ত। 'অনন্ত নামে বড়ু চণ্ডীদাস গাইল দেবী বাসলীগণে॥' পিতা ভবানীচরণ ছিলেন গ্রাম্যদেবী বাশুলীর (বিশালাক্ষীর) পূজক। বিষয়সম্পত্তি অর্থসম্পদ বলতে কিছুই ছিল না। দরিদ্র পিতামাতার স্নেহে যত্নে চণ্ডীদাসের শৈশব ও বাল্যকাল হতে লাগলো অতিবাহিত, কিন্তু চণ্ডীদাস ছিলেন জীবন-দুঃখী। অকস্মাৎ কৃষ্ণবর্ণ মেঘের ছায়া পতিত হলো ছোট্ট এই পরিবারটির উপর। পিতামাতা উভয়েই দেহলীলা সম্বরণ করলেন।

'চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রি দিনে
গায় শুনে পরম আনন্দে॥'

(চৈ. চ. মধ্য/২য়)

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল বলেন,

'জয়দেব বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস
শ্রীকৃষ্ণচরিত্র তারা করিল প্রকাশ।'

অপরিণত বয়সে। অসহায় হলেন বালক চণ্ডীদাস। পিতামাতার মৃত্যু আর অসহায় বেদনার মধ্যেই মহাশূন্যের নিঃসীম আঁধারে শুকতারার মতন একদিন তাঁর অন্তর-আকাশে সহসা দীপ্যমান হয়ে উঠলো আলোর শিখা। যে আলোতে তাঁর সমগ্র অনাগত জীবন একদিন আলোকিত হয়ে উঠেছিল। দিব্যসঙ্গীত! আধ্যাত্মিক প্রেম-সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে!

নান্নুরের মাঠে পত্রের কুটিরে
নিরজন স্থান অতি।
বাশুলী আদেশে চণ্ডীদাস তথা
ভজন করয়ে নিতি॥

* * *

পিতৃমাতৃহীন অনাথ চণ্ডীদাসকে সহৃদয় গ্রামবাসীরা যজ্ঞোপবীত দিয়ে বিশালাক্ষীর পূজক নিযুক্ত করলেন। চণ্ডীদাসও মহানন্দে পূজক বৃত্তি করলেন গ্রহণ। প্রত্যহ স্বহস্তে পুষ্পচয়ন করে রক্তচন্দনে সিক্ত করে ভক্তিভাবে বিশ্বজননী চণ্ডীর পাদপদ্মে করেন অর্পণ। ফুল্লকুসুমদলে প্রত্যহ দেবীবিগ্রহকে করেন সুসজ্জিতা। সে সময়ে মদ্য মাংস ছিল দেবীর পূজার উপচার। চণ্ডীদাসও ছিলেন ঘোর বামাচারী। শাক্ত। তবে সাধনপথের বিশেষ কোনও গণ্ডী স্বীকার করতেন না। ব্যাকুল অন্তরের পূজাকেই প্রকৃত পূজা বলে মনে করতেন। তাই কেউ বলতো পাগল, কেউ বলতো উদভ্রান্ত।

পাগলা চণ্ডী প্রেমানন্দে বিভোর হয়ে অশ্রুসজল চোখে বাশুলী দেবীর পূজা করেন। কোনদিকেই ভ্রূক্ষেপ নেই। নির্লিপ্ত উদাসীন ভাব। ঠিক যেন সরল শিশুটি। পাষাণময়ী বাশুলী দেবীও ভক্ত-হৃদয়ের পূজা পেয়ে হয়ে ওঠেন চৈতন্যময়ী। চিন্ময়ী।

সপ্তাহ মাস শেষ হয়। বছরের পর বছর চলে যায়। আবার আসে নূতন দিন। নূতন বছর। চণ্ডীদাস এখন আর বালক নেই। তরুণ সাধক চণ্ডীদাস। আর একটি নূতন দিন আলোকিত হয়ে ওঠে চণ্ডীদাসের জীবনে। অকস্মাৎ দেখতে পান এক দুখিনী

কিশোরী মেয়ে দাঁড়িয়ে মন্দিরদুয়ারে। কে এই রূপবতী মেয়ে মন্দিরদুয়ারের আলোছায়ায় কাছে ?

রজক-কন্যা রামমণি।

তরুণ তাপস চণ্ডীদাস নিজ হৃদয়ের অনুরাগের অশ্রুবিন্দুকে পূজার ফুলে আর সঙ্গীতে পরিণত করে একদিন কৃষ্ণপদে নিবেদনের পথ পেয়েছিলেন এবং পেয়ে ধন্য হয়েছিল জীবন যে শক্তির প্রেরণায় ইনিই সেই শক্তি। শক্তিময়ী দুঃখিনী রামমণি। সাধক চণ্ডীদাসের প্রেমসাধনায় এই রামমণিই হয়েছিলেন উত্তর-সাধিকা। সাধন-পথের সঙ্গিনীর সাথে আজ তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ। প্রথম পরিচয়। মঞ্জীর নেই রামমণির পায়ে। কিন্তু মঞ্জীরের নিক্কণ যেন শুনতে পাচ্ছেন চণ্ডীদাস তাঁরই হৃদয়ের গভীরে।

নান্নুরের নিকটবর্তী তেহাই গ্রাম থেকে নিরাশ্রয়া কিশোরী মেয়ে ছুটে এসেছে বিশালাক্ষীর মন্দিরের নিরালায় আশ্রয়ের আশায়। ইহসংসারে তার আপন বলতে যে কেউই নেই। জননী ভগিনী ও ভ্রাতাদ্বয়ের অকালমৃত্যুতে উদভ্রান্ত হয়ে পিতৃদেব 'সনাতন রজক' সংসারাশ্রম ত্যাগ করে নিরুদ্দেশের পথে করেছেন যাত্রা। তাইতো অনাথা কিশোরী অন্ন আর আশ্রয় ভিক্ষা চাইছে মন্দিরদুয়ারে এসে। সেই মেয়ের দুঃখে দুঃখিত হয়ে গ্রামবাসীরা বাশুলী দেবীর মন্দির পরিচযার কাজে নিযুক্ত করলেন তাকে। সাধক চণ্ডীদাস হলেন পূজক। আর মন্দিরের পরিচারিকা হলো রজকিনী রামিনী।

অল্প বয়সে দুঃখিনী রামিনী
সেবাতে নিযুক্ত হ'ল।
চণ্ডীদাস কহে শশীকলার ন্যায়
ক্রমে বাড়িতে লাগিল ॥

ক্রমে ক্রমে রামমণি বিশালাক্ষীর মন্দিরের কাজে নিপুণ হয়ে উঠলো। পবিত্রভাবে মন্দিরের সব কাজই সে সুষ্ঠভাবে করতো সম্পন্ন। গ্রামবাসীরাও ভালবাসতো তাকে স্নেহের কন্যার মত।

রামিনী কামিনী কাজেতে নিপুণা
সকলের প্রিয়তমা ॥

*　　　　*　　　　*

কিশোরী রামমণিও আবার একদিন হয়ে উঠলো রূপবতী রমণী। স্তবকিত মেঘমালার মত কমনীয় যার কান্তি। সাধক কবিবর জয়দেবের প্রভাবে আর অপরূপা যৌবনান্বিতা রামিনীর সাহচর্যে ধীরে ধীরে ভাবুক কবি তরুণ সাধক চণ্ডীদাসের অন্তর্জগতে ও চিন্তারাজ্যে শুরু হলো রূপান্তরের। মাতৃসাধক বামাচারী চণ্ডীদাস অকস্মাৎ মধুরভাবের সাধনায় হলেন ব্রতী। কৃষ্ণপ্রেমে ব্যাকুল হলো অন্তর। ইহসংসার সবকিছু কৃষ্ণময় দেখতে লাগলেন। শুনতে পেলেন কৃষ্ণের বাঁশীর সুর। সেই মর্মান্তিক সুর। যে সুর শুনে একদিন কুলবধূ আঁচলে চোখ মুছতো। মর্মে মর্মে প্রবাহিত হতো বিলাপের উচ্ছ্বাস। পথ চলতে চলতে পথিক থমকে দাঁড়াতো। আর পথ যেত ভুলে। কলসীর জল ফেলে কুলবধূ আবার যেত জল আনতে। সেই সুরের মর্মান্তিক করুণা ও বিলাপ শুনে, মায়ের কোলে ছোট্ট শিশুও চাইতো না ঘুমাতে। সেই সুরে যে আছে এক অলৌকিক পরমানন্দের আভাস। অনির্বচনীয় আনন্দে বিভোর, কৃষ্ণপ্রেমে ব্যাকুল অন্তর হতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎসারিত হলো কৃষ্ণলীলাকীর্তন।

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ বান্ধন॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।
দাসী হঞাঁ তার পাত্র নিশিবোঁ আপনা॥

কালিন্দী নদীর কূলে গোকুলের মাঠে অবিরত যে বংশীধ্বনি হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তা গোলক অভিমুখে আকর্ষণ করছে। সেই বাঁশীর স্বরের নিকট সকল তত্ত্বকথা শাস্ত্রকথা মিলিয়ে যায়। বড়ু চণ্ডীদাস

বাঙ্গালী জাতিকে শোনালেন দূরাগত সেই কৃষ্ণের বাঁশীর প্রতিধ্বনি। রচনা করলেন * 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। রাধাকৃষ্ণ লীলানাট্য। 'গীত-গোবিন্দের' অনুসরণে। পরাণ,কানুর পদছায়া কামনা-করেই জন্ম নিল বঙ্গের আদিকবি চণ্ডীদাস। সুখে দুখে ধর্মে কর্মে আনন্দ উৎসবে বাঙ্গালীর ঘরের চিত্র উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠলো চণ্ডীদাসের কীর্তন ও পদাবলী সঙ্গীতে। কৃষ্ণ বিরহিণী রাধার করুণ মর্মস্পর্শী হ হাকারের মধ্যে কবিবরের গভীর অনুভূতিশীল সমবেদনাপূর্ণ মনোভাবটিও হয়ে উঠলো পরিস্ফুট।

ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছয়ে যে জন
কেহ না দেখয়ে তারে।
প্রেমের পিরীতি যে জন জানয়ে
সেই সে পাইতে পারে॥

শয়নে স্বপনে ঘুমে জাগরণে
কভু না পাসরি তোমা।
তুয়া পদাশ্রিত করিয়ে মিনতি
সকলি করিবা ক্ষমা॥
গলায় বসন আর নিবেদন
বলি যে তুঁহারি ঠাঁই।

* 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' গ্রন্থের রচনাকাল সম্বন্ধে নানা পণ্ডিতের নানা মত। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন ১৪০০ খৃঃ হতে ১৪৫০ খৃঃ। শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন ১৩৮৫ খৃষ্টাব্দের পূর্বে। 'বোধিচর্যাবতার' 'ধর্মরত্ন' গ্রন্থেরও পূর্বে কৃষ্ণকীর্তন রচিত। প্রাচীন অক্ষরসমূহ প্রাচীনতর। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথি বাংলা ভাষায় রচিত সর্বাপেক্ষা প্রাচীন পুঁথি। শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের ভূমিকায় লিখেছেন, 'কৃষ্ণকীর্তনের' চণ্ডীদাসই যে খাঁটি চণ্ডীদাস তাহা অস্বীকারের হেতু নাই।' শ্রীদীনেশচন্দ্র সেনও মনে করেন, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও পদাবলী একই চণ্ডীদাসের লেখনী-নিঃসৃত।' আবার অনেকে মনে করেন চণ্ডীদাস অপ্রাপ্ত বয়সে কৃষ্ণকীর্তন রচনা করেন এবং পরিণত বয়সেই রচনা করেন পদাবলী।

চণ্ডীদাস ভণে ও রাঙ্গা চরণে
দয়া না ছাড়িও রাই ॥

* * *

দেহ রতি ক্ষয় কুপত রতি হয়
সাধক সাধন পাকে
চণ্ডীদাসে কয় বিনা দুঃখে নয়
কিশোরী চরণ দেখে ॥

সাধক জীবনের রূপান্তর প্রসঙ্গে চণ্ডীদাসের বক্তব্য হলো, বাঁকুড়া জেলার গঙ্গাজলঘাটি থানার অন্তর্গত শালতোড়া গ্রামের নিত্যাদেবীর আদেশে তাঁর সহচরী ডাকিনী বাশুলী নান্নুর গ্রামে এসে ঘুমন্ত অবস্থায় ওঁর পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করলেন। কি পুণ্য পবিত্র মধুরতাময় ছিল সে স্পর্শ। সেই অপ্রাকৃত স্পর্শে ওঁর মানসপট হতে যেন একটা ঘন কৃষ্ণবর্ণ আবরণ অপসারিত হলো। দেহ মন ভূমানন্দে ভরে গেল। হয়ে উঠলো যেন সুধাসরস। অমল কোমল প্রেমের অনুভূতির আস্বাদন লাভ করলেন। যেন ভক্তি ও প্রেমের মহা-সমুদ্রে অবগাহন করে উঠলেন। তাঁর মন আনন্দ বেদনা মিলন বিরহ সুখ দুঃখ হাসি অশ্রু এসবের অতীত একটা অতীন্দ্রিয় ভাব-লোকে চলে গেল। 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া' সুখ-দুঃখাতীত একটা আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে রইলেন। নূতন ভাব নূতন দৃষ্টি লাভ করে মধুর রসের সাধনায় নিমগ্ন হলেন। আর এই প্রেম-সাধনার মধ্য দিয়েই গভীর অন্তর্দৃষ্টি লাভ করলেন চণ্ডীদাস।

শালতোড়া গ্রাম অতি পীঠস্থান
নিত্যের আলয় যথা
ডাকিনী বাশুলী নিত্য সহচরী
বসতি করয়ে তথা ॥
চণ্ডীদাস কহে সে এক বাশুলী
প্রেম প্রচারের গুরু।

তাহারি চাপড়ে নিদ্রা ভাঙিল
পিরীতি হইল সুরু ॥
* * *
নিত্যের আদেশে বাশুলী চলিল
সহজ জানাবার তরে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে নান্নুর গ্রামেতে
প্রবেশ যাইয়া করে ॥
বাশুলী আসিয়া চাপড় মারিয়া
চণ্ডীদাসে কিছু কয়।
সহজ ভজন করহ যাজন
ইহা ছাড়া কিছু নয় ॥
ছাড়ি জপ তপ করহ আরোপ
একতা করিয়া মনে।
যাহা কহি আমি তাহা শুন তুমি
শুনহ চৌষট্টি সনে ॥
* * *
রতি পরকিয়া যাহারে কহিয়া
সেই সে আরোপ সার।
ভজন তোমারি রজক ঝিয়ারি
রামিণী নাম যাহার ॥

বাশুলী দেবী কর্তৃক চণ্ডীদাস পরকীয়া ভজন, ব্রজভাবানুসারে ভজন, প্রেম উপাসনায় আদিষ্ট হলেন। আর রজকিনী রামিনী হবেন তাঁর উত্তরসাধিকা। বাশুলীর কথা শুনে ভাবুক সাধক চণ্ডীদাস প্রেমে মূর্ছিত হলেন।

চণ্ডীদাস প্রেমে মূর্ছিত হইল।
বাশুলী চলিয়া নিত্যেতে গেল ॥

ভাবাপ্লুত হৃদয়ে চণ্ডীদাস বললেন রামমণিকে
এক নিবেদন করি পুনঃ পুনঃ
শুন রজকিনী রামী।

যুগল চরণ শীতল দেখিয়া
শরণ লইলাম আমি ॥
রজকিনী রূপ কিশোরী স্বরূপ
কাম গন্ধ নাহি তায়।
না দেখিলে মন করে উচাটন
দেখিলে পরাণ জুড়ায় ॥
ভেবে দেখ মনে এ তিন ভুবনে
কে আছে আমার আর।
বাশুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে
ধোপানী চরণ সার ॥

চণ্ডীদাসের কথা শুনে আশ্চর্যান্বিত হলো রামমণি। সেও যে বাশুলীর নিকট থেকে আদেশ প্রাপ্ত হয়েছে। বাশুলী বলছেন রামীকে—

চণ্ডীদাস নামে আছে একজন
তাহারে আরোপ কর।
অবশ্য করিলে নিত্যধাম পাবে
আমার বচন ধর ॥

ভোরের আলো ছল ছল করছে সরোবরের জলে। স্নান করে উঠতেই একটি সুন্দর পদ্মকোরক জলে ভেসে যেতে দেখলেন চণ্ডীদাস। তুলে নিয়ে চলে এলেন মন্দিরে। মুগ্ধ চিত্তে দিলেন বিশালাক্ষীর চরণকমলে। পরমুহূর্তেই অভিভূত হয়ে দেখলেন শিলাময়ী দেবী জীবন্ত। ভাবমগ্ন চণ্ডীদাস মানুষের কণ্ঠস্বরের মত যেন শুনতে পেলেন দেবী ভগবতী বিশালাক্ষী বলছেন—

—ও ফুল আমার মাথায় দিও না।

মোহাচ্ছন্নের মত চণ্ডীদাস জিজ্ঞেস করলেন, কেন মাগো ?

—ও ফুলে আমার গুরুর অর্চনা হয়েছে।

—মাগো, যোগী ঋষিরা যুগে যুগে কত যজ্ঞ ব্রত করেছে শুধু

তোমার দর্শন অভিলাষে। তুমিই তো সকলের গুরু। তোমার আবার গুরু কে?

—বৈকুণ্ঠপতি শ্রীগোবিন্দ।

আনন্দে আত্মহারা হয়ে চণ্ডীদাস বললেন, তিনি যদি তোমার পূজ্য হন, আমিও তাঁকে পূজা করবো মাগো!

'তথাস্তু' বলে বিশালাক্ষী চণ্ডীদাসকে চতুরাক্ষর রাধাকৃষ্ণ মহামন্ত্র দান করলেন।

বামাচার শাক্ত চণ্ডীদাস বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে বৈষ্ণব সাধকে রূপান্তরিত হলেন। রামমণিকেও বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষা দান করে বললেন চণ্ডীদাস, 'মহামন্ত্র চতুরাক্ষর 'রাধাকৃষ্ণ' নিয়ত ধ্যান কর, তোমার বিঘ্ন বিপত্তি দূর হবে।'

রাধাভাবে বিভোর হয়ে কৃষ্ণ চিন্তায় আকুল হলো চণ্ডীদাসের প্রাণ। দেহ মন আত্মা। সুমধুর স্বরে কৃষ্ণকীর্তন করতে লাগলেন। নির্লিপ্ত রসিক ভক্ত সাধক চণ্ডীদাস দিবারাত্র প্রেমমন্ত্র জপ করতে করতে রাধাকৃষ্ণ লীলা চিন্তায় বিভোর হলেন। তাঁর অন্তরের সে সুর চিরন্তন প্রেমলোক স্পর্শ করে দেশ কাল পাত্রের সীমা অতিক্রম করে চিরকালের তরে শাশ্বত হয়ে রইলো। হৃদয়ের গভীরের সেই বার্তা শুনালেন রামমণিকে। বাঙ্গালীকে। বিশ্ববাসীকে। সৃষ্টি করলেন শ্রীরাধাকে। অভিসার পথের চঞ্চলময়ী অভিযাত্রিনী নয়, সর্বত্যাগিনী নৈসর্গিক প্রেমের পূজারিণী শ্রীরাধিকা। শুচি-শুভ্র পূত-নম্র মাধুর্যময়ী যেন একটি শ্বেত শতদল। রস-সরস্বতী। মনে হয় এর প্রতিটি পাপড়ি যেন সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনায় সিঞ্চিত, অথচ অনুভূতি দ্বারা স্পর্শ করা যায় না। এ কমলের প্রিয় মিলনেও যেন দুঃখ, সুখেও সংশয়।—'দুঁহু ক্রোড়ে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।' একটা অনির্দেশ্য বিবশ ব্যাকুলতা। একটা আর্তি চিরন্তন বিরহের হাহাকার। মিলনে তাঁর সম্ভোগের বাসনা নাই। সম্ভোগ তৃষ্ণা-বিহীন। শুধু মিলনোচ্ছ্বাসের একটা নৈসর্গিক ভাব উচ্ছ্বসিত। তিনি আত্মহারা হয়ে বলেন—

বঁধূ কি আর বলিব আমি।
জনমে জনমে জীবনে মরণে প্রাণবঁধূ হইও তুমি॥
তোমার চরণে আমার পরাণে বাঁধিনু প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া একমন হইয়া নিশ্চয় হইলাম দাসী॥
এ কুলে ও কুলে দুকুলে গোকুলে আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইনু ও দুটি কমল পায়॥

বিরহেও তিনি অবিচল প্রিয়তমের পায়ে সুমধুর আত্মসমর্পণ। প্রেমতন্ময়। তিনি যোগিনী সেজেছেন।

নিজ কায়া পর রাখিয়া কপোল মহাযোগিনীর পারা।
ও দুটি নয়নে বহিছে সঘনে শ্রাবণ মেঘেরি ধারা॥

সর্বক্ষণ শ্যাম নাম জপ করেন।—'শ্যামমন্ত্রমালা বিনোদিনী রাধা জপিতে জপিতে চায়।' যেন নৈসর্গিক প্রেমসাধিকা হৃদয়ে অনুরাগ হোমবহ্নি জ্বালিয়ে শ্যামসূর্যের পানে চেয়ে কঠোর তপস্যায় নিমগ্না। শ্রীরাধিকা নয়, রামমণি। চণ্ডীদাসের সাধন সঙ্গিনী রজকিনী রামিনী। চণ্ডীদাসের হৃদয়ের রামিনীই শ্রীরাধিকার মূর্ত বিগ্রহ রূপে প্রকাশিত হয়েছেন। প্রেম-সাধনার বলে চণ্ডীদাস প্রকৃতই অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছিলেন। তাঁর প্রেমে রূপ পিপাসা ছিল না। কঠোর আত্মসংযমে ও ভোগ-বাসনার দমনে কৃতকার্য হয়েছিলেন। তাইতো সাধারণের মতামত, কটাক্ষ, কলঙ্কলেপন তাঁকে বিচলিত করতে পারেনি। সাধারণে চণ্ডীদাসের প্রেম বুঝলো না। তারা চণ্ডীদাসের নামে অপবাদ ঘোষণা করলো। গ্রামে গ্রামে। দেশে দেশে।

পিরীতি করিল জগতে ভাসিল
ধোপানী দ্বিজের সনে।
জগতে জানিল কলঙ্ক ভাসিল
কানাকানি লোক জনে॥

প্রেম মন্ত্র জপিতে জপিতে
ধীরে ধীরে চলে চণ্ডী রামীর পশ্চাতে॥

পাগল হইল হায় দ্বিজ চণ্ডীদাস
যেই দেখে সেই বলে করি উপহাস ॥

এবারে সমাজের ক্ষমতাবানেরা চণ্ডীদাসকে সমাজচ্যুত করলেন। ফলে চণ্ডীদাস বিশালাক্ষীর সেবাকার্য হতেও বিদুরিত হলেন। চণ্ডীদাস জীবনে কোনদিনই সৌভাগ্যশালী ছিলেন না। আরও কঠিনতম পরীক্ষার সম্মুখীন হলেন। একদিকে সাধন সঙ্গিনী রজকিনী রামিনীর প্রেম, অপরদিকে সমাজের কঠোর শাসন। প্রেমিক সাধক চণ্ডীদাস সমাজ শাসন উপেক্ষা করে গ্রামের প্রান্তে রজকিনী-আলয়ে বাশুলী দেবী কর্তৃক প্রদত্ত মন্ত্রের সাধন করতে লাগলেন। অন্তরের বেদনাকে অপূর্ণতাকে রূপায়িত করে তুললেন সঙ্গীতে। কীর্তনে। পদাবলী সাহিত্যে।

বিশ্বের 'চির-বিরহিণী নারী'র অন্তরের বেদনা পূর্ণের সঙ্গে মিলনের জন্য যে তৃষ্ণা, চিরজাগ্রত পিপাসা, আকুতি ব্যাকুলতা দেশ কালের সীমা অতিক্রম কবে ধ্বনিত হয়ে উঠলো। শ্রীরাধিকার প্রেমসাধনা অসীম বিবহাবেগে বিবশ ব্যাকুলা। ধ্যান নিমগ্না। প্রিয়তমের ভাবে আত্মহারা, কঠোর যোগিনী অথচ করুণাময়ী। মহিমময়ী। সুখদুঃখাতীত সাধক কবি চণ্ডীদাস বিশ্বের চিরবিরহিণী নারী রূপে সৃষ্টি করলেন রাইকে। শ্রীরাধাকে।

পিরিতি পিরিতি কি রীতি মূরতি হৃদয়ে লাগল সে।
পরাণ ছাড়িলে পিরিতি না ছাড়ে পিরিতি গড়ল কে ॥
পিরিতি বলিয়া এ তিন আখর না জানি আছিল কোথা।
পিরিতি কণ্টক হিয়ায় ফুটল পরাণ পুতলি যথা ॥

* * *

কিন্তু এই মহান স্রষ্টা সাধক কবি চণ্ডীদাসের জীবনে সমাজপতিরা ডেকে আনলেন এক নির্মম সংকট। শুধুমাত্র সমাজচ্যুত করেই ক্ষান্ত হলেন না, কলঙ্ক রটনা করে গ্রামের বাতাসকে করে তুললেন কলুষিত। হৃদয়হীন মূঢ় পৌরুষের শ্বাপদ হিংস্র আবেগে যেন ঝাঁপিয়ে পড়লো চণ্ডীদাসের সাধনার জীবনের উপর। তাঁর সেই

গভীর অনুভূতিপূর্ণ দিব্য প্রেম চিন্তাকে চূর্ণ করবে বলে। সেই সংকট থেকে মুক্তির পথ চিন্তা করতে গিয়ে চণ্ডীদাস পীড়ার ভান করলেন। অনশনে রইলেন নিজ পর্ণকুটীরে। শালগ্রামশীলা সহ। কিন্তু জল জল চীৎকার করেও প্রতিবেশীর নিকট থেকে জল পেলেন না। রামমণিও ক'দিন আসে না। এইভাবে একদিন দুইদিন অতিবাহিত হলো। তৃতীয় দিনে চণ্ডীদাসের আর কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে, প্রতিবেশীরা কৌতুহলী হয়ে তাঁর কুটিরে উঁকি দিলেন। হঠাৎ চমকে উঠলেন তাঁরা।

—একি? এ কেমন করে সম্ভব? একি সত্য?

দেখলেন চণ্ডীদাস মৃত অবস্থায় শায়িত। তার চেয়েও সর্বনাশের ব্যাপার হলো তিন দিন ধরে শালগ্রামশীলা উপবাসী রয়েছে। গ্রামের যে অমঙ্গল হবে। এখন উপায়! উদ্বিগ্ন হয়ে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে এ ওঁর মুখের দিকে তাকালেন। তারপর ছুটলেন বিধান নেবার জন্য সমাজপতি বিজয়নারায়ণ চক্রবর্তীর কাছে। অনেক চিন্তাভাবনা করে বিজয়নারায়ণ বললেন,—চণ্ডীদাস পতিত হলেও এখন ব্রাহ্মণেরাই ওর সৎকার সাধন করবেন। তাহলেই গ্রামের মঙ্গল। অবশেষে ব্রাহ্মণেরাই সমাজপতির নির্দেশে চণ্ডীদাসের শব নিয়ে এলেন শ্মশানে।

অকস্মাৎ চণ্ডীদাসের মৃত্যুসংবাদ শুনে আর্তনাদ করে ওঠে রামমণি। পাগলিনীর মত ছুটে আসে শ্মশানে। বলে,—ওগো শোনো। চলে যেও না একাকী আমাকে ফেলে। একদিন তুমি আমার মুখের হাসিতে জাত দেখতে পাওনি, আজ দেখে যাও আমার চোখের জলেও জাত নেই। আর যদি যেতেই হয় আমাকে সঙ্গে নিয়ে চল নাথ।

পিরীতি জ্বালিয়া যদি বা সইবা
কবে বা আসিবে নাথ।
রামীর বচন করহ পালন
দাসীরে করহ সাথ॥
চণ্ডীদাস বিনা জগৎ দেখি অন্ধকার।

চঞ্চল হয়ে ওঠে চণ্ডীদাসের মন। ধীরে ধীরে উঠে বসলেন চিতার উপর। ভয় পেয়ে পালিয়ে গেলেন প্রতিবেশীরা। প্রচার করলেন চণ্ডীদাস ব্রহ্মদৈত্য হয়ে গেছে। আর সেই শ্মশানভূমিতে নিরাপদ হয়ে দুটি পবিত্র জীবনের আকাঙ্ক্ষা নব পল্লবে হয়ে উঠলো পল্লবিত। সেই রাত্রিতেই স্বপ্ন দেখলেন সমাজপতি বিজয়নারায়ণ চক্রবর্তী। বাশুলী দেবী বলছেন, 'আমার সেবক চণ্ডীদাস, তোমাদের অত্যাচারে বড়ই উৎপীড়িত হয়েছে, এবার তোমাদের শাস্তিবিধান করবো।'

ভীত হলেন সমাজপতি। গ্রামবাসীদের জানিয়ে দিলেন স্বপ্নবৃত্তান্ত। কলঙ্ক প্রচার বন্ধ হলো। চণ্ডীদাসও নিরাপদ হয়ে মধুর রসের সাধনায় গভীরভাবে নিমগ্ন হলেন। গ্রামবাসীরা এবার ভিন্ন এক দৃষ্টিতে দেখলো চণ্ডীদাসকে। কুলভ্রষ্ট পাগলা চণ্ডীদাস নয়, বাশুলীর সাধক ভক্তকবি চণ্ডীদাসরূপে। ধীরে ধীরে গ্রামবাসীরা চণ্ডীদাসের পবিত্র প্রেমের পরিচয় পেয়ে ধন্য হলো। শিষ্য ভক্ত হলো অনেকে। সমাজপতি বিজয়নারায়ণ বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে চণ্ডীদাসের শিষ্য হলেন। ক্রমে ক্রমে চণ্ডীদাসের দিব্য ভাবের প্রভাবে শাক্তভূমি বৈষ্ণব সাধনার ক্ষেত্রে হলো রূপান্তরিত। চণ্ডীদাস বাংলার মাটিতে বৈষ্ণব ধর্মের বীজ বপন করলেন। কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ অনুরাগের কথা বাংলা ভাষায় প্রথম শোনালেন বাঙ্গালী জাতিকে। কৃষ্ণকীর্তন, পদাবলী সঙ্গীত ভক্ত গায়কের কণ্ঠে কণ্ঠে গীত হতে লাগল। রামমণি নয় শ্রীরাধারাণী শুধুমাত্র কৃষ্ণ নাম শ্রবণেই প্রেমে মাতোয়ারা হয়েছেন। বলছেন—

সই! কেবা শুনাইল শ্যাম নাম?
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে॥

এবারে কৃষ্ণমূর্তি দর্শন করে রাধার হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার হলো। রাধা বলছেন—

চাহি ছাড়াইতে ছাড়া নাহি চিতে
এখন করিব কি ?

এবার সাক্ষাৎ দর্শন লাভ হয়েছে। সে রূপ দেখে কি কেউ স্থির থাকতে পারে ?

হেরিয়া সেই মুরতি সতী ছাড়ে নিজ পতি
তেয়াগিয়া লাজ ভয় মান।

শ্রীমতী রাধার বড় দায় হলো, বিস্মৃতির অতল জলে কৃষ্ণনাম নিক্ষেপ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। কিন্তু—

পাসরিতে করি মনে পাসরা না যায় গো
কি করিব কি হবে উপায় ?

আর কি উপায় আছে ? তন্ময়তা যোগের বীজ আজ শ্রীমতীর হৃদয়ে অঙ্কুরিত হলো। শয়নে স্বপনে আহারে বিহারে কৃষ্ণ চিন্তাই তাঁর যে একমাত্র সম্বল হলো।

রাধার কি হলো অন্তরে ব্যথা
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহার কথা।

কৃষ্ণচন্দ্রের হাসিমাখা মুখখানি মনে পড়লে হৃদয় ফাটিয়া যায়

তাহার আরতি কিবা দিবা রাতি
ভুলিতে নাহিক পারি।
মনে হলে মুখ ফাটে মোর বুক
গুমরে গুমরে মরি॥

আবার ব্রজরাজকে সব কিছু সমর্পণ করে বলছেন,

এ তিল তুলসী তোমার চরণে
সঁপিয়াছি জাতি কুল

তোমা বিনে আর কে আছে আমার
তুমি সবাকার মূল ॥
তুয়া বিনে আন নাহি কোন জন
আর বা বলিব কেহ।
জনমে জনমে জীবনে মরণে
দিয়াছি আপন দেহ ॥

প্রেমময়ী রাধা এখন কৃষ্ণময়ী। তিনি কখন শ্রীকৃষ্ণকে কখন নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছেন। আবার কখন সহচরীকে সর্তক করে দিচ্ছেন। নিজের প্রতি লক্ষ্য নাই। কিন্তু যদি কেহ শ্যামের নিন্দা করে তবে তা সহ্য হয় না।

শ্যাম নাগর তোমায় পাড়ে গালি
এ দুখে পাজর হৈল কাল।
ভাবিয়া দেখিনু এবে মরণ ভাল ॥

আবার সখীব প্রতি অনুযোগ করে বলছেন,

মুঞিত অবলা হৃদয় অখলা
ভালমন্দ নাহি জানি।
বিরলে বসিয়া চিত্রেতে লিখিয়া
বিশাখা দেখালে আনি ॥

পরমুহূর্তেই কৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করে বলছেন—

তোমার প্রেমে বন্দী হৈলাম শুন বিনোদ রায়।
তোমা বিনে মোর চিতে কিছুই না ভায় ॥
শয়নে স্বপনে আমি তোমার রূপ দেখি।
ভরমে তোমার রূপ ধরণীতে লিখি ॥
গুরুজন মাঝে যদি থাকয়ে বসিয়া।
পরসঙ্গে নাম শুনি দরবয়ে হিয়া ॥

আবার বলছেন—

ভাবিতে গনিতে তনু হৈল অতি ক্ষীণ।
জগতে কলঙ্ক রহিল চিরদিন ॥

তোমার সনে প্রেম করি কি কাজ করিনু
মৈলাম লাজে মিছা কাজে দগধি হইনু ॥'

*

সুধার সমুদ্র সম্মুখে দেখিয়া
আইনু আপন সুখে।
কে জানে খাইলে গরল হইবে
পাইবে এতেক দুখে ॥
সো যদি জানিতাম আলাপ ইঙ্গিতে
তবে কি এমন করি।
জাতি কুল শীল মজিল সকল
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি ॥

আবার সখীকে সম্বোধন করে বলছেন—

সজনি লো সই।
ক্ষণেক বৈসহ শ্যামের বাঁশরী কথা কই।

কৃষ্ণকথা বলতে বলতে কৃষ্ণপ্রেমে উদাসীনা হয়ে সখীদের বলছেন—

ফিরি ঘরে যাও নিজ ধরম লইয়া।
দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া ॥
কাল মানিকের মালা গাঁথি নিব গলে।
কানু গুণ যশ কানে পরিব কুণ্ডলে ॥
কানু অনুরাগ রাঙ্গা বসন পরিব।
কানুর কলঙ্ক ছাই অঙ্গেতে লেপিব ॥

* * *

প্রেম পূজারী চণ্ডীদাস প্রেমের গগনস্পর্শী সুবর্ণ দেউলে জীবন-দেবতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলেন। তাঁর প্রেম মন্দিরের চূড়া মরজগতের ধূলি মাটি ছেড়ে ঊর্ধ্বে স্বর্গভূমি স্পর্শ করলো। ক্রমে ক্রমে চণ্ডী-দাসের যশঃসৌরভ বঙ্গভূমি অতিক্রম করে মিথিলায় পৌঁছল। পঞ্চ গৌরেশ্বর শিবসিংহের প্রিয় সভাসদ পণ্ডিত ও কবি বিদ্যাপতি

শুনলেন চণ্ডীদাস নাম। আর তাঁর প্রতিভার কথা। সাধনার কথা। সাক্ষাৎলাভের জন্য ব্যাকুল হলো তাঁর অন্তর।

সুযোগও একদিন এসে পৌঁছলো। মহারাজা শিবসিংহ কার্যোপলক্ষে বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট গ্রামে আসবার বন্দোবস্ত করতে লাগলেন। বিদ্যাপতি এ সুযোগ ছাড়লেন না। মহারাজের সঙ্গ নিলেন। যথাসময়ে মঙ্গলকোট এসে রূপনারায়ণ নামে এক ব্যক্তিকে পথপ্রদর্শক রূপে সঙ্গে নিয়ে চণ্ডীদাসের গ্রাম অভিমুখে করলেন যাত্রা। অপর দিকে চণ্ডীদাসও বিদ্যাপতির আগমন সংবাদ শুনে মঙ্গলকোট অভিমুখে হলেন রওনা।

চণ্ডীদাস শুনি বিদ্যাপতি গুণ
দরশনে ভেল অনুরাগ
বিদ্যাপতি তব চণ্ডীদাস গুণ
দরশনে ভেল অনুরাগ॥
দুহুঁ উৎকণ্ঠিত ভেল।
সঙ্গহি রূপনারায়ণ কেবল বিদ্যাপতি চলি গেল॥
চণ্ডীদাস তব রহই না পারই চললহি দরশন লাগি।

অবশেষে পথিমধ্যে* সুরধনী তটে বটবৃক্ষতলে উভয়ের মিলন হলো। বাংলার আদি কবি বৈষ্ণব সাধক চণ্ডীদাসের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হলো মিথিলার বৈষ্ণব কবিকুলচূড়ামণি বিদ্যাপতির। উচ্ছ্বাসে আত্মহারা হলেন। উভয়ে 'দুহুঁ আলিঙ্গন করল তখন ভাষল প্রেম তরঙ্গে।'

সময় বসন্ত, যাম দিন মাঝ হি বটতলে সুরধনী তীরে
চণ্ডীদাস কবি, রঞ্জনে মিলিল পুলকে কলেবর গীর॥
দুহুঁ জন ধৈরজ-ধরই না পার।
সঙ্গহি রূপনারায়ণ কেবল দুহুক অবশ প্রতিকার॥

* বর্তমানে মঙ্গলকোট থেকে নান্নুর যেতে হলে পথিমধ্যে অজয় নদ পাওয়া যায়। বোধ হয় ভাগীরথীর পূর্ব গতির পরিবর্তন হয়েছে।

অবশেষে স্নানাদি সমাপন করে উভয়েই যাত্রা করলেন নান্নুর অভিমুখে। নান্নুরে এসে বিদ্যাপতি দর্শন করলেন চণ্ডীদাসের সাধন ক্ষেত্র বিশালাক্ষীর মন্দির আর মিলিত হলেন প্রেম সাধনার নায়িকা রামমণির সঙ্গে।

পরমানন্দে কিছুদিন অতিবাহিত করে বিদ্যাপতি ফিরে গেলেন মিথিলায়। আর চণ্ডীদাস সুস্বর মুখর করে তুললেন বঙ্গভূমির গীতি-কুঞ্জ। কীর্তনের দল তৈরী করে গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে কৃষ্ণকীর্তন আর পদাবলী সঙ্গীত করতে লাগলেন। বহুদূরের জনপদ থেকে ছুটে আসতো কৃষ্ণনাম পিপাসী মানুষ। শুনেছে সকলেই সুধা আছে চণ্ডীদাসের কণ্ঠস্বরে এবং ঐ কণ্ঠের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আর পদাবলী সঙ্গীত একবার না শুনলে তৃপ্ত হবে না পিপাসা। সান্ত্বনা লাভের আশায় শোকার্ত এসে দাঁড়াত চণ্ডীদাসের গানের আসরে। শুনতো গান এবং তারপরেই চোখ মুছে ফিরে যেত ঘরে।

রাসলীলা বর্ণনায় চণ্ডীদাস অপূর্ব মধুর রসের সৃষ্টি করেছেন। শারদ পূর্ণিমা মধুর সুগন্ধি মলয় বাতাস নেচে নেচে বৃক্ষশিরের সঙ্গে খেলা করতে করতে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। ময়ুর-ময়ুরী আনন্দে অধীর হয়ে পেখম তুলে নাচ্ছে, সরস প্রকৃতি দেবী যেন প্রেমে মত্ত হয়ে আপনিই নৃত্য করছেন। এ হেন মধুর উজ্জ্বল রাত্রিতে রত্নবেদিকায় উপবেশন করে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা করবার ইচ্ছা প্রবল হলো। তিনি বংশীবাদন করলেন। মধুর বংশীধ্বনি যমুনাতট হতে সৃষ্ট হয়ে ব্রজভূমে প্রবেশ করল। ব্রজগোপীদের—

শ্রবণে যাইয়া রহল পশিয়া
বেকত বাজিছে বাঁশী।

শ্রীকৃষ্ণ নয়, চণ্ডীদাসের বংশীধ্বনি শ্রবণে—

বরজ তরুণী হইল বাউরী
হরিল কুলের লাজে॥

অপরিচিতা প্রিয়দর্শিনী এক নারী—নান্নুর গ্রামের সন্নিকটবর্তী এক পরগণার নবাবের বেগম সব ভুললেন। লাজ মান এমন কি

কুলের ভয় পর্যন্ত বিস্মৃত হলেন। ব্রজগোপিনীদের মত আকুল হয়ে গ্রাম হতে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। ছদ্মবেশে। চণ্ডী-দাসের মধুর কণ্ঠের গীত শুনবার জন্য। নবাবের কোন্ আপত্তিই তিনি শুনলেন না। ক্রোধান্বিত হয়ে উঠলেন নবাব। সংকট ত্রাণের পথ অনুসন্ধান করতে লাগলেন। একদিন্ পথও পেয়ে গেলেন।

নবাবই এক সময় চণ্ডীদাসকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছিলেন আপন প্রাসাদে। দুর্ভাগ্যক্রমে চণ্ডীদাসের ভক্তি-প্রেমের বিজয়মন্ত্র তাঁর অপূর্ব পদাবলী যখন ওঁর মধুর কণ্ঠে নিনাদিত হতে লাগল তখন বেগম সাহেবা বিমোহিত হয়ে পড়লেন। ধৈর্যহীনা উন্মত্তার মত আকুল হলো তাঁর প্রাণ সেই ব্রজেশ্বরের জন্য। আর সেই রসরাজ ব্রজেশ্বরের প্রতিমূর্তিই যেন তাঁর চোখের সামনে প্রতিভাত হয়ে উঠলো চণ্ডীদাসরূপে। পিপাসিত মনের মাটি সিক্ত হয়ে উঠলো। আরও যেন শুনতে পেলেন মধুর এক সাধন পথের বাণী। এই মানুষী জীবনেরই সব অশ্রু অনুরাগ আর আকুলতার উপহার নিয়ে গোপীহৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা কৃষ্ণপ্রেমে লীন হবার জন্য ছুটে গিয়েছিল যে পথে।

বিপিন পথে চলেছেন মুরলীধারী শ্যাম। প্রেমজরজর হিয়া অভি-মানিনী রাধা এখন যমুনার নীল জলে গাগরি ভাসিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। উৎকর্ণ হয়ে রয়েছে বৃকভানুনন্দিনী ! আর কতক্ষণ। এখনো কেন বেজে উঠছে না বাঁশী ?

বংশীধ্বনি নয়, অকস্মাৎ গর্জন করে ওঠে নবাবের সিপাহীদের চিৎকারধ্বনি।* নান্নুরের নাটমন্দিরে কীর্তনানন্দে বিভোর হয়েছিলেন চণ্ডীদাস। রামমণি ও ভক্ত শিষ্যবৃন্দ সহ। সহসা প্রেম-স্নিগ্ধ নিকেতন নবাব সৈন্যের হিংস্র উল্লাস-ধ্বনিতে কেঁপে উঠলো।

*১। নান্নুর নিকটবর্তী কির্ণাহার গ্রামের নাগভিহি নামক পল্লীতে চণ্ডীদাসের সমাধি আজও বর্তমান আছে।

কীর্ত্তন-মন্দির ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলো। বিদীর্ণ মন্দিরের নীচে জীবন্ত সমাধিপ্রাপ্ত হলেন বাংলার সাধক আদি কবি চণ্ডীদাস তাঁর শিষ্য ভক্তবৃন্দ ও প্রেমিকা রামমণিসহ।

সেই অভিশপ্ত নাটমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আজও আছে। আজও সেই জীর্ণ নাটমন্দিরের ধ্বংসস্তূপ হতে নির্জন নিস্তব্ধ রাত্রিতে চণ্ডী-দাসের সুস্বর কণ্ঠের গীত ধ্বনিত হয়ে ওঠে।

'কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কুলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে॥'

কালিন্দী নদীর কূলে গোকুলের মাঠে অবিরত যে বংশীধ্বনি হচ্ছে, দূরাগত কৃষ্ণের বাঁশীর সেই প্রতিধ্বনি শোনাচ্ছেন চণ্ডীদাস। বড়ু চণ্ডীদাসের সেই বাঁশী আজও যে বেজে চলেছে।

২। চণ্ডীদাসের জীবনী রচয়িতা শ্রীরমণীমোহন মল্লিক লিখছেন, 'চণ্ডীদাস নান্নুরের নিকটবর্তী মতীপুরে কীর্তন করিতে গিয়াছিলেন। তথায় নাটমন্দির পতিত হওয়ায় তাঁহার ও রামমণির মৃত্যু হয়।' আবার লিখছেন, 'চণ্ডীদাস জীবনের শেষ দশায় শ্রীবৃন্দাবন ধামে গমন করিয়া সেইখানেই সমাধিস্থ হন। আজ পর্যন্ত তাঁহার সমাধি শ্রীবৃন্দাবনে বিদ্যমান আছে।' এই প্রসঙ্গে 'চণ্ডীদাস' রচয়িতা শ্রীকরালী-কিঙ্কর সিংহ লিখছেন, 'বৈষ্ণবদিগের মধ্যে সমাধি হইতে অস্থি উত্তোলন করিয়া পুনরায় নূতন স্থানে নূতন সমাধি প্রতিষ্ঠা করিবার রীতি দেখিতে পাওয়া যায়। কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবনে সমাধিস্থ হন। বৃন্দাবনের সমাধি হইতে পবিত্র অস্থি সংগ্রহ করিয়া তাঁহার প্রিয় জন্মভূমি ঝামটপুরে নূতন সমাধিতে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। চণ্ডীদাসের ব্রজভূমের সমাধিটি বোধ হয় কির্ণাহারের সমাধি হইতে অস্থি সংগৃহীত হইয়া কোন ভক্ত দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে।'

প্রভু জগদ্বন্ধু

ঈশ্বর তৃষ্ণা পেয়ে বসেছে কিশোর জগৎকে। ঈশ্বরাকাঙ্ক্ষার তীব্রতা দিনে দিনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে লাগলো। মধুর ভাবের সাধনা। হরিবাসরে। কীর্তনের আসরে। যাত্রা অভিনয়ে কোথাও হরি-গুণগান হলেই হলো, ভাবোন্মাদে উন্মত্ত হয়ে যায় সে। ভাব-সমাধি।

সেদিন পাবনার শহরতলীতে ধ্রুবচরিত যাত্রা অভিনয় হচ্ছে। জগৎও এসেছে। তার কিশোর সঙ্গীসহ বসে আছে। 'কোথায় পদ্মপলাশলোচন হরি'—বলে গান ধরলো ধ্রুব। আর যায় কোথায়? ব্যাকুল হলো প্রাণ। এক অলৌকিক ভাবে বিভোর হলো সে। ভাবের আবেশ নয়। পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের আবেশ। কিশোর জগতের দেহে মনে আত্মায়। এক নির্মল প্রশান্তি উপভোগ করতে লাগলো। কয়েক মুহূর্তের জন্য হৃদয়ের স্পন্দনও হলো রুদ্ধ। চৈতন্য হারালো কিশোর জগৎ। যাত্রার আসরে।

আত্মানুভূতির শুভ্র আলোকচ্ছটায় তখন তার মুখমণ্ডল দিব্য সৌন্দর্যে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। চারিদিকের কৌতুহলী মানুষ কিশোর জগতের সেই শ্রীমূর্তি নয়নগোচর করে মুগ্ধ হলেন। তরুণ ডাক্তার চন্দ্রশেখর কালী সেই যাত্রা আসরে উপস্থিত ছিলেন। বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণ ডাক্তারের মন ভরে উঠলো বিরক্তিতে। মনে মনে ভাবলেন নিশ্চয়ই স্নায়বিক রোগ, নয়তো মস্তিষ্কবিকৃতির লক্ষণ। ডাক্তারের নির্দেশে ধরাধরি ক'রে জগৎকে নিয়ে আসা হলো পার্শ্বস্থ ঘরে। ডাক্তার দেখলেন অসুস্থ রোগীকে। ভাল করেই দেখলেন। কিন্তু বিফল হলেন। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ও পরীক্ষার মাধ্যমে রোগের মূলে যেতে সক্ষম হলেন না ডাক্তার।

হৃদয়ঙ্গম করলেন বুদ্ধিগ্রাহ্য মানবীয় জ্ঞানের উপরেও এক পরম চৈতন্যের অস্তিত্ব রয়েছে। যাঁর চেতনায় সমস্ত জগৎ চৈতন্যময়। এক অব্যক্ত বিস্ময়ে ও ভয়ে ডাক্তার কালী আত্মসমর্পণ করলেন কিশোর জগতের চরণে। তারপর ডাক্তারেরই অনুরোধে সমাধিস্থ জগৎকে আবার নিয়ে আসা হলো যাত্রা আসরে। আর হরিগুণ কীর্তন শ্রবণে ধীরে ধীরে চৈতন্য ফিরে এলো কিশোর জগতের। প্রকৃতিস্থ হলো সে।

কিশোর জগতের ভাবসমাধির কথা ছড়িয়ে পড়লো গ্রাম হতে গ্রামান্তরে আর সমস্ত পাবনা শহরে।

আর একদিন কৃষ্ণকীর্তনে বিভোর হয়ে সমাধিমগ্ন হলো কিশোর জগৎ। এক দুষ্টবুদ্ধি ব্যক্তি পরীক্ষা করবার জন্য তার পায়ের আঙুলের উপর জ্বলন্ত টিকা রেখে দিল। আঙুল পুড়ে যাচ্ছে কিন্তু বোধ নেই। হঠাৎ বন্ধুদের দৃষ্টি পড়ে জ্বলন্ত টিকাটির উপর। দূরে ফেলে দেয়। অগ্নিদগ্ধ পায়ের ঐ ঘা শুকোতে দীর্ঘদিন লেগেছিল। দুষ্কৃতকারী ব্যক্তিটি কিন্তু উত্তরকালে ভবিষ্যতের এই মহাপুরুষের কৃপালাভ করে ধন্য হয়েছিলেন।

এই কিশোর জগৎই হলেন শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু। প্রভু জগদ্বন্ধু। ফরিদপুর ছিল তাঁর লীলাভূমি। প্রেমভক্তির সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে সাধারণ মানুষের মধ্যে ভক্তির মহিমা করেছিলেন প্রচার। আর সমাজের উপেক্ষিত নির্যাতিতদের নিয়েছিলেন কোলে তুলে। তিনি প্রচার করলেন ভক্তের জাত নেই। জগতের যত ভক্ত সব এক জাতি। ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই যুগসন্ধিক্ষণে যখন পাশ্চাত্য ভাবধারা গ্রহণ করে তরুণ বঙ্গ অজ্ঞেয়বাদী হয়ে পড়ছিল, ব্রাহ্মণশাসিত হিন্দু সমাজ নিজের চারিদিকে দুর্ভেদ্য দুর্গ রচনা করে জাতিভেদের কঠোরতাকে আরও বর্ধিত করে তুলছিল, অস্পৃশ্যতা ও অনাচরণীয়তা আরও বেশী প্রবল হয়ে উঠছিল, মহাপ্রভুর প্রেমধর্মে সমাজসংস্কারের যে বিরাট সম্ভাবনা ছিল, সনাতনী ব্রাহ্মণেরা তারও গতিরোধ করে দাঁড়ালেন, ঠিক সেই সময়েই এই জাতিভেদ

প্রপীড়িত বঙ্গভূমির মাটিতে আবির্ভূত হলেন ভক্তপ্রাণ প্রভু জগদ্বন্ধু। ইংরাজী ১৮২১ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মে। মুর্শিদাবাদের ডাহাপাড়ায়। পিতা দীননাথ ন্যায়রত্ন, শাস্ত্রজ্ঞ ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ। অধ্যাপক বৃত্তি গ্রহণ করে এই অঞ্চলে এসে বসবাস করছেন। আদি-নিবাস ফরিদপুর জেলার কোমরপুর গ্রামে। পূর্ববঙ্গ ভ্রমণের সময় মহাপ্রভু চৈতন্যদেব পদ্মাতীরের এই গ্রামেরই বাসুদেব চক্রবর্তীর গৃহে অতিথি হন। কোমরজলে দাঁড়িয়ে স্নান করেছিলেন বলে গ্রামের নাম হয় কোমরপুর। পরবর্তীকালে সর্বনাশী পদ্মার করালগ্রাসে গ্রামখানি পতিত হলে চক্রবর্তী পরিবার গোবিন্দপুর গ্রামে এসে ঘর বাঁধলেন। এই পরম ভক্ত বাসুদেব চক্রবর্তীরই বংশধর হলেন শ্রীজগদ্বন্ধুর পিতা দীননাথ ন্যায়রত্ন। আর মাতৃদেবী হলেন ভক্তিমতী রমণী বামাদেবী। কুলবিগ্রহ রাধাগোবিন্দের সেবা পূজার আনন্দে বিভোর সর্বদা। শ্রীজগদ্বন্ধু তাঁব তৃতীয় সন্তান। এই নবজাত শিশুকে দর্শন করে অভিভূত হয়েছিলেন এক নেপালী সন্ন্যাসী। শিশুর ছোট্ট রাঙা পা দু'খানি মাথায় ঠেকিয়ে নয়নজলে ভাসতে ভাসতে বললেন, এঁকে দর্শন করবার সৌভাগ্যলাভ করে ধন্য হলাম। ইনি সাধারণ শিশু নন। মহাশিশু, মহাপুরুষ। একদিন বিশ্বের লোক এঁর পায়ে মাথা ঠেকাবে। সন্ন্যাসীর কথা শুনে আশ্চর্যান্বিত হলেন পিতামাতা। আর বিস্মিত হয়েছিলেন বন্ধুবর গঙ্গাধর কবিরাজ।

আর একদিন পিতাব কোলে জগৎকে দিব্য শিশুরূপে নয়নগোচর করে জটাজূটশোভিত সৌম্যমূর্তির এক সাধু বলেছিলেন,—এ যে বাজা হবে।

প্রত্যুত্তরে ন্যায়রত্ন মহাশয় বললেন, সাধুজী, মাপ করবেন, আমি একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আমার ছেলে কি করে রাজা হবে?

মৃদু হেসে সাধুজী বললেন, ভোগের রাজা নয়। যোগের রাজা।

পরমুহূর্তেই সাধুজী হলেন অন্তর্ধান।

আনন্দাশ্রু নির্গত হতে লাগল ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ দীননাথ ন্যায়রত্নের

চক্ষুর্দ্বয় হতে। পরে অনেক অনুসন্ধান করেও সে সাধুজীর দর্শন মিললো না।

পবিত্র ছোট্ট শিশুর আনন্দচঞ্চল দিনগুলির উপর অকস্মাৎ বিষাদের করাল ছায়া হলো পতিত। চৌদ্দমাস বয়ঃক্রম কালে মাতৃদেবী ইহলীলা সংবরণ করলেন। পিতৃদেব উপায়ান্তর না দেখে স্বগ্রাম গোবিন্দপুরে এসে উপস্থিত হলেন। অসহায় শিশুর লালন পালনের ভার দিলেন ভ্রাতুষ্পুত্রী বালবিধবা দিগম্বরী দেবীর উপর।

পদ্মাতীরের অপরূপ এক প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে দিনে দিনে শিশু বড় হয়ে ওঠে। সপ্তাহ মাস শেষ হয়, বছর ঘুরে আসে। ছোট্ট শিশুর চাঁদের মত রূপ দেখে মুগ্ধ হয় গ্রামের লোক। আর গ্রামের মেয়েরা শিশুকে কোলে নিয়ে কোল থেকে চায় না নামাতে। এক অপূর্ব স্নিগ্ধতায় তাদের অঙ্গ যেন পুলকিত হয়। দিব্য আনন্দে ভরপুর হয়ে যায় তাদের মন। প্রাণ। নবনীকোমল অনুপম শিশুর স্পর্শ থেকে বিচ্যুত হতে চায় না তারা। আবার একদিন আকস্মিক ভাবে কৃষ্ণমেঘের করাল ছায়া পতিত হলো ছোট্ট শিশুর জীবনের উপর। যখন তার চার বৎসর বয়স তখন পিতৃদেব নিত্যধামে গমন করলেন। আবার পিতার লোকান্তরিত হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই বাস্তুভিটাও পদ্মা নদী গ্রাস করলো। অভাবনীয় অচিন্তনীয় ব্যাপার।

অবশেষে চক্রবর্তী পরিবার চলে এলেন ফরিদপুরের শহরতলীতে। ব্রাহ্মণকান্দায়। স্থায়ীভাবে বসবাস করতে লাগলেন। দিগম্বরী দেবীও স্নেহ দিয়ে ভালবাসা দিয়ে লালন পালন করতে লাগলেন শিশুরূপী মহাপুরুষ শ্রীজগদ্বন্ধুকে।

এক শুভদিনে তেরো বৎসর বয়ঃক্রম কালে জগদ্বন্ধুর উপনয়ন সংস্কার হলো সম্পন্ন। মুণ্ডিত কেশ, গৈরিকধারী গৌরবর্ণ সৌম্য-কান্তি বালব্রহ্মচারীর দেহের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ ও অভিভূত হলেন গ্রামবাসীরা। তখন জগৎ ফরিদপুর জেলা স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র।

এই উপনয়ন সংস্কারের পর হতেই জগদ্বন্ধুর মনোজগতে এক আলোড়নের হলো সৃষ্টি। প্রেমভক্তির বীজ যেন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই স্ফুরিত হতে লাগলো অন্তর্জগৎ হতে। উদাস অনাসক্ত ভাব। আবার কখনও ভাবানন্দে বিভোর হয়ে হরিনামগানে মত্ত হয়ে থাকে সে। কি সে ভাব! কি সে সুর! সর্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করে রাখে। এটা যেন তার জন্মগত স্বভাব। এই ভাবে দিনের পর দিন মাসের পর মাস চলে যায়। আবার আসে নূতন বছর। জগৎ তখন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। বার্ষিক পরীক্ষা চলছে। প্রশ্নপত্রের কিছুটা উত্তর লিখবার পর অকস্মাৎ উন্মনা হয়ে তাকিয়ে থাকে সে সম্মুখ পানে। এমন সময় প্রধান শিক্ষক এসে চেপে ধরলেন। তাঁর ধারণা সম্মুখীন পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র নকল করছে সে। শিক্ষকের ভুলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করে স্কুল ছেড়ে চলে গেলো জগৎ। সেইদিন থেকেই ফরিদপুর বিদ্যালয়ের সঙ্গে জগদ্বন্ধুর সম্বন্ধ চিরতরে হলো ছিন্ন। প্রধান শিক্ষক মহাশয় নিজের ভুল স্বীকার করে অনুতপ্ত হয়েছিলেন পরবর্তীকালে।

এবারে জগদ্বন্ধুর শিক্ষাজীবন শুরু হলো পাবনাতে। অল্প দিনের মধ্যেই কিশোর জগদ্বন্ধু শিক্ষক ও সহপাঠীদের মন জয় করে ফেললো মধুর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। জগদ্বন্ধুর কিশোর জীবনের অলৌকিক বিভূতির প্রকাশ প্রথম পাবনাতেই হয়। এই বিপুল ধরণীর অস্তিত্বের মহাসঙ্গীত প্রেমরসে সিক্ত হয়ে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে তার অন্তর হতে উত্থিত হতে লাগলো। সেই ব্রজরসসিক্ত কৃষ্ণনামগান শুনে আর দিব্য রূপলাবণ্য নয়নগোচর করে মুগ্ধ ও অভিভূত হলেন পাবনার মানুষ।

এই পাবনা শহরের উপকণ্ঠে প্রাচীন এক বটবৃক্ষের নিভৃতে বাস করেন একজন বাকসিদ্ধ মহাপুরুষ। পাবনার মানুষ বলে 'ক্ষ্যাপা বাবা', আর তরুণ জগদ্বন্ধু বলে 'বুড়োশিব'। দিবারাত্র এই বুড়ো-শিবের কাছেই পড়ে থাকে সে। বুড়োশিবও খুবই স্নেহ করেন ভক্তপ্রাণ জগৎকে। জগতের দিদি গোলকমণির কাছে একদিন বললেন ক্ষ্যাপা,—'ছাখ দিদি, জগা মানুষ নয়। আমিও মানুষ

নই। তবে জগা কিন্তু রাজা। আমরা সব প্রজা।' এ কথার মর্মার্থ সেদিন দিদি গোলকমণি উপলব্ধি করতে পারেননি। শুধু বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে ক্ষ্যাপা বাবার দিকে চেয়ে ছিলেন। উত্তর-কালে ঐ জগাই যোগের রাজা প্রভু জগদ্বন্ধু হয়ে বাকসিদ্ধ মহাপুরুষের ভবিষ্যৎ-বাণীকে সফল করে তুলেছিল। পাবনা শহর ও দূর গ্রামের আর্ত পীড়িত দুঃস্থ মানুষ আকুল হয়ে ছুটে আসে ক্ষ্যাপা বাবার জরাজীর্ণ পর্ণকুটিরে। মহাপুরুষের কৃপালাভের আশায়। আর এই মহাপুরুষেরই প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়েছিল তরুণ জগৎ। লোকালয়ের কোলাহল থেকে দূরে শহরের উপকণ্ঠের এই বটবৃক্ষের নিভৃতে এসে জগদ্বন্ধুর সাধনার জীবন হয়েছিল শুরু। কখনো ধ্যানে। আবার কখনো জপে। নিমগ্ন হয়ে থাকে তরুণ তাপস জগদ্বন্ধু। কঠোর উপবাস ব্রত গ্রহণ করে দেহের সকল ক্ষুধা তৃষ্ণাকে পরাভূত করবার প্রয়াসের কোন ত্রুটি ছিল না তার। স্কুলের পাঠ আর বেশীদূর অগ্রসর হলো না। ধীরে ধীরে তরুণ জগদ্বন্ধুর দেহ আশ্রয় করে বহু অলৌকিক ভাববিভূতির প্রকাশ হতে লাগলো আর মহাপ্রকাশের লগ্নটিও ক্রমে ক্রমে নিকটবর্তী হয়ে এলো। এই সময়ে তরুণ সাধকের মধ্যে যে দিব্য আকর্ষণী শক্তির স্ফুরণ হয়েছিল তারই অপ্রতিহত প্রভাবে কয়েকজন বিশিষ্ট ভক্তের হয়েছিল সমাগম। তাঁরা হলেন তাড়াসের জমিদার বনমালী রায়। নিত্যানন্দ কুলোদ্ভব শ্যামলাল গোস্বামী। অদ্বৈত বংশের রঘুনন্দন গোস্বামী। এঁরা তরুণ সাধককে প্রভু বলে সম্বোধন করতে লাগলেন। নবীন সাধক জগৎ হলেন,—'প্রভু জগদ্বন্ধু'।

ভক্তপ্রবর বনমালী রায় আকৃষ্ট হয়ে প্রভু জগদ্বন্ধুকে সাদরে নিয়ে এসেছেন আপন প্রাসাদে। তাড়াসের রাজপ্রাসাদে। কুলবিগ্রহ শ্রীরাধাবিনোদ। সেবাইত ভক্তরা বলেন 'জামাই বিনোদ'। দূর অতীতে এই রাধাবিনোদই রায় বংশের এক ভক্তিমতী কুমারীকে কান্তারূপে আত্মসাৎ করে নেন। সেই থেকে জামাই বিনোদের খাতির যত্ন ও খুব সম্মান এই জমিদার পরিবারে। রাধাবিনোদের

স্নান পূজা অর্চনা ভোগ মহাসমারোহের সঙ্গে সম্পন্ন হয় প্রতিদিন। বিগ্রহের ভোগ প্রসাদ নিবেদনের পর তামাকু সেবনের পালা। প্রভু জগদ্বন্ধু বললেন ভক্ত বনমালী রায়কে, চলুন, এবারে জামাই বিনোদের তামাক সেবন দেখে আসি।

বনমালীবাবু বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিলেন না। কারণ এই প্রথাটিকে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিতেন না। কিন্তু প্রভুর আদেশে মন্দিরে প্রবেশ করলেন। প্রভু জগদ্বন্ধু অকস্মাৎ ধ্যানানন্দে হলেন বিভোর। শান্ত স্নিগ্ধ এক পরিবেশের হলো সৃষ্টি। মন্দিরাভ্যন্তরে। অকস্মাৎ বনমালী রায় দেখলেন জামাই বিনোদের গড়গড়া থেকে হচ্ছে ধূম উদ্গিরণ। শুধু তাই নয়, গড়্ গড়্ শব্দও হতে লাগলো কর্ণগোচর। প্রভু জগদ্বন্ধুর উপস্থিতিতে সেদিন 'জামাই বিনোদ' সত্য সত্যই তামাকু সেবনে হয়েছিলেন রত। অলৌকিক সে ঘটনা প্রত্যক্ষ করে মুগ্ধ, বিস্মিত ও অভিভূত হলেন ভক্ত বনমালী রায়। সেবা ও পূজানিষ্ঠার মধ্য দিয়েও যে রাধামাধবের কৃপা লাভ করা যায় এই অধ্যাত্ম জ্ঞান লাভ করলেন। জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হলো। আর প্রভু জগদ্বন্ধুকে জন্মসিদ্ধ মহাপুরুষরূপে নয়নগোচর করে পরমানন্দ অনুভব করতে লাগলেন মনে মনে ভক্তপ্রবর বনমালী রায়।

অবশেষে একদিন প্রব্রজ্যার পথে পা বাড়ালেন প্রভু জগদ্বন্ধু। তীর্থে তীর্থে নগরে নগরে হরিনাম বিলিয়ে এসে উপস্থিত হলেন শ্রীধাম বৃন্দাবনে। শ্রীকৃষ্ণ লীলাভূমি বৃন্দাবন ধামে এসে ভাবানন্দে বিভোর হয়ে গেয়ে উঠলেন, 'এই ভব কুহক রে—রাই তুমি উদ্ধারণ'। রাধাকুণ্ডের তীরে এসে সাধনভজনে হলেন প্রবৃত্ত। শুরু হলো কঠোর সাধনার জীবন। মধুর ভাবের সর্বস্বত্বাধিকারিণী পরম আরাধ্যা শ্রীরাধারাণীর দর্শনের জন্য আকুল হলেন। অকস্মাৎ একদিন এক শুভমুহূর্তে যোগীবরের হৃদয়তন্ত্রীতে এক অপূর্ব রাগিণী উঠলো বেজে। তাঁর মনের সকল রুদ্ধ দুয়ার গেল খুলে। মনে হতে লাগলো জগৎটা যেন কি এক আনন্দে পূর্ণ ও চৈতন্যময়। সে

আনন্দের শেষ নেই। সীমা নেই। সমস্ত বিশ্বচরাচর সেই আনন্দের ছটায় উদ্ভাসিত। পরমুহূর্তেই নয়নগোচর হলো, সেই অপার আনন্দের আধার আনন্দময়ী শ্রীরাধারাণীকে। পরম আরাধ্যা মহা-ভাবময়ী শ্রীরাধারাণীর শ্রীমূর্তি দর্শন করে মুগ্ধ ও অভিভূত হয়ে জ্ঞান হারালেন সাধক জগদ্বন্ধু। অব্যক্তং অচিন্ত্যং অনির্বচনীয়ং অবস্থা। অমৃতের আনন্দধারায় সিক্ত হয়ে রাধাকৃষ্ণের লীলাস্থলী শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে রইলেন বহু সময় ধরে। এই ভাবে কত সময় ছিলেন বোধ ছিল না সাধকপ্রবরের। যখন জ্ঞান ফিরলো, প্রকৃতিস্থ হলেন। ধীরে ধীরে লিখলেন—

জয় রাধে ধর্ম, জয় রাধে জয়।
জয় রাধে কর্ম, জয় রাধে রয়॥

এই রাধা নামই হলো তাঁর ধ্যান জ্ঞান মন্ত্র। এই সময়ে একদিন বৈষ্ণব রঘুনন্দন গোস্বামী জিজ্ঞেস করলেন,—প্রভু, আপনার গুরু কে? প্রত্যুত্তরে মৃদু হেসে বললেন প্রভু জগদ্বন্ধু,—তোদের বৃষভানু কুমারীই যে আমাকে মন্ত্র দান করেছেন। তিনিই আমার গুরু।

স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে শ্রীরাধারাণীর নিকট হতে মন্ত্র লাভ করে সাধক তাঁর কণ্ঠে আর কখনো 'রাধা' শব্দ উচ্চারণ করতে পারতেন না। রাধা নাম শুনলেই ভাবাবেশ হতো। অন্তরে অন্তরে প্রবাহিত হতো ভাবহিল্লোল। ভাববিহ্বলতা। শ্রীরাধারাণীকে উদ্দেশ করে কিছু বলতে হলে ভক্তদের বলতেন 'তোদের কিশোরী'। রাধা কুণ্ড বলতেন না। বলতেন 'অমুক কুণ্ড'। পরবর্তীকালে প্রভু জগদ্বন্ধুর ভক্ত ও প্রিয় শিষ্য রাধিকারঞ্জন গুপ্তেরও ঐ একই অবস্থা হয়েছিল। তিনি 'রাধিকা'কে বলতেন 'শারিকা'। প্রভুর নির্দেশেই ইনি উত্তরকালে পরম বৈষ্ণব চরণদাস বাবাজীর আশ্রয় লাভ করে, শ্রীশ্রী ১০৮ শ্রীরামদাস বাবাজী নামে খ্যাত হয়েছিলেন। ইনি ফরিদপুর জেলার কুমারপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ১২৮৩ সালে ২২শে চৈত্র মঙ্গলবার ফরিদপুর শহরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শ্রীদুর্গাচরণ গুপ্ত ও মাতার নাম ছিল সত্যভামা দেবী। কিশোর বয়স থেকেই

শ্রীরাধিকা গুপ্ত প্রাণমাতানো কীর্তন করতেন। তাঁর মধুর কণ্ঠের অপূর্ব ভাবপূর্ণ সঙ্গীত শুনে সাধারণ অসাধারণ, সন্ন্যাসী ও ভক্ত সকল শ্রেণীর মানুষই মুগ্ধ ও অভিভূত হতেন।

আবার একদিন প্রভু জগদ্বন্ধু শ্রীধাম বৃন্দাবনের লীলা সাঙ্গ করে, সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে, ফিরে এলেন ফরিদপুরে। ব্রাহ্মণকান্দায়।

ফরিদপুরই হলো এখন থেকে সিদ্ধপুরুষ প্রভু জগদ্বন্ধুর লীলাক্ষেত্র। হরিনামগানে আর মৃদঙ্গের সুধাস্রাবিত ধ্বনিতে মুখরিত করে তুললেন পদ্মার তীরভূমি আর ফরিদপুরের আকাশ বাতাস। ফরিদপুরের উপকণ্ঠে অবহেলিত বুনো বাগ্‌দীদের হরিনাম-গানে তুললেন মাতিয়ে। বৈষ্ণব ধর্মে করলেন দীক্ষিত। মিশনারীরা সে সময় এই বুনো বাগ্‌দীদের খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করবার চেষ্টায় রত হয়েছিলেন। তাঁদের সে চেষ্টাকে বিফল করে ভক্তিরসামৃত পান করিয়ে পতিত অবহেলিত মানুষদের মনের মাটিকে সিক্ত করে তুললেন। কোলে তুলে নিলেন অস্পৃশ্য বুনোদের। সর্দার রজনীর বৈষ্ণব নাম দিলেন—'হরিদাস'। আর হিন্দুসমাজের নির্যাতিত অস্পৃশ্য অবহেলিত সেই বুনোদেব অভিহিত করলেন 'মোহান্ত সম্প্রদায়' বলে। মহামহোৎসবের করলেন আয়োজন। তারপর প্রভু জগদ্বন্ধু ভক্তসনে বসে রাধাগোবিন্দের প্রসাদ গ্রহণ করলেন। ফরিদপুরের সমগ্র বুনো বাগ্‌দীরা প্রভু জগদ্বন্ধুর একনিষ্ঠ ভক্ত হয়ে উঠলো। সেই পতিত অবহেলিত জাতিকে আলোকের ধারায় ধুইয়ে ফুটিয়ে তুলতে প্রকাশিত হতে প্রেরণা দিলেন মহাবৈষ্ণব প্রভু জগদ্বন্ধু। লোকোত্তর মহাপুরুষের কৃপায় ও অনুপ্রেরণা লাভ করে অল্পকাল মধ্যেই এই পতিত জাতির মধ্য হতে মৃদঙ্গবাদক, কীর্তন গায়ক ও শত শত ভক্ত বৈষ্ণব আত্মপ্রকাশ করলেন। কীর্তনীয়া হরিদাস ও মৃদঙ্গবাদক মহিম খ্যাতির চরম শিখরে উন্নীত হয়েছিলেন।

বর্তমান কালের হরিজন আন্দোলনের প্রথম পথপ্রদর্শক পরম বৈষ্ণব প্রভু জগদ্বন্ধু। যুগল ভজনের তত্ত্ব সম্বন্ধে বলতেন ভক্তদের প্রভু জগদ্বন্ধু, 'মানসে সদা যুগল সঙ্গ করে নিজেকে 'অমুক' দাসী

মনে করবে। কৃষ্ণকান্তি সদা নয়নে ও মানসে ভাসবে। কৃষ্ণই জীবন-সর্বস্ব। কৃষ্ণগতি ও কৃষ্ণপতি—এই সার করাই পরমধর্ম। কৃষ্ণই জীবনব্রত। তাঁকে ছাড়া অন্য কিছু জানবে না। কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ—এই লিখবে। ভাববে। কাঁদবে।

ভজ কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ লহ কৃষ্ণের
নাম রে।
যে জন কৃষ্ণ ভজে সেই আমার
প্রাণ রে।

*   *   *

জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে রাম
হরে হরে।
ঐ নাম বল বদনে শুনাও কানে
বিলাও জীবের দ্বারে দ্বারে।'

ধীরে ধীরে সমস্ত পূর্ববঙ্গকে প্লাবিত করে তুললেন কৃষ্ণকীর্তনে প্রভু জগদ্বন্ধু। পদ্মার তরঙ্গধ্বনির মত ভক্তের কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হলো 'প্রভু জগদ্বন্ধু' নাম।

সিদ্ধপুরুষ আর প্রচ্ছন্ন থাকলেন না। ভক্ত চিনলো ভগবানকে। শুরু হলো ভক্ত ও ভগবানের লীলা। আর্তপীড়িত মুমুক্ষু মানুষ আকুল হয়ে ছুটে আসতে লাগলো মানবপ্রেমিক জগদ্বন্ধুর চরণতলে। অসংখ্য ভক্তসমাগম হতে লাগলো।

আরা ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অতুল চম্পটিও একদিন অভিভূত সংসারের সকল টানকে পিছনে ফেলে ব্যাকুল হয়ে ছুটে এলেন মহাপুরুষের নিকট। দৈন্য ও আর্তি দেখে সন্তুষ্ট হয়ে ভক্তকে আশ্রয় দিলেন প্রভু জগদ্বন্ধু। তাঁর মনের সব দ্বন্দ্ব ও চাঞ্চল্য শান্ত হয়ে গিয়েছিল প্রভুর সাহচর্য লাভ করে। ভক্তপ্রাণ অতুল চম্পটি ভাবানন্দে বিভোর হয়ে গেয়ে উঠলেন,—'মোরে কর দয়া, দেহ পদ-ছায়া, শুনহ পরাণ কানু।' তারপর প্রভুর নির্দেশিত সাধন পথকে জীবনধর্ম করে নিয়ে সংসারবিরাগী অতুল চম্পটি নামগানে বিভোর·

হয়ে রইলেন। গান গেয়ে কৃষ্ণের চরণেই জীবনের একমাত্র তৃপ্তি নিবেদন করেছিলেন।—'সকল ছাড়িয়া রহিনু তুয়া পায়ে জীবন মরণ ভরি।'

পাবনা, ফরিদপুর সমগ্র উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গকে প্লাবিত করে শ্রীজগদ্বন্ধু এলেন কলকাতা শহরে। এই সময়ে চুঁচুড়ার অন্নদাচরণ দত্তকে কেন্দ্র করে প্রভু জগদ্বন্ধু নাম সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে ও কলকাতা শহরে ছড়িয়ে পড়ে। অন্নদাচরণ ছিলেন পরম বৈষ্ণব ও একনিষ্ঠ গৌরভক্ত। মাঝে মাঝে তাঁর দেহে সাধু সন্ন্যাসী যোগী মহাপুরুষদের আবেশ হতো। অকস্মাৎ একদিন ভাবাবেশে বললেন, জীব উদ্ধারের জন্য পূর্ববঙ্গে যিনি আবির্ভূত হয়েছেন তিনিই জগদ্বন্ধু। অমৃতবাজার পত্রিকার শিশিরকুমার ঘোষ, মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁর গৃহে সমবেত হতেন। তাঁরা কৌতূহলী হয়ে জগদ্বন্ধুর কাছে এসেছিলেন। তারপর সত্যসত্যই একদিন তাঁরা প্রভু জগদ্বন্ধুর সৌম্য শান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে আর সুমধুর হরিনামগান শুনে মুগ্ধ ও অভিভূত হয়ে শ্রীচরণে করলেন আত্মসমর্পণ। অবশেষে শিশিরকুমার ঘোষ প্রভু জগদ্বন্ধুর পুণ্যময় জীবনলীলা প্রকাশ করলেন অমৃতবাজার পত্রিকায়। সমগ্র বঙ্গ-ভূমি জানলো চিনলো প্রভু জগদ্বন্ধুকে। আবার সন্ন্যাসীপ্রবর স্বামী প্রেমানন্দ ভারতীও প্রভুর সংস্পর্শে এসে প্রভাবিত হলেন এবং প্রভু জগদ্বন্ধুর সাধনজীবন সম্বন্ধে প্রচার শুরু করে দিলেন। এই প্রসঙ্গে জগদ্বন্ধু বলেছিলেন শিষ্য ভক্তদের,—'ওদের বলিস, বাতির আলোকে সূর্যকে কখনো দেখতে হয় না। সূর্য স্বপ্রকাশ, তিনি যখন প্রকাশিত হন জগতের সকলেই তাঁকে দেখতে পায়।'

এই প্রেমানন্দ ভারতী মহারাজই প্রভুর সংস্পর্শে এসে জটাজুট মুণ্ডন করে গেরুয়া ত্যাগ করলেন। প্রেমিক বৈষ্ণবের বেশ করলেন ধারণ। এঁর পূর্বাশ্রমের নাম ছিল সুরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। কাশীর ব্রহ্মানন্দ ভারতীর নিকট হতে সন্ন্যাসীর দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।

প্রভু জগদ্বন্ধু ভারতী মহারাজের অন্তরে ভক্তি ধর্মের বীজ করলেন বপন। আর পাশ্চাত্ত্য দেশে গিয়ে ভক্তি ধর্মের তত্ত্ব প্রচারের দিলেন অনুপ্রেরণা। তাইতো ভারতী মহারাজ প্রভু জগদ্বন্ধুর কৃপা লাভ করে আমেরিকায় গিয়ে বৈষ্ণব ধর্ম করলেন প্রচার। আমেরিকার মানুষকে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত করে নিউইয়র্ক ও ক্যালি-ফোর্নিয়াতে গড়ে তুললেন বৈষ্ণব ভক্তমণ্ডলী। সাধনকেন্দ্র রূপে সেখানে তিনি 'শ্রীকৃষ্ণ হোম' করলেন স্থাপন। সমগ্র আমেরিকা-বাসী ও পাশ্চাত্ত্য জগৎ গুরু রূপে জানলো চিনলো প্রভু জগদ্বন্ধুকে। মানবপ্রেমিক জগদ্বন্ধুকে।

কলকাতায় এসে প্রভু জগদ্বন্ধুর কৃপাদৃষ্টি পতিত হলো রাম-বাগানের ডোম সমাজের উপর। ডোম পল্লীতে অবস্থান করে মহা-পুরুষ হরিনাম মন্ত্রে দীক্ষিত করলেন ডোমেদের। আর কয়েকজন পতিতাকেও করলেন উদ্ধার। তাঁদের মধ্যে অন্যতমা হলেন সুরত কুমারী। প্রভু বলতেন সুর-মাতা। সুর-মাতাকে প্রভু দিয়েছিলেন মহানাম ব্রত। উপদেশচ্ছলে বললেন, হৃদয়মন্দিরে স্থাপন করো গৌরসুন্দরকে। জপ করো ধ্যান করো শ্রীগৌর গদাধরের। তাহলেই শান্তি পাবে। সমগ্র ডোম পল্লী প্লাবিত হয়ে উঠলো প্রভু জগদ্বন্ধুর অবস্থানে আর হরিনামের কীর্তনে। এই ডোম পল্লীতেই হরিনাম প্রচারের কেন্দ্র খুলে ভক্তপ্রবর চম্পটি ঠাকুরের উপর দায়িত্ব করলেন অর্পণ। সেবা ধর্মকে জীবনব্রত করবার প্রেরণা দান করলেন তাঁকে। আর ভক্ত ভূস্বামী বনমালী রায়কে প্রেরণা দিলেন বৃন্দাবনের কুঞ্জ মন্দির সংস্কারের কার্যে। বৈষ্ণব-বিদ্যালয় স্থাপন ও দুষ্প্রাপ্য বৈষ্ণব গ্রন্থরাজির প্রকাশনার ব্যবস্থা করতে। এই ভাবে বৈষ্ণব ধর্মকে আবার পুনর্জীবিত করে তুললেন প্রভু জগদ্বন্ধু। নাম-কীর্তনের স্তিমিত ধারাকে আবার করে তুললেন প্রাণবন্ত। সেই মানবপ্রেমিক শ্রীজগদ্বন্ধুর সুস্বরে ধ্বনিত হতো, 'পতিত কোলে ধরি, বোলত হরি হরি, দেওত পুন প্রেম যাচিয়া। অরুণ লোচনে বরুণ ঝরত হি, এ তিন ভুবন ভাসিয়া॥'

নয়নজলে ভাসতে ভাসতে ভক্তদের বললেন, 'তারকব্রহ্ম হরিনামই মহা উদ্ধারণ মন্ত্র। গুপ্ত নয়। ইহা সর্বদা প্রকাশ্য। তোমরা দেশে দেশে হরিনাম প্রচার কর। হরিনামে সৃষ্টি রক্ষা পাবে। তোমাদের বন্ধুর এই ভিক্ষা। নিষ্ঠা আর ভক্তি ছড়াও। আমায় মুক্ত কর।'

আবার একদিন কলকাতার আনন্দের হাটকে ভেঙ্গে দিয়ে যাত্রা করলেন শ্রীধাম বৃন্দাবনের পথে। কখনোও বৃন্দাবনে। কখনো নবদ্বীপে। আবার কখনো প্রভুকে দেখা যায় ফরিদপুরে। লীলাময় ঠাকুর শ্রীজগদ্বন্ধু দেশে দেশে নগরে নগরে তীর্থে তীর্থে লীলা করে বেড়াতে লাগলেন। পিছনের কোন বন্ধন, কোন আহ্বান, কোন মমতা তাঁর সঙ্কল্পিত যাত্রাপথ থেকে প্রতিনিবৃত্ত করতে পারেনি কোনদিন।

ব্যবহারিকভাবে শিষ্য গ্রহণ করা প্রভু কোনদিনই পছন্দ করেননি। এই বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে বলতেন, 'মানুষ-গুরু মন্ত্র দেয় কানে, জগৎগুরু মন্ত্র দেয় প্রাণে।'

তরুণ বয়সেই জগদ্বন্ধু বৃন্দাবন ধামের বিশিষ্ট বৈষ্ণবমণ্ডলীর দ্বারা স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। মাধব দাস, মনোহর দাস ও তোতলা নিত্যানন্দ দাস বাবাজীও শ্রীজগদ্বন্ধুর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। সিদ্ধ ভগবানদাস বাবাজীর শিষ্য জগদীশ বাবাও প্রভুর কৃপালাভ করেছিলেন। তিনি বলতেন প্রভুকে,—'আপনি কাছে এলে আমার আর স্মরণ মনন থাকে না। আপনার ভেতর যেন কি এক অলৌকিক শক্তি রয়েছে, যা আমার ভজন কীর্তন সব ভুলিয়ে দেয়।'

প্রভু ভক্তের কথা শুনে শুধু মৃদু মৃদু হাসেন।

শ্যামদাস বৃন্দাবনের এক বৈষ্ণব সাধক। শ্রীজগদ্বন্ধুর দর্শন লাভ করেছেন কিন্তু ঘনিষ্ঠতা হয়নি। প্রভু তখন এক জায়গায় থাকেন না। এখানে ওখানে ঘুরে ঘুরে অবস্থান করেন। আর মাধুকরী ভিক্ষাব্রত পালন করে প্রসাদ গ্রহণ করেন। বৃন্দাবনের এক বনের ধারে অকস্মাৎ একদিন বিস্মিত হয়ে শ্যামদাস দেখলেন একদল

গাভী পরমানন্দে কি যেন লেহন করছে। কৌতুহলী হয়ে নিকটে এসে দেখলেন আর কেহ নয় দিব্যপ্রভায় সমুজ্জল দেহ নিয়ে প্রভু শায়িত রয়েছেন আর 'গোবিন্দ গোবিন্দ' উচ্চারণ করছেন। গাভীরা তাঁর দেহসৌরভ গ্রহণ করছে। আর সস্নেহে করছে অবলেহন! অভাবনীয় ব্যাপার। অবশেষে ভক্ত শ্যামদাস অনুরোধ করে নিজ ভজন কুটিরে নিয়ে এলেন প্রভুকে।

শ্যামদাসের ভজন কুটিরের নিভৃতে ধ্যানমগ্ন শ্রীজগদ্বন্ধু। অলৌকিক ব্যাপার শ্যামদাসদেখলেন, তুলসীপত্রের গুচ্ছ টুপটাপ করে ভজন কুটিরের অঙ্গনে হচ্ছে পতিত। আর একদিন শ্রীজগদ্বন্ধু কুসুম সরোবরে স্নান করছেন। অকস্মাৎ শ্যামদাস দেখলেন প্রভু নেই। তাঁর পরিবর্তে সেখানে ছুটাছুটি করছে এক লীলাচঞ্চল বালক। আবার কুটিরের সম্মুখে এসে নয়নগোচর করলেন জ্যোতির্ময় দেহধারী এক মহাপুরুষ দণ্ডায়মান রয়েছেন। বিস্মিত ও অভিভূত হলেন বৈষ্ণব সাধক শ্যামদাস প্রভু জগদ্বন্ধুর অলৌকিক বিভূতির প্রকাশ দেখে। নয়নজলে ভাসতে ভাসতে বললেন, 'প্রভু, আজ আপনার স্বরূপ দর্শন করে ধন্য হলাম।' প্রভু শুধু মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন।

সর্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করে রাখেন বলে ব্রজমাঈরা বলেন প্রভুকে ঘুংঘটওয়ালী। ব্রজধামের বৈষ্ণব বাবাজীদের ইচ্ছা যমুনাতীরেই প্রভু জগদ্বন্ধু অবস্থান করুন। তাঁরা ভজন মন্দির নির্মাণ করে দেওয়ার ইচ্ছাও প্রকাশ করলেন। প্রত্যুত্তরে প্রভু বললেন,—'ওরে, ফরিদপুরকে যে এবারে আমি পৃথিবীর কেন্দ্রস্থানে পরিণত করবো।'

তারপর অকস্মাৎ একদিন বৃন্দাবন ধামের আনন্দের হাটকে ভেঙে দিয়ে চলে এলেন নবদ্বীপ ধামে। এখানেও প্রভু জগদ্বন্ধুর অলৌকিক বিভূতি প্রকাশিত হয়ে পড়লো। আর প্রচ্ছন্ন থাকতে পারলেন না।

শিতিকণ্ঠ পণ্ডিত। পরম বৈষ্ণব। সাধন ভজন করেন। কিন্তু তখনও ইষ্টদর্শন হয়নি। অকস্মাৎ একদিন নবদ্বীপধামের শ্মশানভূমির সন্নিকটে এক অলৌকিক দৃশ্য নয়নগোচর করে হয়ে পড়লেন

ভাববিহ্বল। অপূর্ব স্নিগ্ধ এক জ্যোতির্মণ্ডল। আর তারই মধ্য-স্থানে ভাবাবিষ্ট হয়ে এক মহাপুরুষ সমাসীন। পরমানন্দ অনুভব করতে লাগলেন মনে মনে। হৃদয়ঙ্গম করলেন ইনিই সেই পরমপুরুষ যাঁর ধ্যানে তিনি এতদিন ছিলেন মগ্ন। মধুর কণ্ঠে মহাপুরুষ ডাকলেন, শিতিকণ্ঠ! ব্যাকুল চিত্তে ছুটে গিয়ে শিতিকণ্ঠ সেই মহাপুরুষের চরণে করলেন আত্মসমর্পণ। এই মহাপুরুষই হলেন প্রভু জগদ্বন্ধু।

শিতিকণ্ঠের পিতাও পরমভাগবত দীননাথ পদরত্ন। তাঁদের গৃহেই নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ হরিসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রভু জগদ্বন্ধুর আবির্ভাবে নবদ্বীপের হরিসভা নূতন প্রাণে সঞ্জীবিত হয়ে হরিনামগানে আর মৃদঙ্গের ধ্বনিতে হয়ে উঠলো মুখরিত। অনির্বচনীয় এক পরিবেশের হলো সৃষ্টি। উত্তরকালে শিতিকণ্ঠ প্রভুর কৃপালাভ সম্বন্ধে বলেছিলেন—'এই এক দর্শনেই সব!'

এই হরিসভাকে কেন্দ্র করেই কৃষ্ণকীর্তনে আর গৌর নামের প্লাবনে সমগ্র নবদ্বীপ ধামকে আর গৌরজনের মনের আকাশকে আর একবার উজ্জ্বল করে তুলেছিলেন প্রভু জগদ্বন্ধু। মানবপ্রেমিক মহামানব জগদ্বন্ধু। নবদ্বীপ ধাম থেকে দূরে থেকেও মাঝে মাঝে ভক্তদের অপ্রাকৃত দর্শন দান করে মহানাম ব্রতে উজ্জীবিত করে তুলতেন।

এইভাবে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে লীলা করে হুগলী ঢাকা শহরকে প্লাবিত করে আবার এসে উপস্থিত হলেন ফরিদপুরে। ফরিদপুর শহরেরই উপকণ্ঠে ভক্তরা নির্মাণ করে দিলেন প্রভুর জন্য শ্রীঅঙ্গন। এখন থেকে এখানেই স্থায়ীভাবে অবস্থান করতে লাগলেন শত শত সহস্র সহস্র আর্ত মানুষের প্রাণের ঠাকুর প্রভু জগদ্বন্ধু। অবশেষে ধীরে ধীরে ডুব দিলেন অতীন্দ্রিয় জগতের গভীরে। ১৩০৯ সাল থেকেই শুরু হলো মৌনাবলম্বন। শ্রীঅঙ্গের প্রান্তে প্রভুর গম্ভীরা প্রকোষ্ঠ। বাইরের আলো সে গৃহে পারে না প্রবেশ করতে। মহাপুরুষের অন্তরের আলোকেই যে আলোকিত সে গৃহ। এইভাবে

ভাবানন্দে বিভোর হয়ে নিভৃতে রইলেন সুদীর্ঘ দশ বৎসর। অবশেষে ১৩২০ সন থেকে নিভৃত প্রকোষ্ঠ পরিত্যাগ করে মাঝে মাঝে ভক্তদের দর্শন দান করতে লাগলেন। এই সময়ে ভক্তপ্রবর মহেন্দ্রজী প্রভুর পরিচর্যার সৌভাগ্য লাভ করেন। মুসলমান ধর্মাবলম্বীরাও প্রভুর দর্শনার্থী হয়ে আসতো। এ বিষয়ে তাদের প্রশ্ন করলে বলতো, 'ইনি তো জগদ্বন্ধু! আমাদেরও তো বন্ধু! আমরা জগতের বন্ধুকে দর্শন করে ধন্য হতে এসেছি।'

প্রভু জগদ্বন্ধু সকলকেই অনুনয় করে বলতেন, 'এটা প্রলয়কাল। নামকীর্তনই সত্য। এ যুগে একমাত্র হরিনামই সৃষ্টি রক্ষার উপায়। ওগো, নামের যে বড় অভাব—কেবল হরিনাম কর, হরিনাম কর।' স্বতঃস্ফুরিত ভাবে প্রভুর অন্তর হতে উত্থিত হলো—

হরিনাম লও ভাই,
আর অন্য গতি নাই,
হের প্রলয় এল প্রায়।
যদি সৃষ্টি রাখ ভাই
হরিনাম কর প্রচার।

*　　*　　*

ভজ কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ লহ কৃষ্ণের
　　নাম রে।
যে জন কৃষ্ণ ভজে সেই আমার
　　প্রাণ রে।

অবশেষে ১৩২৮ সালের ১লা আশ্বিন প্রভু জগদ্বন্ধু ভক্তমণ্ডলীকে শোকসাগরে নিমগ্ন করে চিরদিনের জন্য কোটিসঙ্গীতের মধুরতার মধ্যে ডুব দিলেন। ধীরে ধীরে মহাসমাধিতে হলেন নিমগ্ন।

তখনও যেন ভক্তবৃন্দের কানে ভেসে আসে প্রভুর সুস্বরকণ্ঠের হরিনামগান, 'হরিনাম লও ভাই, হরিনাম লও।' আর নূতন প্রাণে উজ্জীবিত হয়ে কৃষ্ণকীর্তনে মুখরিত করে তোলে প্রভু জগদ্বন্ধুর লীলাভূমি। শ্রীঅঙ্গন। ভজ কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ লহ কৃষ্ণের নাম রে—।

ব্রহ্মচারী কুলদানন্দ

আকাশগঙ্গা পাহাড়শীর্ষের নির্জনে শ্বাপদসঙ্কুল পরিবেশে কঠোর সাধনায় ব্রতী হলেন যোগীবর। নবাগত সাধকের আগমনে বিচলিত হলো দস্যুসর্দার। এই বনপ্রদেশেরই নিভৃতে যে তাদের লুণ্ঠিত দ্রব্য থাকে লুক্কায়িত। যদি পুলিসে সংবাদ দেন! আর এই আশঙ্কায়ই সন্ত্রস্ত হয়ে নানাভাবে ভীতি প্রদর্শন করতে লাগলো নবীন সাধককে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। যোগীবর অচল। অটল। নামানন্দে বিভোর। অবশেষে হত্যা করবার সিদ্ধান্ত নিল দস্যুসর্দার। সাধন কুটিরের নিকটে বেলগাছ তলায় রাত্রির অন্ধকারে লুকিয়ে রইলো একজন দস্যু। সর্দারেরই নির্দেশে। শাণিত শস্ত্র হাতে। কিন্তু সফল হলো না। অকস্মাৎ পার্বত্য বৃশ্চিক দংশনের তীব্র জ্বালায় অধীর হলো দুর্বৃত্ত। চিৎকার করে উঠলো। ধ্যান ভঙ্গ হলো সাধকের। বিগলিত হলো অন্তর। ওষুধ দিয়ে সুস্থ করলেন দুঃস্থকে।

আবার একদিন রাত্রি শেষ প্রহরে সর্দারের নির্দেশে অপর একজন দুর্বৃত্ত অস্ত্র হাতে সাধন কুটিরের সন্নিকটস্থ একটি বৃক্ষে আত্মগোপন করে রইলো। সুযোগের অপেক্ষায়। পূর্ব আকাশে সূর্য দেখা দেবার প্রাকমুহূর্তে, ঊষা ভাস্বর ঈষৎ আলোকে হঠাৎ দেখতে পেলো সাধককে। কুটির থেকে বের হয়েছেন। আক্রমণোদ্যত হলো দস্যুপ্রবর। ঠিক সেই মুহূর্তেই এক ভীষণকায় অজগর সাপ বৃক্ষকোটর থেকে বের হয়ে জড়িয়ে ধরলো দুর্বৃত্তকে। শাণিত অস্ত্র মাটিতে পড়ে গেল। মৃত্যুযন্ত্রণায় অধীর হয়ে ভয়ার্ত কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠলো সে। বিচলিত হলেন যোগিরাজ। বৃক্ষনিম্ন থেকে উপর দিকে কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। দৃষ্টি বিনিময় হলো অজগরের

সঙ্গে। পরমুহূর্তেই অজগর দস্যুকে ছেড়ে দিয়ে অদৃশ্য হলো। যোগিরাজের পদতলে পড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করলো দুর্বৃত্ত। তিনি মৃদু হেসে ক্ষমা করলেন। তবুও চৈতন্য হলো না দস্যুসর্দারের। দস্যুসর্দার ভাবলেন এসব মনেরই দুর্বলতা। তাই তো নিজেই একদিন রাত্রির অন্ধকারে সুশাণিত অস্ত্র হস্তে দলবল নিয়ে সাধন কুটিরের নিভৃতে এসে দাঁড়ালো। হঠাৎ সেই অন্ধকারে বিদ্যুতের মত দীপ্তিস্ফুরিত দুই চোখের দৃষ্টি নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো হিংস্র এক চিতাবাঘ। তাদেরই সম্মুখে। নিরুপায় দস্যুদল ছুটে এসে আশ্রয় নিল যোগিরাজের পদতলে। আর অসহায়ের মত তাকিয়ে রইলো সৌম্যমূর্তির মুখের দিকে দস্যুসর্দার লংকটদাস। অসহায়কে অভয় দিলেন। দুর্বৃত্ত দলকে করলেন কৃপা। হিংস্র চিতা ভিন্ন পথে জঙ্গলের গভীরে হলো অদৃশ্য। দস্যুদল জানলো চিনলো যোগিরাজকে। বুঝতে পারল যোগ বিভূতি ম্যাজিক নয়। আধ্যাত্মিক শক্তিরই প্রকাশ। যোগীবরের প্রতি শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত হলো। আর কোনদিন উত্ত্যক্ত করেনি তারা।

এইভাবে সাধনবলে সেই দস্যুশক্তিকে পরাভূত করে নবাগত বৈষ্ণব সাধক নামানন্দে হয়ে রইলেন বিভোর। দস্যুশাসিত বনপ্রদেশের আতঙ্কও হলো দূরীভূত। সেই অলৌকিক বিভূতিসম্পন্ন যোগিরাজই হলেন আচার্য শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর মানসপুত্র শ্রীশ্রীঠাকুর কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী।

ইংরাজী ১৮৬৭ সনে, বাংলা ১২৭৪ সনের ১৪ই কার্তিক আবির্ভূত হলেন এই মহাপুরুষ বাংলার মাটিতে। ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার পশ্চিমপাড়া গ্রামে। পিতা কমলাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় আর মাতা হরসুন্দরী দেবী। কালী-উপাসক কমলাকান্ত তন্ত্রসাধনায় উচ্চ কোটির সাধক ছিলেন। সত্যনিষ্ঠার জন্য গ্রামের লোকে বলতো যুধিষ্ঠির-কমলাকান্ত। রূপে অতুলনীয়। দীর্ঘ ঋজু তাঁর দেহ। চম্পক বর্ণ গায়ের রং। মনে হতো স্বয়ং কন্দর্পদেবই

দেহ ধারণ করেছেন কমলাকান্ত নামে। বৈরাগ্য ও ধর্মপিপাসা তাঁর দেহ মনকে ছিল আচ্ছন্ন করে। তাইতো দেখা যায় তাঁর বিষয়-বিমুখ মন তাঁকে যুবা বয়সেই করেছিল ঘরছাড়া। পা বাড়িয়ে-ছিলেন হরিদ্বারের পথে। হরিদ্বার থেকে আর ফিরে আসবার ইচ্ছাও ছিল না। কিন্তু গুরুই তাঁকে হরিদ্বার থেকে ফিরিয়ে এনে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়েছিলেন। গুরু ছিলেন বেলপুকুরের সুপ্রসিদ্ধ তন্ত্রসাধক রজনীকান্ত ভট্টাচার্য। স্ত্রী হরসুন্দরী দেবী ছিলেন স্বামীর উপযুক্ত সহধর্মিণী। রূপবতী বধূ। সতী-সাধ্বী এই রমণীর ধর্মকর্মে অপূর্ব নিষ্ঠা, সেবাপরিচর্যায় ছিল অনলস উদ্যম। ক্ষমা সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য ছিল তাঁর অঙ্গের ভূষণ। স্বামী স্ত্রী উভয়েই ছিলেন ভগবৎ ভাবের ভাবুক। বিশাল অট্টালিকা নয়। ছোট গৃহ। ছোট সংসার। শান্তির সংসার। সংসার নয়, যেন ঋষির আশ্রম।

তন্ত্রশাস্ত্রের বিধান অনুসারে শ্যামাঙ্গী রমণী সাধনের সহায়। সাধনের সহায় রূপেই কমলাকান্ত দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন। এক শ্যামবর্ণা রমণীকে বধূ করে নিয়ে এলেন গৃহে। হরসুন্দরী দেবী বাধা দিলেন না। 'সতীন কাঁটা' মনে করে কোনদিন অশান্তির সৃষ্টিও করেননি। নিজের ছোট বোনটির মত স্নেহই করতেন। একটি পুত্রসন্তান জন্মাবার ছয় মাসের মধ্যেই কমলাকান্তের দ্বিতীয় স্ত্রী পরলোকগমন করলেন। হরসুন্দরী দেবী মাতৃহারা সেই শিশুকে আপন পুত্রের মতই করতে লাগলেন লালন পালন। হরসুন্দরী দেবীর ছিল চার পুত্র, তিন কন্যা।

কুলদাকান্ত হরসুন্দরী দেবীর সর্বকনিষ্ঠ চতুর্থ পুত্র। স্নেহময়ী জননীর ক্রোড়েই শিশুর প্রথম পাঠ হয় শুরু। রামায়ণ মহাভারতের অপূর্ব কাহিনী শোনে মায়ের কোলে বসেই। মাসের পর মাস চলে যায়। বছর ঘুরে আসে। আবার আসে নূতন সপ্তাহ। নূতন দিন। প্রতি দিবসের মতনই আসে শিশুর নিকট আর এক নূতন দিন। জননীর দেহের সংস্পর্শ থেকে মাতৃস্তনের দুগ্ধধারা থেকে দেহের মধ্যে জেগে ওঠে আনন্দের বন্যা। যে অজানা শক্তি তার

মধ্যে সুপ্ত হয়ে আছে ক্রমশঃ ক্রমশঃ যেন তা সুবিপুল্ হয়ে ওঠে। তার ছোট্ট শিশু-দেহের বদ্ধ কারায় যেন গর্জন করে উঠতে থাকে দুরন্ত সাগরতরঙ্গ।

আর একটি নূতন দিন। স্বপ্নময় আলোকময় নয়। বেদনাময়। দুঃখময়। পিতৃদেব ইহলীলা সম্বরণ করলেন। কুলদাকান্ত তখন মাত্র পাঁচ বৎসরের শিশু। বেদনার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হলো শিশু কুলদাকান্তের। তাঁর সম্মুখের সমগ্র অস্তিত্ব ব্যাপী যেন পড়ে রয়েছে বেদনার রাজ্য। এ যেন তারই পূর্বাভাস। আর এই বেদনার রাজ্যকে জয় করবার জন্যই যেন তাঁর এই পৃথিবীর মাটিতে জন্মলাভ।

জীবনের এই প্রথম বেদনাময় দিনগুলির স্মৃতি তাঁর অন্তরে নিত্য আন্দোলিত হতে থাকে। শস্যভরা মাঠের মতন, বায়ুবিতাড়িত অরণ্যের মতন, ভাসমান মেঘের মতন ক্ষণে ক্ষণে ছায়া ফেলে তারা চলে যায়।

ছায়ারা মিলিয়ে যায়। সূর্যের আলোকে অন্ধকার হয় বিদূরিত। আবার অরণ্য হয়ে ওঠে উদ্ভাসিত। রাত্রিও যেন হয়ে ওঠে আলোকময়ী। বাতাস মধুরতায় হয়ে যায় আর্দ্র। কোথায় তলিয়ে যায় তার দুঃখের ভার। ফুলের মতন হেসে ওঠে নির্মল শিশুর অন্তর। শিশু আলো-আঁধারের এই গোলকধাঁধার মধ্য দিয়ে পথ করে চলতে শেখে। তারপর একদিন এই শৈশব-লীলারও হয় অবসান। শুরু হয় বাল্যলীলা। বালক কুলদাকান্ত সহপাঠী বন্ধুদের সঙ্গে খেলাধূলায় থাকে মত্ত হয়ে।

আবার রাত্রি প্রভাত! নব ঊষা!

বন্ধুদের সঙ্গে খেলা করছে ছোট্ট কুলদাকান্ত।

হঠাৎ কে যেন বলে উঠলো, 'ওরে, তোদের বাড়ীতে গোঁসাই এসেছেন, শীঘ্র যা।'

ছোট্ট কুলদাকান্ত খেলা ফেলে ছুটলো। কিসের যেন এক আকর্ষণে। গোঁসাইকে দেখতে। বাড়ীতে প্রবেশ করেই দেখলো ঠাকুরঘরের পাশে শেফালিকা গাছের তলায় বিশালকায় এক পুরুষ

দাঁড়িয়ে রয়েছেন। হাতে একটি বৃহৎ দণ্ড। পায়ে জুতা। গায়ে জামা ও ময়ুরপঙ্ক্ষী রংয়ের জামিয়ার। কথা বলছেন নবকান্তবাবুর সঙ্গে। অপার বিস্ময়ে ছয় বৎসরের বালক কুলদাকান্ত তাকিয়ে রইলো সেই মহাপুরুষের মুখের দিকে। কুলদাকান্তকে ঐভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে মহাপুরুষ একটু স্নেহস্নিগ্ধ হাসির সঙ্গে বললেন,—'কি খোকা, খেলছিলে বুঝি? বেশ বেশ, খুব খেলা করগে যাও।'

বালক কুলদাকান্তের অন্তস্পর্শ করলো সামান্য ঐ কথাটি। আর ওঁর ঐ স্নেহমাখা দৃষ্টি তার দেহমনকে করে ফেললো আচ্ছন্ন। এই প্রসঙ্গে পরবর্তীকালে ব্রহ্মচারী কুলদানন্দ বলেন, * * * "তিনি নবকান্তবাবুর সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে ময়দানের দিকে চলিলেন। যাইতে যাইতে মুখ ফিরাইয়া আমার দিকে চাহিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই আকৃতি ও সস্নেহ চাহনিটি আজ পর্যন্তও আমি ভুলিতে পারি নাই। কেহ 'গোঁসাই' বলিলে আমি সেই 'গোঁসাই'কেই বুঝিতাম।"

এইভাবে ছয় বৎসর বয়ঃক্রমকালে অমৃতময় পুরুষ শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কৃপাদৃষ্টি লাভ করেছিলেন ভবিষ্যতের যোগিরাজ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী। গোঁসাইজির ভক্ত শিষ্য আশ্রিত মানসপুত্র রূপে করেছিলেন আত্মপ্রকাশ। বিজয়কৃষ্ণ ও কুলদানন্দ গুরু শিষ্য সম্পর্কের এক অভিনব ভাষ্য হয়ে উঠেছিলেন বাংলার সাধক সমাজে।

গ্রাম্য পাঠশালার পাঠ সাঙ্গ করে কুলদাকান্ত চলে এলেন ঢাকা শহরে। ভর্তি হলেন উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে। রইলেন মেজদা বরদাকান্তের তত্ত্বাবধানে। ছোড়দা সারদাকান্তও তখন ঢাকাতেই পড়াশুনা করছেন। বড় ভ্রাতা ডাক্তার হরকান্তের পুত্র সজনীকান্তও পড়বার জন্য এলেন ঢাকাতে। সমবয়সী সজনীকান্তকে সঙ্গীরূপে পেয়ে কুলদাকান্তও হলেন আনন্দিত। বাল্যের আনন্দমধুর দিনগুলি এই ভাবে ঢাকা শহরেই হতে লাগল অতিক্রান্ত।

এই সময়ে ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। তখনও বাঙ্গালী শিক্ষিত সমাজ খ্রীষ্টান-

ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার মোহে আচ্ছন্ন। হিন্দু সমাজে দেখা দিয়েছে নানা গ্লানি। তান্ত্রিক ও সহজিয়া বৈষ্ণবদের নানা অনাচার। অপরদিকে শুরু হয়েছে খ্রীষ্টান মিশনারীদের হিন্দু-ধর্ম সম্বন্ধে নানা অপপ্রচার। সেই সংকট-সন্ধিক্ষণে বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে করলেন প্রাণের সঞ্চার। সারা ভারতে উল্কাবেগে প্রচার করলেন সর্বাত্মক ব্রাহ্মধর্ম। দুর্জয় সাধনায় খ্রীষ্টান মিশনারী-দের সম্মুখে স্থাপন করলেন নূতন এক জাগৃতি। প্রমাদ গণলেন পাদ্রীসাহেবের দল। ভারতীয় সনাতন ধর্মের মর্মমূলে আঘাত হানবার অলীক স্বপ্ন টুটে গেল তাঁদের। বিজয়কৃষ্ণের সত্যনিষ্ঠা, সরল ব্যবহার, দেবদুর্লভ রূপ ও চরিত্র ব্রাহ্মধর্মের প্রচার ও প্রসারণে অভূতপূর্বভাবে সাহায্য করেছিল। ব্রাহ্মধর্মের জন্য নয়, বিজয়কৃষ্ণের প্রতিই আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল সেদিনের ঢাকার শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল মানুষেরাই। আকৃষ্ট হলেন বরদাকান্ত, সারদাকান্ত। আর মোহাচ্ছন্ন হলো বালক কুলদাকান্ত।

মেজ ভ্রাতা বরদাকান্ত প্রতিটি রবিবারে ব্রাহ্মমন্দিরের ব্রাহ্ম উপাসনায় নিজে যোগদান করতেন এবং উৎসাহিত করতেন যোগদান করবার জন্য ছোট দুই ভ্রাতা সারদাকান্ত ও কুলদাকান্তকে। ব্রাহ্মধর্মকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন সত্য কিন্তু হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁর ছিল না কোনরূপ অশ্রদ্ধা ও বিকৃত মনোভাব। আর এই মেজদার প্রভাবে অনেকখানি প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন কুলদাকান্ত। এই বরদাকান্তই কুলদাকান্তকে ডায়েরী লেখার দিয়েছিলেন প্রেরণা। যার ফলশ্রুতি-স্বরূপ বাঙ্গালী ভক্তসমাজ পেয়েছিল 'শ্রীশ্রীসদগুরু সঙ্গ' নামক অপূর্ব ধর্মগ্রন্থ।

ব্রাহ্মধর্মের প্রধান মন্ত্রই হলো নিজের হৃদয়ে সত্য প্রতিষ্ঠা করা। তাইতো সত্যানুসন্ধানী কুলদাকান্তের হৃদয়কে সহজেই স্পর্শ করেছিল ব্রাহ্মধর্মের বাণীগুলি। প্রথম ও প্রধান আকর্ষণ ছিল শৈশবের প্রাণ-ছোঁয়া মনছোঁয়া স্পন্দন জাগানো সেই মানুষটি—গোঁসাই। প্রাণের ঠাকুর গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ। আর পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠাতা

সত্যনিষ্ঠ নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গলাভ ছিল বালক কুলদাকান্তের দ্বিতীয় আকর্ষণ। ধীরে ধীরে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়লো সে। শুধু সমাজের উপাসনায় যোগ দিয়েই ক্ষান্ত হলো না। বাড়ীতেও নিয়মিতভাবে উপাসনা করতে লাগলো। সে উপাসনা ছিল আন্তরিকতাপূর্ণ। মন প্রাণ ঢালা। নিবিড় একাগ্রতা আর উদ্দাম আগ্রহ নিয়ে তন্ময় হলো সে ঈশ্বর-চিন্তায়।

অপরদিকে পড়াশুনার প্রতি অন্যমনস্কতা, অমনোযোগিতা বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হলো। চিন্তিত হলেন মেজদা বরদাকান্ত। শাসন করলেন ছোট ভাইকে। কিন্তু ফল কিছুই হলো না। বিদ্যালয়ের গতানুগতিক অধ্যয়নে তার আগ্রহ দিনে দিন হ্রাস পেতে লাগলো, একটা রহস্যময় প্রাণশক্তি যেন তাকে উদ্বেল করে তুললো। বিচিত্র সে শক্তি! তাকে সে অনুভব করছে। অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই। ভিতর হতে বাহরে আসবার জন্য সে শক্তি তাকে উৎক্ষিপ্ত করে তুলছে। সমস্ত অন্তর আলোড়িত করে দুরন্ত এক দুর্বার বাসনা জেগে উঠছে। ঈশ্বরকে লাভ করবার। আনন্দময়ের সঙ্গলাভের বাসনা। তাঁকে শুধু জানা নয়। দেখা পাওয়া। নিবিড় করে পাওয়া। একান্ত আমার করে পাওয়া। সেই পরমতম আনন্দময়কে পাওয়ার চেষ্টায় উদভ্রান্ত কুলদাকান্ত। ঈশ্বর চিন্তা যেন পেয়ে বসলো কিশোর কুলদাকান্তকে।

আবার সৃষ্টি হলো অন্তর্দ্বন্দ্বের। একদিকে আবাল্যের হিন্দু-সংস্কার। অপরদিকে ব্রাহ্মধর্মমতের আকর্ষণ। হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতা। জাতিভেদের ক্ষুদ্র গণ্ডি। আচার বিচারের কঠোরতা। সেই সঙ্গে ব্রাহ্মধর্মের সর্বব্যাপী পরব্রহ্মের উপাসনা। উদার মতবাদ। সত্যে অবিচল নিষ্ঠা। এই দুই বিরুদ্ধ ভাবের সংঘাতে পড়ে তরুণ কুলদাকান্ত হয়ে পড়লো বিভ্রান্ত। সংশয়ের দোলায় দোলায়িত হতে থাকে তার চিত্ত। আবার গোস্বামী প্রভুর প্রভাব থেকেও হতে পারছে না মুক্ত। অকস্মাৎ একদিন গোস্বামী প্রভুকেই দর্শন করলো স্বপ্নে। ব্রাহ্মমন্দিরের বাগানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। শিউলি গাছের নীচে। হাতের ইশারায় কাছে ডেকে বলছেন, 'ওহে, শীঘ্র এদিকে

চলে এস। যে বস্তু তুমি চাও আমি তোমাকে তাই দেবো।' যেন করুণা ও মমতার মূর্ত বিগ্রহ। আকুল প্রাণে মাথা লুটিয়ে প্রণাম করলো কুলদাকান্ত গোস্বামী প্রভুকে। অশ্রুসজল চোখে বললো, 'প্রভু, আমাকে ভগবান লাভের পথ বলে দিন।' পরমুহূর্তেই ঘুম ভেঙে গেল কুলদকান্তের। জাগ্রত অবস্থায়ও তাঁর দর্শন এবং অনুভূতি প্রত্যক্ষ বলেই বোধ হতে লাগলো। কেবলই মনে হতে লাগলো গোস্বামী প্রভু তারই অপেক্ষায় বাগানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। গোস্বামী প্রভুর সেই করুণা ও মমতাপূর্ণ চাহনি, সেই মৌন আহ্বান কুলদাকান্তকে আকুল করে তুললো।

ভোর হতেই ব্যাকুল হয়ে ছুটে চললো সমাজমন্দির অভিমুখে। কিন্তু তখনও দরজা খোলা হয়নি। দ্বার রুদ্ধ। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করেই দেওয়াল টপকিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলো নবীন ভক্ত কুলদাকান্ত। বাগানে প্রবেশ করে সত্য সত্যই দেখতে পেলো সে শিউলি গাছের নীচে স্বপ্নদৃষ্ট গোস্বামী প্রভু দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আর দ্বিধা নয়, সংকোচ নয়। ছুটে গিয়ে গোঁসাইয়ের পায়ে লুটিয়ে পড়লো। চক্ষুর্দ্বয় হতে নির্গত হতে লাগলো অশ্রুধারা ঝরণাধারার মত। আকুল প্রাণে বললো, 'প্রভু, আমায় কৃপা করুন। আমার যে সাধন নিতে খুব ইচ্ছা হয়।'

গোঁসাইজী হাত ধরে তুলে সস্নেহে বললেন, 'খুব ভাল কথা। এই-ই তো সময়। এই বয়স থেকেই তো এসব করতে হয়। এখন আমি পশ্চিমে যাচ্ছি। পশ্চিম থেকে ঘুরে আসি। আর তোমাদেরও তো স্কুল পূজার ছুটি। বাড়ী থেকে ঘুরে এসো। পরে সাধন হবে। সময়ে সব হবে। চিন্তা করো না। মনকে সর্বদা প্রফুল্ল রাখবে।'

কুলদাকান্তের অশান্ত মন সাময়িকভাবে শান্ত হলো। গোঁসাইজীর স্নেহমিশ্রিত উপদেশবাণী শ্রবণ করে। পূজার ছুটিতে বাড়ীতে এলো বড় ভাইয়ের সঙ্গে। এখানেও একদিন এক মুসলমান ফকিরের উপদেশবাণী শুনে মনের সংশয় অনেকখানি হলো বিদূরিত। নিজে থেকেই এসে হবিবুল্লা ফকির বললেন কুলদাকান্তকে,

'—ওহে জেনে রাখো, মানুষ আপন আপন প্রবৃত্তি অনুসারে চলে। সকলের প্রবৃত্তি এক নয়। কাজেই ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন কাজ দেখতে পাওয়া যায়। ধর্মসাধন বিষয়েও সেইরূপ জানবে। সাধক তাঁর প্রবৃত্তি ও সংস্কার অনুযায়ী পথেই চলে থাকে। এবং তাতেই তাঁর সিদ্ধিলাভ হয়। হিন্দু মা-কালীর পূজা করে। আর মুসলমান করে আল্লার পূজা। আসলে সকলেই এক ভগবানের উপাসনা করে। প্রবৃত্তির পার্থক্য অনুসারে পূজা উপাসনার পদ্ধতিরও পার্থক্য হয়। কেউ ছোট, কেউ বড় নয়। সকলেরই যে উদ্দেশ্য এক। কাজেই এজন্য কাউকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে গেলে সত্যস্বরূপ সেই ভগবানকেই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা হয়।'

কথা কয়টি বলেই ভগবৎ ভাবের পাগল হবিবুল্লা ফকির কুলদাকান্তকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করে ছুটে চলে গেলেন দৃষ্টির বাইরে। কুলদাকান্তের অন্তস্পর্শ করলো কথাগুলি। 'হিন্দু ধর্মের মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে ওর মনে যে বিরুদ্ধ ভাব ছিল এ যে তারই উত্তর।' বিস্মিত ও অভিভূত হলো। পাগলা ফকিরের উপদেশ-বাণী কুলদাকান্তের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করলো। প্রতিজ্ঞা করলো, এখন থেকে আর কখনও কোন ধর্মকে বা ধর্মমতকে করবে না অবহেলা। গোঁসাইজীর কাছেই সাধন নিতে হবে। সেটা কি এবং কবে হবে? --এই চিন্তাই কুলদাকান্তের হৃদয় মনকে অস্থির করে তুললো। প্রকাশ্যে কিছু বলে না। কিন্তু মাতাঠাকুরাণী পুত্রের মনোগত ভাব বুঝতে পেরে বললেন, 'ওরে, ধর্ম ধর্ম ক'রে পৈতাটা যেন ফেলিস না। গলায় পৈতাটা রেখে ধর্ম করিস। ঠাকুর তোর মনস্কামনা পূর্ণ করবেন। আশীর্বাদ করছি।'

মায়ের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে কুলদাকান্ত আবার ফিরে এলেন ঢাকায়। পূজার ছুটি শেষ হয়েছে। স্কুল খুলে গেছে।

অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম ভাগে গোস্বামী প্রভুও ফিরে এলেন ঢাকায়। ভিন্ন এক মূর্তিতে, ভিন্ন এক ভাব নিয়ে। ব্রহ্মজ্ঞানের

শুষ্ক পথ ছেড়ে প্রেমভক্তির চিরমধুর পথকেই আশ্রয় করলেন। গয়া আকাশগঙ্গা পাহাড়ে শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ পরমহংসজীর নিকট অলৌকিক ভাবে দীক্ষালাভের পরই তাঁর ধর্মজীবনে আমূল পরিবর্তন হয়। বিভিন্ন ধর্মপথ পরিক্রমার পর বিজয়কৃষ্ণ শ্রীচৈতন্য প্রদর্শিত প্রেম-ভক্তির মহিমান্বিত পথকেই ধর্মলাভের প্রকৃষ্ট পথ বলে মনে করলেন। বিশ্বাস করলেন অন্তর দিয়ে। তাইতো নবগৌরাঙ্গ রূপে আবির্ভূত হলেন ঢাকা শহরে। বৈষ্ণব বাউলদের প্রেমসঙ্গীতে তাঁর গৃহ প্লাবিত হয়ে উঠলো। ভক্তপ্রাণে প্রেমভাবের তরঙ্গমালা প্রবাহিত হয়ে চললো। গোস্বামী প্রভু ঘন ঘন ভাবসমাধিতে ডুবে যান। বাহ্য-জ্ঞান তিরোহিত হয়। মহাভাবে বিভোর হয়ে থাকেন। আত্মানু-ভূতির শুভ্র আলোকচ্ছটায় তখন তাঁর মানবমূর্তি দেবমূর্তিতে হয় রূপান্তরিত। যেন পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের রূপেরই প্রতিচ্ছায়া। সে মূর্তি নয়নগোচর করে মুগ্ধ ও অভিভূত হন ভক্তবৃন্দ। হিন্দু ব্রাহ্মণ খৃষ্টান মুসলমান সকলেই। সে এক নূতন দৃশ্য। অপ্রাকৃত রাজ্য। দলে দলে ভক্তবৃন্দ এসে ভীড় করছেন। ব্রাহ্মসমাজে আবার আনন্দের হাট বসে গেছে। নূতনত্বের নবনবায়মান রসমাধুর্যে ভক্তবৃন্দের অন্তর হয়ে উঠছে ভরপুর। হিন্দু ব্রাহ্ম উভয় সম্প্রদায়ের নরনারীই এই আনন্দের সমান অংশীদার। হিন্দুরা বলেন গোস্বামী প্রভু হিন্দুধর্মে দীক্ষিত হয়েই এই নূতন জীবন লাভ করেছেন। ব্রাহ্মরা বলেন গোস্বামী প্রভুর এই অপূর্ব জীবন ব্রহ্মসাধনারই ফল। ব্রাহ্মসমাজেরই মহান দান। গোস্বামী প্রভু তাঁর চারিদিকে যে আনন্দের হাট বসিয়েছেন সে হাটে বেচাকেনার সকলেরই সমান অধিকার। কুলদাকান্তও এসে উপস্থিত হয়েছে। এই কয়েক মাসে তারও মানসিক জগতে অনেকখানি পরিবর্তন হয়েছে। পৈতা ফেলে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেওয়াই এখন আর বড় নয়, গোঁসাইজীর কাছ থেকে সাধন নেওয়াটাই একমাত্র জীবনাদর্শ। অন্তরের আকাঙ্ক্ষা। সে যে-কোন ধর্মমতই হোক না কেন। গোঁসাইজীই এখন তার জীবনস্বপ্ন হয়ে উঠেছেন। গোঁসাইজী কুলদাকান্তকে

হুটি সর্তে দীক্ষা দিতে হলেন সম্মত। প্রথম সর্ত কুলদাকান্তকে নিজ অধ্যয়নে ব্রতী থাকতে হবে। নিয়মিত পড়াশুনা করতে হবে। দ্বিতীয় সর্ত অভিভাবকদের কাছ থেকে অনুমতি আনতে হবে। দ্বিতীয় সর্ত প্রতিপালনই কুলদাকান্তের পক্ষে কঠিন ব্যাপার হয়ে উঠলো। ছোড়দা ও মেজদা অনুমতি তো দিলেনই না, আরও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। উপায়ান্তর না দেখে আবার শরণাপন্ন হলো সে গোঁসাইজীর।

—তোমার বড়দা কোথায় থাকেন? জিজ্ঞেস করলেন গোঁসাইজী।

—বড়দা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ফয়জাবাদে অ্যাসিস্টান্ট সার্জন।

—তুমি অনুমতির জন্য তাঁকেই লিখে দাও। তিনি অনুমতি দিবেন।

—যদি তিনি অনুমতি না দেন তাহলে কি হবে?

—আহা, গোঁসাইজী যখন বলছেন, তখন লিখেই দাও হে। আর প্রশ্ন করতে হয় না। বাধা দিয়ে বললেন উপস্থিত একজন ভক্ত মানুষ।

গোঁসাইজী তখন শুধু মৃদু মৃদু হাসছেন। মনে মনে বিরক্ত হলেন কুলদাকান্ত। এসব যুক্তিহীন অন্ধ বিশ্বাস ছাড়া কিছুই নয়। মনে মনে ভাবলেন। বাইরে কিছুই প্রকাশ করলেন না। প্রত্যুত্তরও কিছু করলেন না। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে লিখে দিলেন মনের ইচ্ছা। সবকিছু।

পত্র পাওয়াব সঙ্গে সঙ্গেই উত্তবে লিখলেন বড়দা—ডাক্তার হরকান্ত,—'ভগবানকে লাভ করার জন্য তুমি যে পথ অবলম্বন করতে ব্যস্ত হয়েছো, তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। বরং সন্তোষের সঙ্গে উৎসাহই দিচ্ছি। কিন্তু মা আমাদের বর্তমান আছেন, সুতরাং এ বিষয়ে শুধু আমাকে জিজ্ঞেস না করে মারও অনুমতি লওয়া উচিত।'

পত্র নিয়ে ছুটে এলো উদ্‌ভ্রান্ত কুলদাকান্ত গোঁসাইজীর কাছে। গোঁসাইজী সবকিছু শুনে বললেন,—'এখন তুমি একদিন বাড়ী যেয়ে মার অনুমতি নিয়ে এসো। তা হলেই হয়।'

বিচলিত হয়ে কুলদাকান্ত বললো,—'যোগের কথা শুনলে মা কিছুতেই অনুমতি দিবেন না। অমনিতেই তাঁর ভয় আমি ধর্ম ধর্ম করে যদি সংসার ছেড়ে চলে যাই।'

—মাকে যোগটোগ কিছু বলো না। শুধু 'সাধন নিব' এই কথা বলো। তাহলেই তিনি অনুমতি দিবেন। বললেন গোঁসাইজী।

আবার ছুটলো কুলদাকান্ত গ্রাম অভিমুখে। মায়েয় কাছে। হঠাৎ পুত্রকে দেখে মা চিন্তিত হলেন। পরে সবকিছু শুনে জিজ্ঞেস করলেন,—'তুই কি পৈতা ফেলে ব্রাহ্ম হবি?'

—না মা, তা নয়। আমি গোস্বামী প্রভুর কাছে সাধন নিব। তুমি অনুমতি না দিলে তিনি যে দীক্ষা দেবেন না।

এবারে জননীর ভয় দূর হলো। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে আশীর্বাদ করলেন পুত্রকে। তারপর সস্নেহে বললেন,—'আমি তো নিজে আর ধর্মটর্ম কিছুই করতে পারলাম না। তোরা যদি করিস নিষেধ করবো কেন? তুই ধর্মকর্ম করবি, সাধনভজন করবি, তাতে আমার খুব আনন্দ। তবে তুই পৈতাটা ফেলিস না, আর আমি জীবিত থাকতে নিরুদ্দেশ হয়ে যাস না। সংসারে থেকেই ধর্মকর্ম করিস।'

মায়ের চরণধূলি মাথায় নিয়ে কুলদাকান্ত আবার ফিরে এলো ঢাকায়। গোঁসাইজীর কাছে। সবকিছু খুলে বললো ভক্তপ্রাণ নবীন যুবক কুলদাকান্ত গোস্বামী প্রভুকে।

গোঁসাইজী সন্তোষ প্রকাশ করে বললেন,—'বেশ হয়েছে, তুমি বৃহস্পতিবার দিন ভোরে স্নান করে এসো। তাহলেই হবে।'

অবশেষে বাংলা ১২৯২ সনের ২রা পৌষ (ইংরাজী ১৮৮৬ সালের ডিসেম্বর মাসে) বৃহস্পতিবার দিন প্রত্যুষে কুলদাকান্ত যোগসাধনার দীক্ষা গ্রহণ করলেন। শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নিকট হতে। জীবনস্বপ্ন সফলতার পথের প্রথম পদক্ষেপ হলো শুরু। সদ্‌গুরু লাভের আকুতি হলো পূর্ণ।

'পরমহংসজী দয়া করে তোমাকে এই মন্ত্র দিচ্ছেন। তুমি গ্রহণ কর।' এই বলে সর্বার্থসাধক মহামন্ত্র তাঁকে প্রদান করলেন গোস্বামী প্রভু। পরমুহূর্তেই সমাধিস্থ হলেন। গুরু শিষ্যের অন্তরে দীক্ষা বীজ করলেন রোপণ। করলেন শক্তিস্ফুরণ। ধীরে ধীরে মন্ত্রশক্তির ক্রিয়া শুরু হলো তরুণ তাপসের দেহে, মনে, আত্মায়। কুলদাকান্ত হলেন কুলদানন্দ। দিব্য-জীবন লাভ হলো। ব্রাহ্মধর্মের প্রচারক বিজয়কৃষ্ণ নয়, হিন্দুকুলতিলক সনাতন ধর্মের ঋষি সর্বদলের সর্বসম্প্রদায়ের মহাত্মা শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নিকট হতেই মন্ত্রচৈতন্য লাভ করেছিলেন আজন্ম ব্রহ্মচারী কুলদানন্দ। বালক ছাত্র ভক্তপ্রাণ কুলদাকান্ত রূপান্তরিত হলেন সাধক কুলদানন্দে।

শুধু নিজে দীক্ষিত হয়েই সন্তুষ্ট হলেন না। ধীরে ধীরে সমস্ত পরিবারটিকেই শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণের চরণতলে টেনে এনেছিলেন। এবং ভবিষ্যৎ জীবনে সমগ্র বঙ্গভূমির মুমুক্ষু মানুষদের ধর্মজীবন লাভের পথনির্দেশ করেছিলেন।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী কুলদানন্দের ভাইদের সম্বন্ধে মন্তব্য করে বলেন,—'তোমাদের দেখলে মনে হয় তোমরা চার ভাই যেন আগে থেকেই পরামর্শ করে পৃথিবীতে এসেছ। যদিও বাইরে থেকে সাধারণ আচারে ব্যবহারে তোমাদের প্রত্যেকেরই একটা স্বাতন্ত্র্য আছে, কিন্তু এটুকু বেশ স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, তোমাদের মন একই উপাদানে গঠিত। সুবর্ণযুগের তোমরা এক একটি স্তম্ভস্বরূপ।'

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ডাক্তার হরকান্তকে বলেছিলেন লোকনাথ ব্রহ্মচারী. —'তুমি তো মহাপুরুষ। ছদ্মবেশে বাবু সাজিয়া আমার কাছে আসিয়াছ।'

মেজ ভ্রাতা বরদাকান্তকে বলেছিলেন যোগিরাজ গম্ভীরনাথজী,—'আপ্ তো ব্রহ্মচারী হ্যায়। প্রাজাপত্য ব্রহ্মচারী।'

সত্য সত্যই তিনি ছিলেন গৃহী এবং গৃহে থেকেও শ্রীশ্রীবিজয়-কৃষ্ণের মত ছিলেন মুক্তযোগী। ধর্মমুখীন ছিল তাঁর কর্মজীবন। গুরু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নির্দেশেই তাঁর কর্মজীবন পরিচালিত হতো।

পরবর্তীকালে আইন ব্যবসা পরিত্যাগ করে গুরুর চরণে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করেন এবং আশ্রমজীবন যাপন করতে থাকেন। দিব্যজীবন লাভ করে ঠাকুর শ্রীশ্রীবরদাকান্তে রূপান্তরিত হয়েছিলেন।

আর তৃতীয় ভ্রাতা সারদাকান্তকে ভক্তরা বলতেন গোস্বামী প্রভুর সেবায়েৎ সারদাকান্ত। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ শিক্ষায় শিক্ষালাভ করেও সে যুগের পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে চিরজীবন গুরু বিজয়কৃষ্ণের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তিনি রচনা করেন 'আচার্য্য-প্রসঙ্গ' গ্রন্থ। শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর জীবনকথা। শুধুমাত্র সেবায়েৎ সারদাকান্ত নয়—বৈষ্ণব সারদাকান্ত।

এই হলো ব্রহ্মচারী কুলদানন্দের সহোদর ভাইদের পরিচিতি। মানসিক গঠন। ধ্যানধারণা, জীবনদর্শন। এমনই উদার হৃদয়বান ভগবৎ ভাবের ভাইদের সাহচর্য লাভ না পেলে কি কুলদানন্দের এমন অমৃতময় আধ্যাত্মিক জীবন গড়ে উঠতে পারতো?

ক্রমে ক্রমে বিজয়কৃষ্ণের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের মতবিরোধ তীব্রতর হয়ে উঠতে লাগলো। এই বিরোধ চরমতম অবস্থায় পরিণতি লাভ করবার পূর্বেই সন্ন্যাসী বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্মধর্ম প্রচারকের পদ পরিত্যাগ করলেন। চলে এলেন ঢাকার উপকণ্ঠে গেণ্ডারিয়া পল্লীর নির্জনে। প্রতিষ্ঠা করলেন আশ্রম। আর কুলদানন্দ পড়া ছেড়ে দিয়ে ব্রতস্থ ব্রহ্মচারীর কর্তব্যে করলেন আত্মনিবেশ। গেণ্ডারিয়া আশ্রমে গোঁসাইজীর কাছেই থাকতে লাগলেন। নিত্যসঙ্গী লীলাসহচর হয়ে। আর শত শত অনুবর্তীগণও সনাতন ধর্মের পথকেই জীবনাদর্শ করে বিজয়কৃষ্ণকেই করলেন অনুসরণ। শুরু হলো ধুলট উৎসব। পাঠ গান নৃত্য ভোজন প্রসাদ বিতরণ সবকিছুর মধ্য দিয়ে নূতন আশ্রমে যেন বসে গেল আনন্দের বাজার। মহামহোৎসবের আনন্দে বিভোর সকলে। অভূতপূর্ব ধর্মপ্লাবনে গুরুদেবের এক অভিনব মহিমময় রূপ প্রত্যক্ষ করলেন কুলদানন্দ। নূতন করে অনুভব করলেন

তাঁর অনন্ত শক্তির অফুরন্ত উৎস। অনির্বচনীয় আনন্দে। ভজনানন্দে বিভোর হয়ে রইলেন নবীন তাপস কুলদানন্দ।

এই ভাবে দিন সপ্তাহ মাস বছরের পর বছর হলো অতিক্রান্ত। আবার একটি নূতন দিন আলোকিত হয়ে উঠলো কুলদানন্দের জীবনে। ১২৯৭ সালের ১২ই শ্রাবণ শ্রীবৃন্দাবনধামে গোস্বামী প্রভু ব্রহ্মচর্যব্রত দান করলেন তাপস কুলদানন্দকে। গোঁসাইজী নিজে সন্ন্যাসী হলেও প্রিয়তম শিষ্য কুলদানন্দকে সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন না। কঠোরতর নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য ব্রত দান করলেন। বেদের এই নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য ব্রতটি বড় কঠিন সাধনা। সুদীর্ঘ বারোটি বৎসর ধরে কঠোর নিয়মের ভেতর থেকে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করতে হয়। নবীন যুবক কুলদানন্দ হলেন ব্রহ্মচারী কুলদানন্দ। গোস্বামী প্রভুর সহধর্মিণী যোগিনী যোগমায়াদেবীও খুবই স্নেহ করতেন কুলদানন্দকে। একদিন উপদেশছলে বলেছিলেন,—'কুলদা, তুমি যদি ধর্মজগতে বড়লোক হতে চাও, ধনী হতে চাও—তাহলে কৃপণ হয়ো। নিজের কোন অবস্থাই কারুকে বলো না। বললে আর তা থাকে না।'

কুলদানন্দ সমস্ত জীবন ধরে যোগমায়াদেবীর এই নির্দেশটি প্রতিপালন করেছেন। সাধনজীবনে সর্বোচ্চ অবস্থা লাভ করেও আত্মগোপন করবার চেষ্টা করেছেন সর্বদা। কুলদানন্দের চরিত্রের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল অকপটভাবে সত্যকে প্রকাশ করা। নিজের চরিত্রের দুর্বলতাকে কখনও গোপন করবার চেষ্টা করতেন না, কোন অবস্থায়ই।

ব্রহ্মচর্য ব্রতের দ্বিতীয় বৎসরে গোঁসাইজী শিষ্য কুলদানন্দকে রুদ্রাক্ষ পরিয়ে দিয়ে নীলকণ্ঠ বেশে সাজিয়ে দিলেন। অপূর্ব সে সাক্ষাৎ সদাশিব মূর্তি। ব্রহ্মচারী কুলদানন্দ হলেন নীলকণ্ঠ শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী।

'ঠিক ঠিক নিয়ম পালন করে চললে কতদিনে সিদ্ধিলাভ হয়?' জিজ্ঞেস করছেন কুলদানন্দ।

'সিদ্ধি বললে কি বুঝ? অলৌকিক শক্তি বা যোগৈশ্বর্য লাভই তো সিদ্ধি নয়। নামে সিদ্ধিই প্রকৃত সিদ্ধি। প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যখন আপনা হতে নাম করতে থাকবে তখনই জানবে সিদ্ধি হয়েছে। বিষয়ে অনাসক্ত এবং নির্লোভ হলেই তবে নামে রুচি জন্মে।' প্রত্যুত্তরে বললেন গোস্বামী প্রভু।

আবার বলছেন, 'অভিমান নষ্ট হলেই চিত্তে চৈতন্য প্রকাশ পাবে। অনুগত না হলে গুরুকৃপা বোঝা যায় না। গুরুকৃপা না হলে ব্রহ্মচর্য হয় না। আনুগত্যই ব্রহ্মচর্য।'

কিন্তু সে গুরুকৃপা কোথায়? মনের কোলাহল তো শান্ত হলো না। এখনও তাঁর মনের স্বপ্নে আনাগোনা করে পৃথিবীর পিপাসা। মন সন্ন্যাসী হতে পারেনি। দেহটাই শুধু সন্ন্যাসীর রূপ ধারণ করেছে। অশান্ত অনুতপ্ত মনে নানা প্রশ্ন জাগে। এক বিধবা রমণীব অনুরোধকে ঠেলে ফেলতে পারেননি নবীন যুবক কুলদানন্দ। গিয়েছিলেন তার বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করতে।

—কি কুলদা, কেমন বেড়িয়ে এলে? হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন গোঁসাইজী। বাক্যে তীক্ষ্ণ শ্লেষের সুর।

—এতদিন সদ্‌গুরু সঙ্গ করেও যদি আমার দুষ্প্রবৃত্তি না যায় তবে আমি আর কি করতে পারি? প্রত্যুত্তরে বললেন কুলদানন্দ।

চমকে উঠলেন গোস্বামী প্রভু। আরও তীব্রস্বরে বললেন,— 'সদ্‌গুরু সঙ্গ? সে তো অনেক দূরের কথা। সৎসঙ্গও তোমরা ঠিকমত কর না। করলে কি আর দুষ্প্রবৃত্তি থাকতে পারে? খেয়ালখুশি মতন সাধুসঙ্গে দু'চারটা ভাল কথা বললেই সাধুসঙ্গ হয় না। সাধু চরিত্রের অনুশীলনই সাধুসঙ্গ। সৎসঙ্গ। সাধুসঙ্গে থেকে নিজের দোষত্রুটি ভাল করে পর্যবেক্ষণ করে তা সংশোধন করতে হয়। তাকেই বলে সৎসঙ্গ।'

কুলদানন্দ এবারে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হলেন।

এইভাবে গোস্বামী প্রভু শিষ্য কুলদানন্দের প্রতিটি কর্ম ও চিন্তার উপর লক্ষ্য রেখে তাঁকে তাঁর সাধনার পথে পরিচালিত করতে-

লাগলেন। যুবক কুলদানন্দের দেহসৌষ্ঠব বর্ণলালিত্য কমনীয় মুখশ্রী ও অমায়িক স্নিগ্ধ ব্যবহার চঞ্চল প্রকৃতি যুবতী নারীদের লক্ষ্যস্থল করে তুলেছিল। তাইতো একটির পর একটি পরীক্ষার ঝড় তাঁর উপর দিয়ে বয়ে যেতে লাগলো। কত প্রলোভন কত মোহ কত পীড়াদায়ক প্রত্যাখ্যানের মধ্য দিয়ে তাঁর সাধনার জীবনতরী বেয়ে যেতে হয়েছে। গুরুকৃপা না হলে কি সম্ভব ছিল? গোঁসাইজী বলতেন, গুরু হওয়া কি মুখের কথা? গুরুগিরি কি ভয়ানক ব্যাপার। শিষ্যের ভোগ গুরুকে ভুগতে হয়।

তবে কুলদানন্দ জীবনের ছোট বড় কোন ঘটনাকেই চরিত্রের দুর্বলতম মুহূর্তের ব্যাপারকেও গুরুর কাছে গোপন করবার চেষ্টা করেননি। সম্পূর্ণরূপে নিজেকে আত্মসমর্পণ করেছিলেন গুরুর শ্রীচরণে।

কুলদানন্দ যাত্রা করলেন হরিদ্বারের পথে। গুরুর নির্দেশে। ১২৯৯ সনের ২৭শে ফাল্গুন। হরিদ্বারে এসে রওনা হলেন চণ্ডী-পাহাড় অভিমুখে। পাহাড়শীর্ষে চণ্ডীমাতার পূজা দিয়ে স্বামী কেশবানন্দজীর আশ্রমে নিলেন আশ্রয়। কঠোর নিয়মশৃঙ্খলা ও সংযমের জীবন যাপন করতে লাগলেন। কিছুদিন পর চণ্ডীপাহাড়ের নিম্নভাগে দামপাড়ে সাধন কুটির নির্মাণ করে সাধনভজনে মনোনিবেশ করলেন। জীবিকানির্বাহ হতো ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করে। সাধনভজনে প্রগাঢ় অনুরাগ আর আন্তরিকতা দর্শন করে হরিদ্বার কংখলের সাধুরা বলতেন গুণীদাদা। কুলদানন্দ নয়, গুণীদাদা নামেই ঐ অঞ্চলে পরিচিত হয়ে উঠলেন অল্পসময়ের মধ্যে।

একদিন সকালবেলা আসনে বসে প্রাণায়াম করছেন হঠাৎ শুনতে পেলেন ফোঁস ফোঁস শব্দ। পিঠের দিক হতে আসছে। বাইরে এসে দেখলেন বিশাল কৃষ্ণবর্ণ এক বিষধর সর্প বেড়া ফাঁক করে ঘরে ঢুকবার চেষ্টা করছে। ওঁকে দেখেই অদৃশ্য হয়ে গেল। অন্যান্য সাধুরা শুনে বললেন কুলদানন্দ যেখানে আসন পেতেছেন ঠিক তারই নিচে সাপের গর্ত। বাসস্থান। আর ওটি ভয়ঙ্কর জাতসাপ। সাধুরা সকলেই

জানেন। সুতরাং আসনের স্থান পরিবর্তন করা দরকার। সবকিছু শুনেও কুলদানন্দ আসনের স্থান পরিবর্তন করলেন না। গুরুর উপর নির্ভর করে সাধনভজন নিয়মিত ভাবেই করে যেতে লাগলেন।

আবার একদিন সর্ সর্ শব্দে চোখ মেলে দেখেন। সামনেই বেড়ার ফাঁক দিয়ে ভীষণকায় সেই সাপটি এক হাত আন্দাজ ঘরে ঢুকে মস্ত বড় ফণা তুলে ডাইনে বাঁয়ে দুলে দুলে ফোঁস ফোঁস করছে। যোগীবর তবুও আসন পরিত্যাগ করলেন না। কারণ গোঁসাইজীর নির্দেশ ছিল যে, একবার আসনে বসলে নিত্যক্রিয়া শেষ না করে আসন ত্যাগ করা উচিত নয়। সুতরাং অন্যান্য সাধুদের ডাকলেন। তাঁরা এলে সাপটি আবার অদৃশ্য হয়ে গেল। সাপটি অবশ্য কুলদানন্দের কোনও ক্ষতি করেনি। এই ভয়ঙ্কর বিষধর সর্পটি ছিল কুলদানন্দের চণ্ডীপাহাড়ের সাধনজীবনের লীলাসহচর। নিত্যসঙ্গী।

কুলদানন্দের চণ্ডীপাহাড়ের সাধনজীবন নির্ভিকতা ধৈর্য ও সহনশীলতা পরীক্ষার জীবন। দুই তিন ক্রোশ দূরে লোকালয়ে গিয়ে ভিক্ষা করতেন। আহার্যও ছিল অতি সামান্য। সকালে দু-তিনটি বেলপাতা, একটু চিনি ও ঘিয়ের সঙ্গে আহার করে এক গ্লাস জলপান করতেন। দুপুরে একটি পাহাড়ী বেল ও একখানি টিক্কর নুন ও লঙ্কা সহযোগে আহার করতেন। কোন কোন দিন অন্নভোগ ঠাকুরকে নিবেদন করে প্রসাদ গ্রহণ করতেন।

সেদিন সবেমাত্র কুলদানন্দ আসনে বসেছেন। শুরু হলো বৃষ্টির ধারা আর ঝড়ের তাণ্ডব। নূতন চালের খড় ভাল করে বসেনি। বৃষ্টির জল বাইরের মত ঘরের ভেতরও সমানভাবে বাড়তে লাগল। নবীন তাপস স্থির হয়ে বসে রইলেন যোগাসনে। দেহ সিক্ত হলো বৃষ্টির জলে। তবুও ভ্রূক্ষেপ নেই। ধীর স্থির অচল অটল। নিত্য-ক্রিয়া শেষ করে তবে আসন পরিত্যাগ করলেন।

আবার একদিন দেখা গেল অসংখ্য মাছি ঝাঁকে ঝাঁকে এসে চোখে মুখে সর্বাঙ্গে বসছে। কিছুতেই তাড়ানো যাচ্ছে না। ধুনি জ্বালিয়ে দিলেন কিন্তু তাতেও ফল হলো না। এইভাবে দু দিন

দু রাত চললো সমানে যাতনাভোগ। তবুও সাধনকুটির পরিত্যাগ করলেন না। গুরুদেবের নাম স্মরণ আর ভজনানন্দে বিভোর হয়ে রইলেন।

দিন সপ্তাহ মাসের পর মাস অতিক্রান্ত হয়। বছর ঘুরে আসে। অকস্মাৎ গোস্বামী প্রভুর আহ্বান এলো গেণ্ডারিয়া আশ্রম থেকে। চণ্ডীপাহাড় দামপাড় আশ্রম হরিদ্বারকে পেছনে ফেলে ব্রহ্মচারী কুলদানন্দ আবার ছুটে চললেন ঢাকা অভিমুখে। গুরুদেবের আশ্রয়ে। কলকাতায় পৌঁছে শুনলেন গোঁসাইজী সুকিয়া স্ট্রীটে আছেন। সেখানেই ছুটে গেলেন। মাথা লুটিয়ে প্রণাম করলেন গুরুকে। স্নেহালিঙ্গন দিলেন গোস্বামী প্রভু মানসপুত্র কুলদানন্দকে। আনন্দাশ্রু নির্গত হতে লাগলো। গোঁসাইজী তাঁর সঙ্গেই এখন থেকে থাকতে বললেন কুলদানন্দকে। মহানন্দে গুরুসেবার কাজে নিজেকে আত্মনিয়োগ করলেন কুলদানন্দ। সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের বাসায়, হ্যারিসন রোডের বাসায় এবং পুরীধামে কুলদানন্দ ছিলেন গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণের নিত্যসঙ্গী।

কুলদানন্দের সাধনজীবনে আবার ঘনিয়ে এলো মহাসংকট। রিপুর তাড়নায় তিনি আজও বিভ্রান্ত। বিচলিত। এতদিনের সংযম ও ব্রহ্মচর্য তবে কি বৃথা? চীরবাসে তার দেহটাই শুধু বন্দী হয়ে চুপ করে আছে, কিন্তু তার মনের স্বপ্নে যে আনাগোনা করছে কুতুবুড়ির* যৌবনবিধুর দেহ। মনোজগতে তুমুল আলোড়নের হলো সৃষ্টি। এই সময়ের মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলছেন। কুলদানন্দের ভাষায়, 'একটি দিন মাত্র ২।৩ মিনিটের জন্য কুতুর দিকে দৃষ্টি করিয়া অস্থিপঞ্জর আমার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এখন উহার ছবি আর এ অন্তর হইতে সরাইতে পারিতেছি না। নিয়মিত সাধন ভজন সবই করিতেছি কিন্তু অন্তরের উত্তেজনা কিছুতেই দমন করিতে পারিতেছি না। উত্তেজনার প্রবল স্রোত যখন আসিতে

*কুতুবুড়ি (প্রেমসখী) বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কনিষ্ঠা কন্যা।

লাগিল তখন নাম ধ্যান সাধন ভজন সমস্ত ভাসাইয়া নিয়া চলিল। ক্রমে উহা এতই বৃদ্ধি পাইল যে ঠাকুরের নিকটেও আর আমি বসিতে পারিলাম না। একবার ঘর, একবার বাহির করিতে লাগিলাম। অবশেষে স্থির থাকিতে না পারিয়া ঠাকুরকে গিয়া বলিলাম,—কয়দিন যাবৎ কুতুর উপরে আমার ভয়ানক আকর্ষণ আসিয়া পড়িয়াছে। এখন আর বহু চেষ্টাতেও আমি স্থির থাকিতে পারিতেছি না। কখন কি করে ফেলি বলিতে পারি না। আপনাকে জানাইয়া রাখিলাম।'

আমার কথা শুনিয়া ঠাকুর আমার দিকে একদৃষ্টে স্নেহভরে চাহিয়া বলিলেন,—'যে বয়েস, তাতে এ তো হতেই পারে। এ তো অস্বাভাবিক কিছু নয়।' একটু থামিয়া আবার বলিলেন, 'একটু দূরে দূরে থাকতে পার না?'

আমি বলিলাম,—'না, এখন আর পারি না। আমার চেষ্টা এখন কাছে যাওয়া, দূরে থাকবো কিরূপে? আমি সর্বদাই সুযোগ খুঁজছি। সামলাতে না পারলে আমি সজন নির্জনতার কোন অপেক্ষা করব না। পরে যা হয় হবে।'

ঠাকুর বলিলেন, 'কর্তা ভগবান। তাঁরই ইচ্ছা সব। দেখ কি হয়।' এই বলিয়া ঠাকুর চোখ বুজিলেন। একটু পরে বলিলেন, 'কামের উৎপাতে তোমার অপেক্ষাও আমি অধিক ভুগেছি।' তারপর নিজ জীবনের ইতিবৃত্ত শোনালেন।

সবকিছু শুনে দুঃখ প্রকাশ করে কুলদানন্দ বললেন—তাহলে এতদিন সাধন ভজন করে আমার কিছুই হলো না।

—কি? কি বললে? বলছ কিছুই হয় নাই? যে দুর্লভ বস্তু পেয়েছো তা যখন প্রত্যক্ষ করবে তখনই বুঝবে কি হয়েছে। অভাব আর কিছুই নাই। এটি নিশ্চয়ই জান। নরকেও যদি যাও সেখানে বুকে করে রাখবার একজন আছেন। বললেন গোস্বামী প্রভু।

স্নেহপূর্ণ কথাগুলি শুনে তৃপ্ত হয় আর শান্ত হয় কুলদানন্দের মন। শ্রদ্ধাভিভূত চোখে তাকিয়ে থাকেন গোঁসাইজীর মুখের

দিকে। তারপর মাথা লুটিয়ে প্রণাম করেন। গোস্বামী প্রভুও আশীর্বাদ করেন শিষ্যকে।

সে সময়ের মানসিক অবস্থার কথা ডায়েরীতে লিখে রাখেন কুলদানন্দ।

'রাত্রে আর নিদ্রা হইল না। ঠাকুরের অলোকসামান্য সহানুভূতির কথা ভাবিয়া আমি একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছি। এইরূপ সহানুভূতি কোথাও দেখি নাই। শুনি নাই। ঠাকুরের যুবতী কুমারী কন্যা, নানা স্থানে তাহার বিবাহের পাত্র অনুসন্ধান চলিতেছে। এই সময়ে এই পরিবারের মধ্যে থাকিয়া আমি তাহার প্রতি যে জঘন্য, পৈশাচিক অত্যাচার করিতে সর্বক্ষণ সচেষ্ট, ইহা পরিষ্কার জানিয়াও ঠাকুর কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না বা উদ্বেগ বোধ করিলেন না। কিন্তু এ বিষয়ে বিন্দুবিসর্গ কাহাকেও জানিতে দিলেন না। ধন্য দয়াল ঠাকুর!'

আশ্চর্য নৈতিক সাহসের সঙ্গে একান্ত অকপটে কুলদানন্দ প্রকাশ করলেন তাঁর চরিত্রের ত্রুটি ও দুর্বলতার কথা। কুলদানন্দ যে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন তাঁর নিজ জীবনের সত্যপ্রকাশের এই অকপটতাই তার প্রমাণ। একদিকে অটল ধৈর্য ও নিরলস সংগ্রাম, অপর দিকে ঐকান্তিক গুরুনিষ্ঠা ও অনন্ত গুরুকৃপা। এই দুই ধারার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয় কুলদানন্দের সুকঠোর তপশ্চর্যা।

*　　　*　　　*

গোস্বামী প্রভুর আশ্বাসবাণী অন্তরে অন্তরে অনুভব করেন কুলদানন্দ। সাধনজীবনে লাভ করেন প্রেরণা।

'......হতাশ হবার কিছু নেই। ছয় বৎসর ব্রহ্মচর্য পালনের পর এই জন্যই নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য পালন করতে বলেছি। প্রত্যেক সাধককেই সাধনপথে অসীম ধৈর্য ও আপ্রাণ চেষ্টার সঙ্গে অগ্রসর হতে হয়। প্রসবের পূর্বে গর্ভিণী দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করেন। কিন্তু প্রসবের পর সেই যন্ত্রণা ভুলে মাতৃত্বের আনন্দ অনুভব করেন। সিদ্ধির পথে সাধককেও ঠিক সেই ভাবে অগ্রসর হতে হবে।'

বিজয়কৃষ্ণের অধ্যাত্মরাজ্যের যিনি ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী তাঁর মানসপুত্র কুলদানন্দকে এমনি করেই তিনি যোগীরূপে শ্রেষ্ঠ মানুষরূপে গড়ে তোলেন। যাতে তাঁর অধ্যাত্মরাজ্যের পরিচালনা সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হতে পারে। তিল তিল করে সেই গড়ার পথেই তাঁকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ।

১৩০৪ সালের ২৪শে ফাল্গুন গোস্বামী প্রভু সশিষ্য পুরীধামের পথে যাত্রা করলেন। জননী স্বর্ণময়ী দেবী বলেছিলেন,—'পুরী গেলে বিজয় আর ফিরবে না।' সেই শ্রীক্ষেত্রের পথেই রওনা হলেন গোঁসাইজী। সকল বাধাবিপত্তিকে ঠেলে যেলে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের আহ্বানে। জগন্নাথদেবের দর্শনমানসে অধীর হয়ে উঠেছিলেন ভক্তপ্রাণ বিজয়কৃষ্ণ। ভক্তবৃন্দ সকলের চোখেই আজ বিদায়ের অশ্রুবন্যা।

অবশেষে সেই শ্রীক্ষেত্রের লীলাও একদিন সাঙ্গ হলো। পুরীতে অবস্থান করা অবধি ৺জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ ভিন্ন অন্য কিছুই সেবা করতেন না গোস্বামী প্রভু। মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্যও বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করেন তিনি। এ সম্বন্ধে বলেন, 'যেমন নাম ও নামী, ভক্ত ও ভগবান একই তত্ত্ব, তেমনি জগন্নাথদেব ও মহাপ্রসাদ একই তত্ত্ব। এঁদের মধ্যে কোনও প্রভেদ নেই। জগন্নাথদেব দর্শনে যে ফল, মহাপ্রসাদ সেবনেও সেই ফল।'

এইজন্য মহাপ্রসাদ বলে কেউ কিছু দিলে তা কখনও প্রত্যাখ্যান করতেন না গোস্বামী প্রভু। এই গভীর নিষ্ঠার সুযোগ গ্রহণ করলো ঈর্ষান্বিত দুর্বৃত্তগণ। এক সম্প্রদায়ের বাবাজীরা শ্রীক্ষেত্রে বিজয়কৃষ্ণের অপ্রতিহত প্রভাব দর্শনে ঈর্ষান্বিত ছিলেন। তাইতো সুপরিকল্পিতভাবে মহাপ্রসাদ নামে প্রদান করলো বিষমিশ্রিত লাড্ডু এক দুর্বৃত্ত গোস্বামী প্রভুকে। মহাপ্রসাদের মর্যাদা রক্ষার জন্য গোঁসাইজীও সানন্দে ভক্ষণ করলেন সেই লাড্ডু। বিষের ক্রিয়াও শুরু হলো দেহে। অকস্মাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কিন্তু ভক্তবৃন্দের শত অনুরোধেও দুর্বৃত্তের নাম প্রকাশ করলেন না। শুধু বললেন,—

'ধর্মের প্রতিষ্ঠাও এক বিষম ব্যাপার। এই প্রতিষ্ঠার ঘাটে অনেক সাধকও তাঁদের অর্জিত সাধন সম্পত্তি জলাঞ্জলি দিয়ে নিম্নগামী হন। তোমরা শান্ত হও। ওদের ক্ষমা কর। ওরা বড়ই কৃপার পাত্র।'

অপার বিস্ময়ে গভীর ভক্তিতে অভিভূত হলেন কুলদানন্দ। গুরুদেবকে দেখে মনে হতে লাগলো, সত্যই কী অপূর্ব ক্ষমাসুন্দর দিব্যমূর্তি!

ধীরে ধীরে সেই ভীষণ দিনটি এগিয়ে এলো সর্পিল গতিতে। ১৩০৬ সালের ২২শে জ্যৈষ্ঠ শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী নিত্যধামে মহাপ্রয়াণ করলেন।

শ্রীগুরুর স্নেহচ্ছায়াতলে দীর্ঘকাল থেকে কুলদানন্দ লাভ করেছেন আধ্যাত্মিক জীবন। সেই অক্ষয় অমূল্য সম্পদ পাথেয় করে তাঁর বৈরাগ্যদীপ্ত দিব্যজীবনে শুরু হলো আর এক নূতন মহিমান্বিত অধ্যায়। গুরু-নির্দেশিত ব্রত উদ্‌যাপনের শুভ সংকল্প নিয়ে যাত্রা করলেন হরিদ্বারের পথে। চণ্ডীপাহাড়ে এসে আবার সাধনায় ব্রতী হলেন। অকস্মাৎ একদিন স্বপ্ন দেখলেন পুরীধামের সমাধি মন্দির থেকে গোঁসাইজী হাতছানি দিয়ে ডাকছেন, 'ব্রহ্মচারী, এখানে এস।' স্বপ্নযোগে পুরী যাবার ইঙ্গিত মনে করে কুলদানন্দ পুরীধামের পথে যাত্রা করলেন। তখন মেজ ভ্রাতা বরদাকান্ত গয়াধামে ওকালতি ব্যবসায় নিযুক্ত ছিলেন। পথে গয়াধামে নামলেন। উঠলেন মেজ ভ্রাতার বাসায়। ইচ্ছা ছিল দুইদিন বিশ্রাম করে যাত্রা করবেন। রাত্রে আবার স্বপ্ন দেখলেন, গয়ার নিকটবর্তী কোন পাহাড়ে নির্দিষ্ট একটি স্থান দেখিয়ে গোস্বামী প্রভু বলছেন, 'এখানে বসে সাধন-ভজন কর।'

স্বপ্নের কথা বললেন বরদাকান্তকে। বরদাকান্তও তখন বিজয়কৃষ্ণের চরণে সবকিছু সমর্পণ করে বিশিষ্ট ভক্ত ও শিষ্যে রূপান্তরিত হয়েছেন। দীক্ষা গ্রহণ করে গুরুর নির্দেশিত পথে কর্ম করে চলেছেন। প্রচ্ছন্ন যোগীর মতই জীবন যাপন করছেন। স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনে গুরুর নির্দেশ বলেই বিশ্বাস করলেন। তারপর

কুলদানন্দকে সঙ্গে নিয়ে এলেন আকাশগঙ্গা পাহাড়ে। আবিষ্কার করলেন সেই স্বপ্ননির্দিষ্ট স্থানটি। এই স্থানেই গুরুর নিকট হতে দীক্ষালাভ করে শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সমাধিস্থ হয়ে ছিলেন এগারো দিন। সেই পুণ্যধামে কুলদানন্দ ব্রতী হলেন কঠোর সাধনায়। অজপাসাধনে। ধীরে ধীরে এগিয়ে'চললেন সিদ্ধিলাভের পথে। তনুমালা হয়ে উঠলো নামমালা।

অদূরে ব্রহ্মযোনি পাহাড়ের নিম্নে কপিলধারায় নামানন্দে বিভোর ছিলেন মহাত্মা গম্ভীরনাথজী। তাঁর সঙ্গে পরিচয় ছিল বরদাকান্তের। ব্রহ্মচারী কুলদানন্দের পরিচয় পেয়ে আনন্দিত হলেন গম্ভীরনাথজী। বললেন, 'সাধনের পক্ষে এ স্থান বড়ই অনুকূল। এখানে সাধন করলে যথেষ্ট উপকার পাবে।'

এই আকাশগঙ্গার নির্জন শ্বাপদসঙ্কুল পরিবেশে সাধনকালেই দুর্বৃত্তদের দ্বারা নানা উপদ্রবের সম্মুখীন হন কুলদানন্দ। অলৌকিক বিভূতি সঞ্চার করে দস্যুদলকে অভিভূত করেন। তারা অকপটে অপরাধ স্বীকার করে। এই প্রসঙ্গে সতীর্থ শ্রীমৎ কিরণচাঁদ দরবেশজী বলছেন, 'কুলদানন্দ যখন গয়ার পাহাড়ে সাধনে নিযুক্ত ছিলেন সেই সময় সেখানকার বদমায়েস গুণ্ডাদের দ্বারা নানাভাবে উত্ত্যক্ত হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে তিনি অসাধারণ ধৈর্য সহানুভূতি ও যোগৈশ্বর্য প্রদর্শনে গুণ্ডাদলটিকে বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন।'

ব্রহ্মচারী কুলদানন্দকে গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখতেন গয়ার ম্যাজিস্ট্রেট ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের পিতৃদেব শ্রীযুত প্রকাশচন্দ্র রায়। তিনিই কুলদানন্দের জন্য রঘুবর দাস বাবাজীর পরিত্যক্ত জীর্ণ কুটিরের উপর দোতলা নির্মাণের ব্যবস্থা করেন।

দিন সপ্তাহ মাস বছরের পর বছর অতিক্রান্ত হলো। কঠোর সাধনায় ব্রতী ব্রহ্মচারী কুলদানন্দ। অবশেষে সুকঠোর সাধনায় মহাসিদ্ধি লাভ করে শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণের অধ্যাত্ম জ্যোতিঃপুঞ্জের সুযোগ্য প্রতিভূরূপে আত্মপ্রকাশ করলেন ব্রহ্মচারী কুলদানন্দ।

বিরাট শক্তি ও বিপুল যোগৈশ্বর্য সযতনে গোপন করে আপনার অতুল প্রেম ও মাধুর্যের অমৃতকুম্ভ নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন ত্রিতাপক্লিষ্ট নরনারীর মাঝে। প্রচার করলেন গোস্বামী প্রভু প্রবর্তিত প্রেমধর্ম ও শক্তিসমন্বিত শ্রীনাম। কুলদানন্দজীই প্রথম প্রচলন করলেন সদ্‌গুরু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সেবাপূজা। তাঁরই প্রথম মন্ত্রশিষ্য জিতেন্দ্রনাথের গৃহে। পরবর্তীকালে আশ্রমে ও বহু ভক্ত শিষ্যদের ঘরে ঘরে এই সেবাপূজার প্রচলন হয়।

১৩০৯ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে কুলদানন্দ এলেন পুরীধামে। গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব উৎসব উপলক্ষ্যে। অবশ্য প্রতিবৎসরই তিনি আসতেন শ্রীক্ষেত্রে গুরুর তিরোভাব উৎসবে। এইখানেই কলকাতার বিখ্যাত মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী পুঁটিরাম মোদকের সহধর্মিণী আর শ্যালক পত্নী কুলদানন্দের যোগময় দেহের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হন। মনে মনে গুরুরূপে বরণ করেন। অবশেষে সকাতরে আবেদন করলেন কলকাতায় ওঁদের বাড়ীতে পায়ের ধুলো দেবার জন্য। ব্রহ্মচারীজীকে। পুঁটিরাম ছিলেন নিঃসন্তান। পিতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্র জিতেন্দ্রনাথকে পুত্রস্নেহে লালন পালন করছিলেন তাঁর সহধর্মিণী। তাঁর ব্যবসায় ও অর্থসম্পদের ভাবী উত্তরাধিকারী এই জিতেন্দ্রনাথ ছিলেন উচ্ছৃঙ্খল। তাঁরই মানসিক পরিবর্তন এবং চরিত্র গঠনের জন্য দৈবানুগ্রহ লাভের আশায় পুঁটিরাম মোদকের সহধর্মিণী এসেছিলেন তীর্থভ্রমণে। অকস্মাৎ দিব্যকান্তি কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীকে দর্শন করেই তিনি হলেন মুগ্ধ ও অভিভূত। মনোবেদনার কথা করলেন ব্যক্ত। কুলদানন্দও তাঁকে স্বভাবসুলভ স্নেহ ও সহানুভূতির সঙ্গে করলেন সান্ত্বনা প্রদান।

অবশেষে কলকাতায় এসে দর্শন দিয়েছিলেন ভক্তিমতী মহিলাদ্বয়কে। এবং দুর্জয় পুত্র জিতেন্দ্রনাথের মনোজগতে সৃষ্টি করেছিলেন ভাবান্তরের। ব্রহ্মচারীজীর সংস্পর্শে এসে আমূল পরিবর্তন হয়েছিল তার চরিত্রের। উচ্ছৃঙ্খল যুবকের অন্তরে ভাবী

উন্নতির বীজ বপন করে কুলদানন্দ যাত্রা করলেন গয়াধামের পথে। আকাশগঙ্গা পাহাড় অভিমুখে। আপন সাধনভূমিতে।

আবার একদিন চলে এলেন ব্রহ্মচারীজী কলকাতাতে। ছয় মাস পর। আনুষ্ঠানিক ভাবে দীক্ষাদান করলেন জিতেন্দ্রনাথকে। ওঁর জননী ও পিসীমাতাকেও। এঁরাই হলেন ব্রহ্মচারীজীর প্রথম মন্ত্রশিষ্য।

কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী ওঁদের ঘরের ঠাকুর, মনের ঠাকুর শ্রীশ্রীঠাকুর কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীরূপে হলেন পূজিত। পরবর্তীকালে ভক্ত জিতেন্দ্রনাথ যেমন ধর্মজীবন লাভ করেছিলেন তেমনিই ব্যবসায়ী জীবনে হয়েছিলেন সুপ্রতিষ্ঠিত।

এইভাবে কলকাতার লীলা সমাপন করে আবার ফিরে এলেন আকাশগঙ্গা পাহাড়ে। ধ্যান ও সমাধির বিমল আনন্দে দিন অতিবাহিত হয় ব্রহ্মচারী কুলদানন্দের। এই আকাশগঙ্গা পাহাড়ের সাধনজীবন সম্বন্ধে বলছেন প্রত্যক্ষদর্শী পরমহংস স্বামী কৈশরানন্দ সরস্বতী, 'ব্রহ্মচারীর কঠোর তপস্যা অবিরাম নাম সাধন ভগবৎ নির্ভরতা দেখিয়া আমরা অনুপ্রাণিত হইতাম। সেই সময় তাঁহার তেজোদীপ্ত অনিন্দ্যসুন্দর রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইতাম। জীবনে তাঁহাকে কখনও কোন মিথ্যা কথা বলিতে শুনি নাই। কখনও পরনিন্দা পরচর্চার প্রশ্রয় দিতেন না। বরং সকলের গুণ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া নিন্দাকারীকে প্রতিনিবৃত্ত করিতেন। বিপথগামী গুরুভ্রাতাদের পরম সহৃদয়তা সহকারে শ্রীগুরুর সঙ্গলাভের সুযোগ করিয়া দিতেন, যাহাতে তাঁহারা শ্রীগুরুর পুণ্যপ্রভাবে সুপথে আসেন। আমার নিজের জীবন তাহার সাক্ষ্য। তাঁহার মত উদার প্রাণ সদানন্দময় পরমদরদী ভ্রাতৃবৎসল বন্ধু পাইয়া আমরা ধন্য হইয়াছিলাম।'

গুরুভ্রাতা হেমেন্দ্র গুহ রায় বলছেন, 'ব্রহ্মচারী নিজে অতি সংক্ষেপে মাত্র ভাতে সিদ্ধ ভাত বা ধুনিতে সেঁকিয়া দুই তিনটি টিক্কর খান। কিন্তু আমরা কখনও গেলে পরিপাটি করিয়া নানা

ব্যঞ্জনসহ আমাদের খাদ্য পরিবেশন করেন। সমস্ত বস্তুই তাঁহার হাতের কাছে কুলুঙ্গিতে গোছানো থাকে। আসন হইতে উঠিতে হয় না। অবিরাম নামসাধনে মগ্ন থাকেন। সাক্ষাৎ মহাদেবের মত রূপ। যেন সর্বাঙ্গ হইতে জ্যোতি ফুটিয়া পড়িতেছে। তাঁহার গাত্র হইতে এমন মন-মাতানো পদ্মগন্ধ বাহির হইত যে আমরা সেই সুগন্ধে নামের নেশায় মাতিয়া উঠিতাম।

কুটিরের সমস্ত আবহাওয়া যেন নামে ভরপুর মনে হইত। সাধন প্রভাবে আমরা অভিভূত হইয়া নামানন্দে বুঁদ হইয়া থাকিতাম। তাঁহার মধুর ভাব, সুমধুর আলাপ আলোচনা, প্রেমপ্রীতি আমাদিগকে ভগবৎভাবে অনুপ্রাণিত রাখিত। তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া আসিতে যেন বুকটা ফাটিয়া যাইত। মনে হইত যেন যুগ-যুগান্তরের জন্ম-জন্মান্তরের এক বিশিষ্ট বন্ধু ও আপনজনকে ছাড়িয়া যাইতেছি।'

বোলপুরের উকিল শ্রীহরিদাস বসু তাঁর 'মহাপাতকীর জীবনে সদ্‌গুরুর লীলা' গ্রন্থে লিখছেন, 'শ্রীযুত কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় এই পাহাড়ে একাকী থাকিতেন। তাঁহার অযাচক বৃত্তি। প্রত্যহ ঝরণার জলে দুই তিনবার স্নান করিতেন। দিবারাত্র সাধনভজনে কালাতিপাত করিতেন। তাঁহার শরীরের জ্যোতি, সাধনের অনুরাগ ও তীব্রতা এবং তন্মধ্যে গুরুশক্তির প্রভাব দেখিয়া আমি পরম পুলকিত হইতাম।'

কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীর ভক্ত শিষ্য ও জীবনীকার ব্রহ্মচারী গঙ্গানন্দ বলছেন,······'দিবানিশি মধুর নামের নেশায় তিনি বিভোর। মন প্রাণ সমস্ত ইন্দ্রিয় গহন অন্তর্লোকের অবচেতন সত্তা নিবিড় নামানন্দে নিবিষ্ট। আত্মসমাহিত। পাতালগঙ্গার পুণ্য সলিলে সম্পন্ন হয় তাঁহার স্নান ও আচমন। কত মহাপুরুষের নিঃশ্বাসপূত আকাশগঙ্গার আকাশে বাতাসে তরঙ্গিত তাঁহার প্রাণায়াম ও কুম্ভক। ঐশী প্রেরণায় উন্মাদ কত মহাঋষির লীলাক্ষেত্র এই মহাতীর্থেই স্থাপিত তাঁহার তপস্যার আসন। গুরুদেব ভগবান বিজয়কৃষ্ণের

পুণ্যপ্রভাবে আর্যঋষিদের ভগবৎ প্রেরণায় উদ্বেলিত হইয়া ওঠে নীলকণ্ঠ ব্রহ্মচারী কুলদানন্দের সাধনসমুদ্র। এমনি অনুকূল পরিবেশে প্রায় চারি বৎসর ধরিয়া চলিল তাঁহার নিরবচ্ছিন্ন সাধনা।'

এই আকাশগঙ্গা পাহাড়ের সাধনজীবনেই ব্রহ্মচারী কুলদানন্দের তেজোময় জ্যোতি ও দীপ্ত প্রভাবে অভিভূত হন শিবদাস নামে এক বলিষ্ঠ সাধু। শঙ্কর অবতার জ্ঞানে কুলদানন্দের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন তিনি। শিবদাসের সাধনজীবনের উন্নতিবিধানে সাহায্য করেন কুলদানন্দ।

মাঝে মাঝে গম্ভীরনাথজীর নিকট গিয়ে বসে থাকতেন কুলদানন্দ। তাঁর সঙ্গে একটি কথাও হতো না। পাশাপাশি উভয়ে নিমগ্ন থাকতেন মধুর নামানন্দে। তাঁর উপর সর্বদা স্নেহময় দৃষ্টি ছিল গম্ভীরনাথজীর।

যোগীরাজ গম্ভীরনাথজীই একসময়ে বলেছিলেন কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী সম্বন্ধে বরদাকান্তকে,—'হাম্ বিশ বরষ যোগ সাধনা করকে যো লাভ কিয়া, ও তো গোঁসাইজীকা কৃপাসে নাম সাধনাসে সব কুছ প্রাপ্ত হুয়া। বড়া ভাগ্যবান হ্যায়।'

ক্রমে ক্রমে কুলদানন্দের সাধনার যশঃসৌরভ দূরদূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লো। অন্তর্নিহিত শক্তি ও মাধুর্যের আকর্ষণে তাঁকে দর্শন করবার জন্য ছুটে আসতে লাগলো নানা শ্রেণীর নরনারী আকাশগঙ্গা পাহাড়ে। কুলদানন্দ ছিলেন সর্বত্যাগী বৈরাগী, আবার শিবরূপী বিশ্বপ্রেমিক। এইজন্যই মহাসিদ্ধি লাভের পর পর্বতগুহায় সমাধিস্থ হয়ে থাকতে পারলেন না। অবতীর্ণ হলেন সংসারের মাঝে। সিদ্ধকামী সন্ন্যাসী ফিরে এলেন জনসমাজে, দুঃখী-তাপী মুমুক্ষু মানুষের কাছে। পরাধীনতার নাগপাশে জর্জরিত জনগণের চিত্তের দুর্বলতা, নানা কুসংস্কার, সমাজপতিদের ধর্মরক্ষার নামে নানা লাঞ্ছনা ও অধোগতির হাত থেকে মানুষকে ও মানুষের ধর্মকে রক্ষা করবার জন্যই ছুটে এলেন সন্ন্যাসী কুলদানন্দ পর্বতগুহা থেকে অতি সাধারণ মানুষের মধ্যে।

'—আপ্‌ জলদি চলা যাইয়ে কাশী। হু য়া আপ্‌কো লিয়ে বিলকুল সব ঠিক হো চুকা হ্যায়। গোঁসাইজী হামকো বোলা।' বললেন গম্ভীরনাথজী। কুলদানন্দকে। আর দেরী করেননি ব্রহ্মচারীজী। আকাশগঙ্গা পাহাড় থেকে এলেন বারানসীধামে। কোথায় থাকবেন কোন স্থিরতা নেই। অনাবৃত আকাশের নীচে কখনও বৃক্ষতলে আসন করেই অতিক্রান্ত হলো কয়েক রাত্রি। অবশেষে আশ্রয় নিলেন নারদঘাটের নিকট অপরিচ্ছন্ন সংকীর্ণ একটি ঘরে। অযাচক বৃত্তি। নামানন্দে বিভোর সর্বদা। সহসা এসে উপস্থিত হলেন গম্ভীরনাথজীর শিষ্য কালীনাথজী। সোনারপুরায় একটি বাড়ী ঠিক করে দিলেন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চতুর্দিক। পরিবেশটিও সুন্দর। সর্বপ্রকার সাহায্যে কালীনাথজীও রইলেন নিযুক্ত। কুলদানন্দের বাড়ীটি পছন্দ হলো এবং মনে মনে বাসনা হলো আশ্রম প্রতিষ্ঠার। অলৌকিক ব্যাপার। বাড়ীর মালিকও হঠাৎ বাড়ীটি বিক্রি করা স্থির করলেন। এবং চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু তিনি ভাবতে পারেননি দীন সন্ন্যাসী ঠাকুর এই বাড়ীটিব ক্রেতা হতে পারেন। অবশেষে ভক্ত শিষ্য জিতেন্দ্রনাথ বাড়ীটি ক্রয় করে শ্রীগুরুকেই দানপত্র করে দিলেন।

সোনারপুবার এই বাড়ীতেই সর্বপ্রথম আশ্রম প্রতিষ্ঠা হলো। নিশ্চিন্তে সাধন-ভজনে নিমগ্ন হলেন ব্রহ্মচারী কুলদানন্দ। 'বিলকুল সব ঠিক হো চুকা'—গম্ভীরনাথজীর মাধ্যমে গোঁসাইজীর এই বাক্য সত্যে হলো পরিণত। কুলদানন্দের বৈরাগ্যদীপ্ত সিদ্ধজীবনে সব চাওয়া ও পাওয়ার অবসান হয়েছে। তবুও শিষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় তাদের মাঝে সময় সময় এসে থাকার জন্যই আশ্রম প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন তিনি। কাশী, পুরী ও কলকাতাকে কেন্দ্র করে শ্যামপুর বর্ধমান ও উলুবেড়িয়া প্রভৃতি স্থানেও কুলদানন্দজী যাতায়াত করতে থাকেন। বহু নরনারী তাঁর অলৌকিক তপপ্রভাবে আকৃষ্ট হয়ে দলে দলে দীক্ষা গ্রহণ করতে লাগলেন। কুলদানন্দের মধ্য

দিয়ে বিজয়কৃষ্ণের নাম রূপ ভাব ও মহিমা শতধারে বিচ্ছুরিত হয়ে চললো সমগ্র বাংলা দেশে।

গুরুভ্রাতা দেবেন্দ্রনাথ সামন্তের লোহার দোকানের কর্মচারী মহানন্দ নন্দী ও নলিনাক্ষ তা মুগ্ধ ও অভিভূত হলেন ব্রহ্মচারী কুলদানন্দকে মনিবের গৃহে প্রথম দর্শন করে। ব্যাকুল হয়ে দীক্ষাপ্রার্থী হলেন। ১৩১৫ সালের বৈশাখ মাসে দীক্ষাদান করলেন ভক্ত মহানন্দ নন্দীকে ব্রহ্মচারীজী। জ্যৈষ্ঠ মাসে পুরী উৎসবে যোগদানের জন্য যাত্রা করলেন। যাত্রাপথের সঙ্গী হলেন নবীন শিষ্য মহানন্দ নন্দী। পুরী থেকে ফিরলেন কাশীতে। জননী হরসুন্দরীদেবী তখন কাশীধামে অসুস্থ। মৃত্যুশয্যায় শায়িত। অবশেষে একদিন মাতৃভক্ত কুলদানন্দের কোলে মাথা রেখেই স্নেহময়ী জননী ইহলীলা সম্বরণ করলেন। ব্রহ্মচর্য গ্রহণের প্রাক্কালে জননীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যখন যেখানেই থাকুন না কেন মৃত্যুকালে নিশ্চয়ই উপস্থিত থাকবেন। শ্রীগুরুর কৃপায় সে প্রতিশ্রুতিও পালিত হলো কুলদানন্দের জীবনে।

ভক্তবৃন্দের অনুরোধে অগ্রহায়ণ মাসে কলকাতাতে এলেন কুলদানন্দজী। উঠলেন জিতেন্দ্রনাথের মির্জাপুর স্ট্রীটের বাড়ীতে। এখানেই দীক্ষাদান করলেন সুকিয়া স্ট্রীটের বিখ্যাত শ্রীমানী পরিবারের গণেশ শ্রীমানী ও তাঁর স্ত্রীকে। ধীরে ধীরে সমস্ত শ্রীমানী পরিবারটিই কুলদানন্দের ভক্ত ও শিষ্য হয়ে ওঠেন। বহু ভক্তসমাগম হতে লাগলো। কোথাও স্থির হয়ে সাধনভজন করতে পারছেন না। ভক্তপ্রবর জিতেন্দ্রনাথ অনুরোধ করলেন চন্দননগরে তাঁদের পৈতৃক বাড়ীতে কিছুদিনের জন্য নিরিবিলিতে বাস করবার জন্য। এলেন চন্দননগরে। ইতিপূর্বেও এসেছেন গুরুভগ্নী নিরুপমা দেবীর অনুরোধে। এখানেও ভক্তসমাগম হতে লাগলো। এখানেই দীক্ষা দান করলেন নলিনাক্ষ তা, জ্ঞানেন্দ্রনাথ নন্দী, বেণীমাধব, চুনীলাল প্রভৃতিকে। গুরুসেবা ও ভক্তিতে জিতেন্দ্রনাথ, সন্তোষনাথের মত মহানন্দ ও নলিনাক্ষও ছিলেন সকলের আদর্শ

স্থানীয়। এই নলিনাক্ষ তা আর মহানন্দ নন্দী শ্রীগুরুর কৃপায় লোহার ব্যবসা করে প্রচুর অর্থলাভ করেন এবং বিশিষ্ট ধনী হয়ে ওঠেন। এঁদেরই প্রচেষ্টায় চন্দননগরে আশ্রম প্রতিষ্ঠা হয়। মহাষ্টমী তিথিতে স্থায়ীভাবে মহাহোমের প্রবর্তন করেন ব্রহ্মচারীজী।

আবার অকস্মাৎ একদিন কুলদানন্দ যাত্রা করলেন পূর্ববঙ্গের পথে। কুমিল্লা, ঢাকা, বরিশাল, খুলনা ও পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করে শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণের বাণী ও প্রেমধর্ম প্রচার করতে লাগলেন। ব্রহ্মচারী কুলদানন্দের দুর্বার আকর্ষণে শত শত নরনারী তাঁর শ্রীচরণে এসে আত্মসমর্পণ করতে লাগলো। বাংলার ধর্ম আন্দোলনে আবার শুরু হলো নব জাগরণের।

এই সময়ে কুলদানন্দের জীবনে নানা অলৌকিক বিভূতিরও হয় প্রকাশ। শিষ্য অতীন চক্রবর্তী বরিশালের 'পথিক' পত্রিকার সম্পাদক। অসুস্থ। মৃত্যুপথযাত্রী। ডাক্তার জানিয়েছেন কোন আশা নেই। তন্দ্রাভিভূত অতীনবাবু অকস্মাৎ দেখতে পেলেন তাঁর প্রাণের ঠাকুর কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীজী হস্তস্থিত কমণ্ডলুর জল তাঁর গায় মাথায় ছিটিয়ে দিচ্ছেন। তারপর অভয় দিয়ে অন্তর্হিত হলেন। চোখ খুললেন অতীনবাবু। অপূর্ব এক দিব্য অনুভূতিতে দেহ মন ছেয়ে রইলো। ধীরে ধীরে নিজেকে সুস্থ বোধ করতে লাগলেন। বিছানায়ও উঠে বসলেন। সকলেই আশ্চর্যান্বিত হলেন। ডাক্তার এলেন গভীর রাত্রিতে সংবাদ নিতে।—'এ যে অবিশ্বাস্য', মনে মনে বললেন ডাক্তার। তারপর রোগীর মুখ থেকে সবকিছু শুনে বিস্মিত হলেন। ব্রহ্মচারী কুলদানন্দের প্রতি শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করলেন।

শিষ্যপ্রবর সঙ্গীতজ্ঞ তুকারাম ভাতকুলিকর ভারতসঙ্গীত সম্মেলনে যোগদান করতে গিয়েছিলেন মাদ্রাজে। সেখানে জনৈকা সুন্দরী কুমারী গায়িকার সঙ্গে পরিচিত হন। সেই রূপবতী মেয়ের যৌবনবিধুর দেহের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হলেন তুকারাম। আর তাঁর

সেই আবেদনকরুণ মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যথিত হলো কুমারীর মন। মিলনের আকাঙ্ক্ষায় উভয়েই উন্মত্ত। সম্মেলন শেষে উভয়ে ফিরে এলেন কলকাতায়। তুকারাম উঠলেন সেই কুমারী মেয়েরই গৃহে। গভীর রাত্রিতে এক সুসজ্জিত কক্ষে উভয়ে শয্যা গ্রহণ করেছে। অকস্মাৎ ঘরের সমস্ত দরজা জানলা খুলে গেল। এবং প্রত্যেকটি বাতায়নে দেখা গেল শ্রীশ্রীঠাকুর কুলদানন্দ সুস্মিত মুখে দণ্ডায়মান। উভয়েই বিস্মিত ও লজ্জিত হলো। হতভম্ব অবস্থা। কি করবে, কিছুই স্থির করতে পারছে না। তারপর ঘোর ভাবটা কেটে গেলে আবার উভয়ে মিলিত হওয়ার জন্য শয্যা গ্রহণ করলো। পর-মুহূর্তেই ঘরের দরজা জানলা একইভাবে গেল খুলে। আর একই মূর্তি হলো নয়নগোচর।

বিস্মিত হয়ে মেয়েটি জিজ্ঞেস করলো তুকারামকে, সাধুটিকে সে চেনে কিনা? তুকারাম লজ্জিত হয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর কুলদানন্দের বিস্তারিত পরিচয় প্রদান করলো। সাধুজীর জীবনালোচনা করতে করতে উভয়েরই মোহ হলো ভঙ্গ। অবৈধ কার্যের জন্য উভয়েই দুঃখিত ও অনুতপ্ত হয়ে নিজ নিজ শয্যায় ফিরে গেল।

তুকারাম ভান্‌কুলিকর ছিলেন বিবাহিত। স্ত্রী পুত্র ছিল পুরীতে। ওদের সঙ্গে মিলিত হতে চলে এলেন পুরীতে। পুরীধামে এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের পায়ে মাথা লুটিয়ে প্রণাম করে উঠতেই সহাস্যে জিজ্ঞেস করলেন ঠাকুর—'কি তুকারাম! কেমন স্ফূর্তি করলে?' তুকারাম নির্বাক। অধোবদনে দাঁড়িয়ে রইলেন। কি আর বলবেন। গুরু যে সর্বব্যাপী। দরজা জানলা বন্ধ করে কি তাঁকে আড়াল করা যায়?

*   *   *

১৩২৪ সালের ১০ই বৈশাখ শুভ অক্ষয়তৃতীয়া তিথিতে পুরীধামে গোস্বামী প্রভুর সমাধি মন্দিরের পার্শ্বেই স্থাপিত হলো শ্রীশ্রীঠাকুর কুলদানন্দের জীবনস্বপ্ন—ঠাকুরবাড়ী আশ্রম। এইভাবে একে একে কাশী চন্দননগর শ্রীক্ষেত্র ভুবনেশ্বর ও শ্যামপুরে আশ্রম

স্থাপন করলেন ব্রহ্মচারীজী। সর্বত্রই তিনি ইষ্টদেব শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও মাতা ঠাকুরাণী যোগমায়াদেবীর প্রতিকৃতি স্থাপন ও সেবাপূজার ব্যবস্থা করেন।

১৩২১ সনে কুলদানন্দ পুরীধাম থেকে এলেন কলকাতায়। অবস্থান করতে লাগলেন সুকিয়া স্ট্রীটে। ভক্ত শ্রীমানিদের গৃহে। আত্মনিয়োগ করলেন 'শ্রীশ্রীসদ্গুরুসঙ্গ' গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড সম্পাদনা ও প্রকাশনার কার্যে। তৃতীয় খণ্ড ১৩২৫ সালের শেষভাগে প্রকাশিত হয় ভক্ত নলিনাক্ষ তা'র চেষ্টায়। প্রকাশের সাথে সাথেই পাঠক সমাজে সমাদর লাভ করে। এই দিনলিপিগুলি জীবনচরিত নয়, শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণের দিব্যজীবনের শেষ চৌদ্দ বৎসরের অমূল্য ইতিবৃত্ত। সাধনজগতের বহুবিধ তথ্য ও রহস্যের উপর ইহা নূতন আলোকসম্পাত করেছে। অধ্যাত্মজগতে ইহা এক নূতন জীবনবেদ। কুলদানন্দের সাধনার ফলশ্রুতি-স্বরূপ ধর্মপিপাসু বাংলার মানুষ পেলো এই অমূল্য গ্রন্থরাজি।

ঝুলনপূর্ণিমার পুণ্য দিনে শুরু হলো উৎসব। সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়ীতে। নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ কীর্তনিয়া গণেশ দাস কীর্তনানন্দে হলেন বিভোর। কুলদানন্দের সতীর্থদের মধ্যে যোগদান করলেন বিপিনচন্দ্র পাল, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, হেমেন্দ্রনাথ মিত্র আর বিপিনচন্দ্রের সঙ্গে এলেন কীর্তনানুরাগী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও তাঁর বাল্যবন্ধু ব্যারিস্টার ভুবনমোহন চ্যাটার্জী। 'ডন' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সতীশ মুখোপাধ্যায়, লাখুটিয়ার জমিদার সুকবি দেবকুমার রায়ও এলেন। চিত্তরঞ্জন শ্রীশ্রীকুলদানন্দকে খুবই ভক্তি করতেন এবং সময় ও সুযোগ পেলে ধর্মালোচনা করতেন তাঁর সঙ্গে। সশিষ্য তাঁকে ওঁর রসা রোডের বাসায় আমন্ত্রণ করেও নিয়ে যেতেন আলোচনার জন্য।

ঝুলনপূর্ণিমার উৎসবের পর দেশবন্ধুর অনুরোধে তাঁর বাড়ীতেও গণেশ দাসের কীর্তনের আসর বসলো। নিমন্ত্রিত হলেন ব্রহ্মচারীজী।

সেই কীর্তন আসরে বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসুও উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা শুরু হলো বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে যোগীবর কুলদানন্দের।

প্রাণীতত্ত্ব ও উদ্ভিদতত্ত্বের পশ্চাতে সর্বব্যাপী ভগবৎসত্তার কথাই বিশেষভাবে ব্যক্ত করেন ব্রহ্মচারীজী। একমাত্র ভগবদ্-ইচ্ছায়ই সর্বজীব ও উদ্ভিদের অন্তরে চলেছে একই বেদনা ও আনন্দের প্রস্রবণ। পাত্র ও অবস্থাভেদে তার কিছু তারতম্য দেখা যায় মাত্র। কুলদানন্দ বললেন বিস্তারিত করে। এই আলোচনার ফলে বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব গবেষণার ব্যাপারে অনেকখানি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়ীতেই দীক্ষালাভ করেন ডাঃ সত্যরঞ্জন সেন, উকিল শ্রীবঙ্কুবিহারী মল্লিক, উকিল শ্রীব্রজ-গোপাল গোস্বামী এবং শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। পরবর্তীকালে যোগেশচন্দ্র আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করেন। ব্রহ্মচর্যব্রতের কতকগুলি নিয়ম লাভের পর ব্রহ্মচারী বেশে তিনি ভারতের সমস্ত তীর্থ পরিক্রমা করেন। যোগেশ ব্রহ্মচারী নামে খ্যাত হন ভক্ত সমাজে। প্রতিষ্ঠা করেন 'গ্রাম্য-যোগাশ্রম'। শ্রীগুরুর সেবাপূজা ও বাণী প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন।

মহাদেব দেশাইজী বাঙ্গালী সহকর্মী কৃষ্ণদাসজীর মাধ্যমে ব্রহ্ম-চারীজীর 'শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ' গ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। নূতন আলোক ও প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পরম শ্রদ্ধা ও আগ্রহভরে তিনি গ্রন্থগুলি পাঠ করতে আরম্ভ করেন। ক্রমে মহাত্মা গান্ধীজীও গ্রন্থগুলির সঙ্গে পরিচিত হয়ে মুগ্ধ হন। এবং গুজরাটি ভাষায় গ্রন্থগুলির অনুবাদ করবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন। শেষ পর্যন্ত কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীজীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎলাভের আর সুযোগ হয়ে ওঠেনি।

ব্রহ্মচারীজী চিরদিন ছিলেন আত্মপ্রচারবিমুখ। তিনি ছিলেন শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণের নিজ হাতে গড়া নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। আত্মসংযম তাঁর সমস্ত লীলা ও বিভূতির প্রাণকেন্দ্র। ব্রহ্মচারীজীর কৃপা ও

গভীর স্নেহ সকল শিষ্য ভক্তের উপর সমভাবেই বর্ষিত হতো। মর্মস্পর্শী সহানুভূতি ও সমবেদনায় দুঃখী মানুষের তাপিত হৃদয়ের দুঃখ জ্বালার হতো উপশম।

চৌদ্দ বৎসরের পুত্রকে হারিয়ে সন্তানহারা জননী প্রফুল্লময়ী-দেবী শোকমুক্ত হওয়ার জন্য লিখলেন শ্রীগুরু কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীজীকে। প্রত্যুত্তরে লিখলেন ব্রহ্মচারীজী—

কল্যাণীয়া

স্নেহের প্রফুল্ল! মা, তোমার পত্রখানা পড়িয়া সমস্ত অবগত হইলাম। তোমার ঘরের মাণিক যে গৃহ অন্ধকার করিয়া চলিয়া গিয়াছে তাহা আমি জানি। বহু ভাগ্যেই ঐ ছেলে তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সামান্য কর্ম ছিল, শেষ হইতেই চলিয়া গেল। সকলেই নিজের প্রয়োজনে আসে, কর্ম শেষ হইলে কারো অপেক্ষা করে না। ইহাই নিয়ম। এখন উহার স্মরণে তোমাদেরও কল্যাণ হইবে। চিত্ত পবিত্র ও কোমল হইবে। শোক চাপিয়া রাখিতে নাই। যখন শোকের বেগ আসিবে, প্রাণ খুলিয়া কাঁদিও, উপকার হইবে। শোক অতি বিষম জিনিস। ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠও পুত্রশোকে আত্মহত্যা করিতে গিয়াছিলেন।

এই সময়ে তত্ত্ব-উপদেশে কোন উপকারই হইবে না। কেহ যদি সহানুভূতি দেখাইয়া সঙ্গে সঙ্গে কাঁদিতে পারে প্রাণ ঠাণ্ডা হয়। শোকের উপশম হয়। মহাভারত, রামায়ণ এই সময়ে পাঠ করিতে হয়। ছেলেকে আহ্বান করিয়া ঐ পাঠ শুনাইবে। ঠাকুরের নাম কর। শীতল হইতে এমন ঔষধ আর নাই। স্বপ্ন বিবরণ শুনিয়া আনন্দ হইল। ঐসব স্বপ্ন—স্বপ্ন নয়। জীবনের অবস্থা। দেবদেবী ঋষিমুনি গুরু যেসব স্বপ্নের ভিতর থাকেন, তাহা মিথ্যা নয়। স্বপ্ন লিখিয়া রাখিও। তুমি শান্ত সুবোধ মেয়ে, এই সকল অনিবার্য-বিধির বিধান নিজের পক্ষে ক্লেশকর বলিয়া অস্থির হইও না। তুমিও দুদিন পরে কোথায় চলিয়া যাইবে তাহাই স্মরণ কর। মৃত্যু-চিন্তা না আসিলে ধর্মেকর্মে প্রকৃত আগ্রহ হয় না। ঠাকুরকে নিয়ত

স্মরণ কর। আর উপায় নাই। অন্যদিকে তাকাইবার আর অবসর নাই। সময় হয়ে এল। প্রস্তুত হও।

তোমরা আমার প্রাণভরা আশীর্বাদ গ্রহণ করো। শীঘ্রই কলিকাতা যাইব।

আঃ ব্রহ্মচারী

সোনারপুরা, কাশী

পত্রখানি পাঠ করে ভক্তপ্রবর জিতেন্দ্রশংকর ও তাঁব স্ত্রী প্রফুল্লময়ীদেবীর শোকের উপশম হয়েছিল। এইভাবে পত্রের মাধ্যমে সান্ত্বনাপ্রদান করে তিনি অসংখ্য ভক্তবৃন্দের হৃদয়ের ত্রিতাপ জ্বালা বিদূরিত করেন। ত্রিতাপজ্বালার গরল আত্মসাৎ করে পিপাসিত ভক্তবৃন্দকে করেন অমৃত বিতরণ।

* * *

কুলদানন্দের জীবনের সঙ্গে অনেক পাশ্চাত্ত্য দেশের মানুষেরা ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়লেও তাঁদের মধ্যে তিনজনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইংবাজী শিক্ষায় তেমন ব্যুৎপত্তি না থাকলেও এই বিদেশীদের সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশতেন ব্রহ্মচারীজী। অবশ্য দোভাষীর সাহায্যেই কথা বলতেন। ডক্টর ইভান্স ওয়েন্‌জ্‌, মিঃ ভন-ডি-গ্রাফ ও তদীয় পত্নী এবং আমেরিকার পৃথিবী ভ্রমণকারী রেভারেণ্ড মৌলমেন সাহেব। মৌলমেন সাহেব চিকাগোর একজন বিখ্যাত ধর্মযাজক ছিলেন। কুলদানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় ঝামাপুকুরে ভক্ত ও শিষ্য এন্‌জিনিয়ার শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহে। ধর্মপ্রসঙ্গে কুলদানন্দের নিকট হতে কিছু বাণীর প্রত্যাশা করেন। এই প্রসঙ্গে কুলদানন্দ বলেন, 'আপনারা যে ভাবে ভারতবর্ষের পরিচয় নিতে আসেন তাতে এ দেশকে চেনা সম্ভব নয়। ঋষিনির্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন করে ঋষিকল্প লোকেব আশ্রয়ে থেকে বিশেষ বিশেষ স্থানে কিছুদিন সাধনভজন করে ভারতের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হ'তে পারলে তবেই ভারত সম্বন্ধে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভের যোগ্য হওয়া যায়।'

ডাঃ ইভান্স ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে গবেষণা করতেন। বাস করতেন নিজ আশ্রমে। পুরী ও কোনারকের মাঝামাঝি চন্দ্রভাগা নদীর তীরে সমুদ্রের ধারে প্রকাণ্ড আশ্রম ছিল তাঁর। তিব্বতে দশ বৎসর বাস করে তাদের ভাষা ও সাধন প্রণালী সম্বন্ধে প্রচুর অভিজ্ঞতা লাভ করেন। ভারতীয় দর্শন, যোগতত্ত্ব ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে ব্রহ্মচারীজীর সঙ্গে আলোচনা করে তিনি খুবই প্রীত হয়েছিলেন এবং ভারতীয় সাধন প্রণালীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ পোষণ করেন। আমেরিকা যাত্রার প্রাক্কালে ব্রহ্মচারীজীর নামে নিজ আশ্রমটি লিখে দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু ব্রহ্মচারীজী সম্মত হলেন না। 'ভারতীয় ও তিব্বতীয় সাধুগণের ইতিবৃত্ত' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে তিনি প্রতিকৃতিসহ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীর জীবনী আলোচনা করেন। এবং এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন, —'শিষ্য একাগ্রভাবে গুরুতে আত্মসমর্পণ করিলে গুরু কৃপা করিয়া সমস্ত বিদ্যা শিষ্যে সঞ্চার করিয়া যান। শিষ্যকে আনুগত্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয়। শ্রীগুরু নিজের আধ্যাত্মিক শক্তিতে ও স্নেহ ভালবাসায় শিষ্যকে অনুগত করিয়া লন।'

*　　　　*　　　　*

শ্রীশ্রীঠাকুর কোথাও স্থির হয়ে বসছেন না। বুদ্ধ অষ্টমী যোগ স্নান উপলক্ষ্যে যাত্রা করলেন লাঙ্গলবন্ধে। মাতৃহত্যার পর পরশুরাম নানা তীর্থ ভ্রমণের পর এই স্থানে এসে অষ্টমী তিথি যোগে স্নান করেন। ফলে তাঁর হাতের লাঙ্গল মুক্ত হয়। তাইতো এই স্থানের নাম হয় লাঙ্গলবন্ধ। পুণ্যময় তীর্থক্ষেত্র। ব্রহ্মচারীজীও অসুস্থ শরীরে স্নান করে রোগমুক্ত হয়ে উঠলেন।

ফিরে এলেন কলকাতায়। এখন থেকে বৎসরের অধিকাংশ সময় ব্রহ্মচারীজী অবস্থান করতে লাগলেন পুরীধাম, কলকাতা ও চন্দননগরে।

আবার হঠাৎ একদিন কিসের যেন প্রেরণায় ব্রহ্মচারীজী সশিষ্য তীর্থভ্রমণে বহির্গত হলেন। ভক্ত শিষ্য শ্রীযুক্ত যতীন পাল সমস্ত

খরচ বহনের নিলেন দায়িত্ব। কলকাতা থেকে এলেন প্রয়াগধামে। গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে স্নান ও দেবালয়াদি দর্শন যথানিয়মে সম্পন্ন করা হলো। অবশেষে কাট্‌নী হয়ে এলেন চিত্রকূটে। মন্দাকিনী গঙ্গা ও হনুমান ধারার পাশে চিত্রকূট পাহাড়ে ছিল শ্রীরামচন্দ্রের বাসস্থান। ভাবানন্দে বিভোর হয়ে ভক্ত শিষ্যবৃন্দসহ ব্রহ্মচারীজী চিত্রকূট পাহাড় করলেন পরিক্রমা।

চিত্রকূটের লীলা সম্পন্ন করে এলেন জব্বলপুর-নর্মদার তীর্থ-ক্ষেত্রে। নর্মদাতীরে উলঙ্গ এক সাধু ব্রহ্মচারীজীর প্রতি শ্রদ্ধা ও মর্যাদা প্রদর্শন করলেন। জব্বলপুর থেকে যাত্রা করলেন বোম্বাই অভিমুখে। বোম্বাই থেকে এলেন নাসিক। সূর্পনখার নাসিকা-ছেদন হয়েছিল বলে এই স্থানের নাম হয় নাসিক। মন্দিরাদি দর্শন ও তীর্থকৃত্যাদি সম্পাদন করলেন সশিষ্য। এখান থেকে দ্বারকার পথে যাত্রা করলেন। দ্বারকানাথজীকে দর্শন করে ভাববিহ্বল হলেন ব্রহ্মচারীজী। ভাবাবেশের সেই মূর্তি নয়নগোচর করে ভক্তবৃন্দের মনে হলো স্বয়ং কৈলাসনাথ ও দ্বারকানাথ যেন অপার্থিব মিলনানন্দে বিভোর।

প্রথম জীবনে যিনি ছিলেন মূর্তিপূজার ঘোর বিরোধী, আজ তিনিই অপ্রাকৃত প্রেমডোরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলেন পাষাণ প্রতিমার। বললেন, 'বিগ্রহকে পাথরের বলে মনেই হয় না। মানুষের হৃদয়ের মত এই বিগ্রহের হৃদয়ও যেন কত কোমল স্নেহপূর্ণ সজীব।'

এইভাবে পথঘাট গ্রাম শহর প্রান্তর সমুদ্র ও পর্বতরাজিকে পেছনে ফেলে এসে উপস্থিত হলেন শ্রীধাম বৃন্দাবনে। শ্রীকৃষ্ণ লীলাভূমি দর্শনে। ব্রহ্মচারীজীর সাধক ও সিদ্ধ জীবনের বহু স্মৃতি-বিজড়িত শ্রীরাধাগোবিন্দের এই লীলাস্থল। লীলায় ছাওয়া এই বৃন্দাবন। সেই যমুনাপুলিন। যেখানে কৃষ্ণ পুলিন বিহার করেছিলেন। নিকুঞ্জবন, নিধুবন, কেলিকদম্ব। গিরি গোবর্ধন। মানসগঙ্গা। রাধাকুণ্ড। শ্যামকুণ্ড। শ্রীবৃন্দাবনের কুঞ্জঘেরা পথে পথে ভক্ত শিষ্যবৃন্দসহ ব্রহ্মচারীজী ঘুরে বেড়াতে লাগলেন ভাবানন্দে

বিভোর হয়ে। আবার শিশুর মত অফুরন্ত পুলকে ব্রজের রজে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। সেই অব্যক্ত আকর্ষণ ও মাধুর্যের আস্বাদনে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে নির্নিমেষে চেয়ে থাকেন ভক্তবৃন্দ।

তারপর একদিন এই তীর্থপরিক্রমারও হলো অবসান।- ফিরে এলেন কলকাতায়। 'ভগবানের সঙ্গে একেবারে সম্বন্ধ স্থাপন করা চাই। শুধু ইষ্টনাম জপ করলেই হবে না। 'ওঁ ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ যার যে ইষ্টনাম। ইন্দ্রিয়দ্বার সংযত, হৃদয়কমল নিরুদ্ধ ও ভ্রূমধ্যে সন্নিবেশিত করে ওঁ এই একাক্ষব কেবল উচ্চারণ করলেই হবে না, 'মামনুস্মবণ' হওয়া চাই। তাঁকে স্মবণ করা চাই। সম্বন্ধ স্থাপন না হলে যথার্থ স্মরণ হয় না। ইষ্টনাম জপ কর এবং আমাকে স্মরণ কর—এই উপদেশ শ্রীভগবান দিয়েছিলেন অর্জুনকে। যে ইষ্টনামের এত ফল, তাও ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ না হলে বিফল হয়ে যায়। জীবদ্দশায় এই সম্বন্ধ করতে পারলে প্রতি কার্যে প্রতি মুহূর্তে তাঁকে স্মরণ করলে, মৃত্যুর পূর্বে তাঁকে স্মরণ হয়। মৃত্যুর তো আর অবধারিত কোন কাল নেই। ভগবদুদ্দেশ্য ব্যতীত আর কোন কার্যই সফল হয় না। দেহত্যাগ সময়ে তাঁর স্মরণ হলেই সদ্‌গতি হয়। নতুবা শুধু নাম জপেও ফল হয় না। ভগবৎ সম্বন্ধ স্থাপন করাই যখন মানবজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, তখন সমুদয় কার্যই ভগবদু-দ্দেশ্যে করতে হয়। কার্যসকল বিশৃঙ্খলভাবে না করে সরু তারে বেঁধে রাখবার মত ভগবানেব সঙ্গে যোগ রেখে করতে হয়।'

ভক্তবৃন্দ পরিবৃত হয়ে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর কুলদানন্দ।

দিন সপ্তাহ মাস বছরের পর বছর অতিক্রান্ত হলো। ভক্তসনে লীলা করে চলেছেন ব্রহ্মচারীজী। বার্ধক্যের চাপে কুলদানন্দের শরীর ক্রমশঃ ভেঙ্গে পড়তে লাগলো। এজন্য ভক্তবৃন্দের অনুরোধে জীবনের শেষভাগে পুরীধামে সমুদ্রতীরে 'পুলিন পুরী' আশ্রম বাড়ীতেই অবস্থান করতে লাগলেন শ্রীশ্রীঠাকুর।

১৩৩৬ সালের বৈশাখ মাসে একজন প্রসিদ্ধ সাধিকা পুরীধামে এসেই সাক্ষাৎ করলেন কুলদানন্দর সাথে। অনেক কথা হলো গোপনে।

তিনি চলে গেলে হেসে হেসে শিষ্যদের বললেন কুলদানন্দ,—'উনি কি বলে গেলেন জানিস? মহাপ্রস্থান সমূহ নিকট। দেখা অন্তকালে।' আবার শিষ্যদের সান্ত্বনা দিয়ে বলেন,—'আর হলই বা, এ শরীর তো চিরদিন থাকবে না।'

এইভাবে ভক্ত শিষ্যবৃন্দদের সম্মুখে শ্রীশ্রীঠাকুর মহাপ্রয়াণের ইঙ্গিত করলেন।

আবার একদিন কলকাতায় ভক্তমণ্ডলীর সামনে বললেন,—'তোমরাই আমার ভবিষ্যতের আশা। আমি ত বৃদ্ধ হয়েছি। বয়স তো হল ৬৩ বৎসর। তোমরা আমায় ক্ষমা কর। আমি আমার স্থানে চলে যাই।' পরে শিষ্যদের নিকটেও বললেন, 'বাবুদের কাছে ত আমি বিদায় নিয়েছি, তোরাও আমায় বিদায় দে।'

দীর্ঘ লীলাভিনয়ের পব কুলদানন্দের বাহ্য জীবনের উপর ধীরে ধীরে যবনিকাটি এলো নেমে। অসুস্থ হয়ে অবস্থান করতে লাগলেন মির্জাপুর স্ট্রীটে ভক্তপ্রবর জিতেন্দ্রনাথ মোদক মহাশয়ের গৃহে। ডাক্তারেব চিকিৎসাধীনে রয়েছেন। সেবাবও ত্রুটি হচ্ছে না। ভক্তবৃন্দেব কারো চোখেই নিদ্রা নেই। উদ্বেগে হৃদয় পরিপূর্ণ। চিত্ত অশান্ত। রাত্রি ১০টার সময় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় পরীক্ষা কবলেন। সহাস্যবদনে কথা বললেন কুলদানন্দ। রাত্রি দুইটার সময় শ্রীগুরুর নাড়ী পবীক্ষা করে বিচলিত হলেন ভক্তপ্রবর ডাঃ সত্যবঞ্জন সেন।

আব একটি নূতন দিন! নব ঊষা! অবিনশ্বর দিব্যজীবনের আর একটি প্রভাত! ১৩৩৭ সালের ১১ই আবাঢ় সকাল ৯টা ২২ মিনিটে মহাপুরুষ ধীরে ধীরে মহাসমাধিতে হলেন নিমগ্ন।

ভক্তের আবেগপূর্ণ মধুর কণ্ঠ হতে তখনও নিঃসৃত হতে লাগলো :

তুমি বন্ধু, তুমি নাথ নিশিদিন তুমি আমার,
তুমি শান্তি, তুমি সুখ, তুমি হে অমৃত পাথার।
তুমি হে আনন্দলোক, জুড়াও প্রাণ, নাশ শোক,
তাপ হরণ তোমারই চরণ, অসীম শরণ দীনজনার॥